সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১। আমাদের গৌরবের দুই সময়	৩৬,৭৫
২। আমার মালা গাঁথা ...	১৪১
৩। আর্য্যগণের আচার ব্যবহার	৩১৪
৪। ইউরোপে শাক্যসিংহের পূজা	৪৫৮
৫। কমলাকান্তের পত্র	৩৮৫,৫১৮
৬। কালবৃক্ষ	৫২৬
৭। কালিদাসপ্রণীত গ্রন্থের ভৌগলিকতত্ত্ব ...	২৮৯,৩৫৯
৮। কৃষ্ণকান্তের উইল	৩,৬৭,১৩৬,১৭৫,২১৫,২৭৮,৩২২,৩৭৫,৪০১,৪৬৫
৯। কেন ভালবাসি ...	৩৪
১০। খদ্যোত	৯২
১১। জটাধারীর রোজনামচা	৪৮১,৫৩৩
১২। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন বৃত্তের সমালোচনা	২৮৬,৩৯০
১৩। জৈনমত সমালোচন ...	১৯
১৪। ডাহির সেনাপতি নাটক	৩৩১
১৫। তর্কতত্ত্ব	৪৬০
১৬। তর্কসংগ্রহ ...	২৭৩,৩৫৫,৫৪৯
১৭। নববার্ষিকী গ্রন্থের লিখিত বাঙ্গালার খ্যাতিমান্ ব্যক্তিগণ	২৫৮
১৮। পাঞ্জাব ও শিখ্ সম্প্রদায়	২৬৫,৪৯৫
১৯। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	৪৮,৯৪,৪৩০
২০। বঙ্গদর্শন	১
২১। বঙ্গে উন্নতি	২২৫
২২। বঙ্গে ধর্ম্মভাব	১৫৩
২৩। বাঙ্গালার সাহিত্য ...	১৯০
২৪। বাহুবল ও বাক্যবল ...	৮৬,২৩৭
২৫। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ ...	১৪৫
২৬। বুড়া বয়সের কথা ...	২৮
২৭। বৃত্রসংহার ...	৪৫০,৫২৭,৫৪২
২৮। বেদ ও বেদব্যাখ্যা ...	৪৩২
২৯। বেদ বিভাগ	১০৮
৩০। বৈজ্ঞিকতত্ত্ব ...	৩৩৭,৪২১,৫৬০
৩১। বোম্বাই ও বাঙ্গালা ...	১২৬,২০৩
৩২। ভারতে একতা ...	৪৯
৩৩। ভুলোনা ও কুহুস্বর,— ভুলোনা আমায় ...	১১৩
৩৪। মণিপুরের বিবরণ ...	৪৪৩
৩৫। মানব ও যৌন নির্ব্বাচন	৪৩৩
৩৬। রাজসিংহ	৫৬৭
৩৭। রাষ্ট্রবিপ্লব	১৩
৩৮। শঙ্করাচার্য্য কি ছিলেন?	২৪১
৩৯। শঙ্করাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৪৯৭
৪০। শান্তিধর্ম্ম ও সাহস শিক্ষা	১৬৬
৪১। শৈশবসহচরী	৪৬,৮১,১৮১,২৩২,২৪৮,৩৪৯,৪৭০,৫০৫
৪২। সতীদাহ	৯৭,২৯৯
৪৩। সর্পবিষ চিকিৎসা ...	১৯৩
৪৪। সভ্যতা	১১৫
৪৫। স্বপ্ন—উন্মত্ততা— ...	৬৪
৪৬। সংযুক্তা	৫২৯
৪৭। হিন্দুদিগের আগ্নেয়াস্ত্র ...	৬১

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১। আমাদের গৌরবের দুই সময়	৩৬,৭৫
২। আমার মালা গাঁথা	১৪১
৩। আর্য্যগণের আচার ব্যবহার	৩১৪
৪। ইউরোপে শাক্যসিংহের পূজা	৪৩৮
৫। কমলাকান্তের পত্র	৩৮৫,৫১৮
৬। কালবৃক্ষ ...	৫১৬
৭। কালিদাসপ্রণীত গ্রন্থের ভৌগলিকতত্ত্ব	২৮৯,৩৫৯
৮। কৃষ্ণকান্তের উইল	৩,৬৭,১৩৬,১৭৫, ২১৫,২৭৮,৩২১,৩৭৫,৪০১,৪৬৫
৯। কেন ভালবাসি ...	৩৪
১০। খদ্যোত ...	৯২
১১। জটাধারীর রোজনামচা	৪৮১,৫৩৩
১২। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন বৃত্তের সমালোচনা	২৮৬,৩১০
১৩। জৈনমত সমালোচন ...	১৯
১৪। ডাহির সেনাপতি নাটক	৩৩১
১৫। তর্কতত্ত্ব	৪৬০
১৬। তর্কসংগ্রহ ..	২৭৩,৩৫৫,৫৪৯
১৭। নববার্ষিকী গ্রন্থের লিখিত বাঙ্গালার খ্যাতিমান্ ব্যক্তিগণ	২৫৮
১৮। পাঞ্জাব ও শিখ্ সম্প্রদায়	২৬৫,৪৯৫
১৯। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	৪৮,৯৪,১৯০
২০। বঙ্গদর্শন	১
২১। বৃক্ষে উন্নতি	২২৫
২২। বঙ্গে ধর্ম্মভাব ...	১৫৩
২৩। বাঙ্গালার সাহিত্য ...	১৯০
২৪। বাহুবল ও বাক্যবল ..	৮৬,২৩৭
২৫। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ ..	১৪৫
২৬। বুড়া বয়সের কথা ...	২৮
২৭। বৃত্রসংহার ..	৪৫০,৫২৭,৫৪২
২৮। বেদ ও বেদব্যাখ্যা ..	৪৩২
২৯। বেদ বিভাগ ...	১০৮
৩০। বৈজিকতত্ত্ব ...	৩৩৭,৪২১,৫৬০
৩১। বোম্বাই ও বাঙ্গালা ..	১২৬,২০৩
৩২। ভারতে একতা ...	৪৯
৩৩। ভুলোনা ও কুহুস্বর,— ভুলোনা আমায় ..	১১৩
৩৪। মণিপুরের বিবরণ ...	৪৪৯
৩৫। মানব ও যৌন নির্ব্বাচন	৪৩১
৩৬। রাজসিংহ	৫৬৭
৩৭। রাষ্ট্রবিপ্লব ...	১৩
৩৮। শঙ্করাচার্য্য কি ছিলেন?	২৪১
৩৯। শঙ্করাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৪৯৭
৪০। শান্তিধর্ম্ম ও সাহস শিক্ষা	১৬৬
৪১। শৈশবসহচরী	৪৬,৮১,১৮১,২৩২, ২৪৮,৩৪৯,৪৭০,৫০৫
৪২। সতীদাহ	৯৭,২৯৯
৪৩। সর্পবিষ চিকিৎসা ...	১৯৩
৪৪। সভ্যতা	১১৫
৪৫। স্বপ্ন—উন্মত্ততা— ...	৬৪
৪৬। সংযুক্তা	৫২৯
৪৭। হিন্দুদিগের আগ্নেয়াস্ত্র ...	৬১

বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

পঞ্চম খণ্ড।

বঙ্গদর্শন।

যখন বঙ্গদর্শনের চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত করিয়া আমি পাঠকদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করি, তখন স্বীকার করিয়াছিলাম যে, প্রযোজন দেখিলে স্বতঃ হউক অন্যতঃ হউক বঙ্গদর্শন পুনর্জ্জীবিত করিব।

বঙ্গদর্শনের লোপ জন্য আমি অনেকের কাছে তিরস্কৃত হইয়াছি। সেই তিরস্কারের প্রাচুর্য্যে আমার এমত প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বঙ্গদর্শনে দেশের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বলিয়া, ইহা পুনর্জ্জীবিত হইল।

যাহা একজনের উপর নির্ভর করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বঙ্গদর্শন যতদিন আমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবনের উপর

নির্ভর করিবে ততদিন বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ব অসম্ভব। এজন্য আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্ববিধান করাই আমার উদ্দেশ্য।

যাঁহার হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিলাম তাঁহার দ্বারা ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে, ইহা আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে। তাঁহার সঙ্কল্প সকল আমি অবগত আছি। তিনি নিজের উপর নির্ভর যত করুন বা না করুন দেশীয় সুলেখক মাত্রেরই উপর অধিকতর নির্ভর করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা বঙ্গদর্শনকে, সুশিক্ষিত মণ্ডলীর সাধারণ উক্তিপত্র রূপে পরিণত করেন। তাহা হইলেই বঙ্গদর্শন স্থায়ী এবং মঙ্গলপ্রদ হইবে।

ইউরোপীয় সাময়িক পত্রে এবং এতদ্দেশীয় সাময়িক পত্রে বিশেষ প্রভেদ এই যে এখানে যিনি সম্পাদক তিনিই প্রধান লেখক। ইউরোপীয় সম্পাদক, সম্পাদক মাত্র—কদাচিৎ লেখক। পত্র এবং প্রবন্ধের উদ্বাহে তিনি ঘটক মাত্র—স্বয়ং বরকর্ত্তা হইয়া সচরাচর উপস্থিত হয়েন নাই। এবার বঙ্গদর্শন সেই প্রণালী অবলম্বন করিল।

যাহা সকলের মনোনীত তাহার সহিত সম্বন্ধ গৌরবের বিষয়। আমি সে গৌরবের আকাঙ্ক্ষা করি। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম বটে, কিন্তু ইহার সহিত আমার সম্বন্ধবিচ্ছেদ হইল না। যতদিন বঙ্গদর্শন থাকিবে, আমি ইহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিব এবং যদি পাঠকেরা বিরক্ত না হয়েন, তবে ইহার স্তম্ভে তাঁহাদিগের সম্মুখে মধ্যে২ উপস্থিত হইয়া বঙ্গদর্শনের গৌরবে গৌরব লাভ করিবার স্পর্দ্ধা করিব।

এক্ষণে বঙ্গদর্শনকে অভিনব সম্পাদকের হস্তে সমর্পণ করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে ইহার সুশীতল ছায়ায় এই তপ্ত ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত হউক। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্রশক্তি, সেই মহতী

ছায়াতলে অলক্ষিত থাকিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করি, ইহাই আমার বাসনা।*

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কৃষ্ণকান্তের উইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)†

দশম পরিচ্ছেদ।

সেই রাত্রের প্রভাতে শয্যাগৃহে মুক্ত বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া, গোবিন্দলাল। ঠিক প্রভাত হয় নাই—কিছু বাকি আছে। এখনও, গৃহপ্রাঙ্গণস্থ কামিনীকুঞ্জ, কোকিল প্রথম ডাক ডাকে নাই। কিন্তু দোয়েল, গীত আরম্ভ করিয়াছে। ঊষার শীতল বাতাস উঠিয়াছে—গোবিন্দলাল বাতায়নপথ মুক্ত করিয়া, সেই উদ্যানস্থিত মল্লিকা গন্ধরাজ কুটজের পরিমলবাহী শীতল প্রভাতবায়ু সেবন জন্য তৎসমীপে দাঁড়াইলেন। অমনি তাঁহার পাশে আসিয়া একটি ক্ষুদ্র শরীরা বালিকা দাঁড়াইল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আবার তুমি এখানে কেন?"

বালিকা বলিল, "তুমি এখানে কেন?" বলিতে হইবে না, যে এই বালিকা গোবিন্দলালের স্ত্রী।

* গত বৎসর বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ কালে আমি অনবধানতা বশতঃ একটি গুরুতর অপরাধে পতিত হইয়াছিলাম। যাঁহাদিগের বলে এবং সাহায্যে আমি চারি বৎসর বঙ্গদর্শন সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম, কবিবর বাবু নবীনচন্দ্র সেন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য। সে উপকার ভুলিবার নহে—আমিও ভুলি নাই। তবে বিখ্যাত মুদ্রাকরের প্রেতগণ আমাকে চারিবৎসর জ্বালাইয়া তৃপ্তিলাভ করে নাই; শেষ দিন, আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কালে নবীন বাবুর নামটি উঠাইয়া দিয়াছিল। বঙ্গদর্শনের পুনর্জ্জীবন কালে আমি নবীন বাবুর কাছে বিনীত ভাবে এই দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

† বঙ্গদর্শনের চতুর্থ খণ্ডের ৪০৯, ৪৫১, ৫১৬ পৃষ্ঠা দেখ। দশম পরিচ্ছেদ পড়িবার পূর্ব্বে প্রথম নয় পরিচ্ছেদ আর একবার পড়িলে ভাল হয় না? কেন না যাহা এক বৎসর পূর্ব্বে পঠিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ না থাকাই সম্ভব।

গোবিন্দ। "আমি একটু বাতাস খেতে এলেম, তাও কি তোমার সইল না?"

বালিকা বলিল, "সবে কেন? এখনই আবার খাই খাই? ঘরের সামগ্রী খেয়ে মন উঠে না, আবার মাঠে ঘাটে বাতাস খেতে উকী মারেন।"

গো। "ঘরের সামগ্রী এত কি খাইলাম?"

"কেন এইমাত্র আমার কাছে গালি খাইয়াছ?"

"জান না, ভোমরা, গালি খাইলে যদি বাঙ্গালির ছেলের পেট ভরিত, তাহা হইলে,এ দেশের লোক এত দিন সগোষ্ঠী বদ্ হজমে মরিয়া যাইত। ও সামগ্রীটি অতি সহজে বাঙ্গালা পেটে জীর্ণ হয়। তুমি আর একবার নথ নাড়ো, ভোমরা, আমি আর একবার দেখি।"

গোবিন্দলালের পত্নীর যথার্থ নাম কৃষ্ণমোহিনী, কি কৃষ্ণকামিনী, কি অনঙ্গমঞ্জরী, কি এমনই একটা কি তাহার পিতা মাতা রাখিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে লেখে না। অব্যবহারে সে নাম লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার আদরের নাম "ভ্রমর" বা "ভোমরা।" সার্থকতাবশতঃ সেই নামই প্রচলিত হইয়াছিল। ভোমরা কিছু কাল।

ভোমরা নথ নাড়ার পক্ষে বিশেষ আপত্তি জানাইবার জন্য নথ খুলিয়া, একটা হুকে রাখিয়া, গোবিন্দলালের নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিল। পরে গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিয়া মৃদু২ হাসিতে লাগিল,—মনে২ জ্ঞান, যেন বড় একটা কীর্ত্তি করিয়াছি। গোবিন্দলালও তাহার মুখপানে চাহিয়া অতৃপ্তলোচনে দৃষ্টি করিতেছিলেন। সেই সময়ে সূর্য্যোদয়সূচক প্রথম রশ্মিকিরীট পূর্ব্বগগনে দেখা দিল—তাহার মৃদুল জ্যোতিঃপুঞ্জ ভূমণ্ডলে প্রতিফলিত হইতেলাগিল। নবীনালোক পূর্ব্বদিক্ হইতে আসিয়া পূর্ব্বমুখী ভ্রমরের মুখের উপর পড়িয়াছিল। সেই উজ্জ্বল, পরিষ্কার, কোমল, শ্যামচ্ছবি মুখকান্তির উপর কোমল প্রভাতালোক পড়িয়া, তাহার বিস্ফারিত লীলাচঞ্চল চক্ষের উপর জ্বলিল, তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল গণ্ডে প্রভাসিত হইল, হাসি চাহনিতে, সেই আলোতে, গোবিন্দলালের আদরে, আর প্রভাতের বাতাসে মিলিয়া গেল।

এই সময়ে সুপ্তোত্থিতা চাকরাণী মহলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। তৎপূর্ব্বে ঘর ঝাঁটান, জলছড়ান, বাসন মাজা, ইত্যাদির একটা সপ্ সপ্ ছপ্ ছপ্ ঝন্ ঝন্ খন্ খন্ শব্দ হইতেছিল—অকস্মাৎ সে শব্দ বন্ধ হইয়া, "ও মা কি হবে।" "কি সর্ব্বনাশ!" "কি আস্পার্দ্ধা।" "কি সাহস!" মাঝে২ হাসি টিট্‌কারি ইত্যাদি গোলযোগ উপস্থিত হইল। শুনিয়া ভ্রমর বাহিরে আসিল।

চাকরাণী সম্প্রদায় ভ্রমরকে বড মানিত না—তাহার কতকগুলি কারণ ছিল। একে ভ্রমর ছেলে মানুষ—তাতে ভ্রমর স্বয়ং গৃহিণী নহেন—তাঁহার শ্বাশুড়ী

ননদ ছিল—তার পর আবার ভ্রমর নিজে হাসিতে যত পটু, শাসনে তত পটু ছিলেন না। ভ্রমরকে দেখিয়া চাকরাণীর দল বড় গোলযোগ বাড়াইল—

নং ১—আর শুনেছ বউঠাকরুন?

নং ২—এমন সর্ব্বনেশে কথা কেহ কখন শুনে নাই।

নং ৩—কি সাহস। মাগিকে ঝাঁটাপেটা করে আস্‌বো এখন।

নং ৪—শুধু ঝাঁটা—বৌঠাকরুন্ বল—আমি তার নাক কেটে নিয়া আসি।

নং ৫—কার পেটে কি আছে মা—তা কেমন করে জান্‌বো মা—

ভ্রমরা হাসিয়া বলিল "আগে বল্‌না কি হয়েছে—তার পর যার মনে যা থাকে করিস্।" তখনই আবার পূর্ব্ববৎ গোলযোগ আরম্ভ হইল।

নং ১ বলিল—শোননি পাড়াশুদ্ধ গোলমাল হয়ে গেল যে—

নং ২ বলিল—বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

নং ৩—মাগির ঝাঁটা দিয়া বিষ ঝাড়িয়া দিই।

নং ৪—কি বল্‌বো ঠাকরুন বামন হয়ে চাঁদে হাত!

নং ৫—ভিজে বেরালকে চিন্‌তে জো গায় না।—গলায় দড়ি! গলায় দড়ি!

ভ্রমর বলিলেন, "তোদের।"

চাকরাণীরা তখন একবাক্যে বলিতে লাগিল, "আমাদের কি দোষ! আমরা কি করিলাম! তা জানি গো জানি। যে যেখানে যা করবে, দোষ হবে আমাদেরই। আমাদের আর উপায় নাই বলিয়া গতর খাটিয়ে খেতে এসেছি।" এই বক্তৃতা সমাপন করিয়া, দুই একজন চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। একজনের মৃত পুত্রের শোক উছলিয়া উঠিল। ভ্রমর কাতর হইলেন—কিন্তু হাসিও সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন,

"তোদের গলায় দড়ি, এইজন্য যে এখনও তোরা বলিতে পারিলি না যে কথাটা কি। কি হয়েছে।"

তখন আবার চারিদিক্ হইতে চারি পাঁচ রকমের গলা ছুটিল। বহুকষ্টে, ভ্রমর, সেই অনন্ত বক্তৃতা পরম্পরা হইতে এই ভাবার্থ সঙ্কলন করিলেন যে, গত রাত্রে কর্ত্তামহাশয়ের শয়নকক্ষে একটা চুরি হইয়াছে। কেহ বলিল চুরি নহে, ডাকাতি, কেহ বলিল সিঁদ, কেহ বলিল, না কেবল জন চারি পাঁচ চোর আসিয়া লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ লইয়া গিয়াছে।

ভ্রমর বলিল "তার পর? কোন্ মাগির নাক কাটিতে চাহিতেছিলি?"

নং ১—রোহিণী ঠাকরুনের আর কার?

নং ২—সেই আবাগীই ত সর্ব্বনাশের গোড়া।

নং ৩—সেই নাকি ডাকাতের দল সঙ্গে করিয়া নিয়ে এসেছিল।

নং ৪—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

নং ৫—এখন মরুন জেল খেটে।

ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, "রোহিণী যে

চুরি করিতে আসিয়াছিল, তোরা কেমন করে জান্‌লি ?"

"কেন সে যে ধরা পড়েছে। কাছারির গারদে কয়েদ আছে।"

ভ্রমর, যাহা শুনিলেন, তাহা গিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন। গোবিন্দলাল হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

ভ্র। ঘাড় নাড়িলে যে ?

গো। আমার বিশ্বাস হইল না যে রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। তোমার বিশ্বাস হয় ?

ভোমরা বলিল, "না।"

গো। কেন তোমার বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি? লোকে ত বলিতেছে।

ভ্র। তোমার কেন বিশ্বাস হয় না আমায় বল দেখি ?

গো। তা সময়ান্তরে বলিব। তোমার বিশ্বাস হইতেছে না কেন, আগে বল।

ভ্র। তুমি আগে বল।

গোবিন্দলাল হাসিল, "তুমি আগে।"

ভ্র। কেন আগে বলিব ?

গো। আমার শুনিতে সাধ হইয়াছে।

ভ্র। সত্য বলিব।

গো। সত্য বল।

ভ্রমর বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। লজ্জাবনতমুখী হইয়া, নীরবে রহিল।

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন বলিয়া এত পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। রোহিণী যে নিরপরাধিনী, ভ্রমরের তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। আপনার অস্তিত্বে যতদূর বিশ্বাস ভ্রমর ইহার নির্দ্দোষিতায় ততদূর বিশ্বাসবতী। কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ ছিল না—কেবল গোবিন্দলাল বলিয়াছেন যে "সে নির্দ্দোষী আমার এই রূপ বিশ্বাস।" গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমর কে চিনিতেন। তাই সে কালো এত ভাল বাসিতেন।

হাসিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি বলিব কেন তুমি রোহিণীর দিকে ?"

ভ্র। কেন ?

গো। সে তোমায় কালো না বলিয়া উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে।

ভ্রমরা কোপকুটিল কটাক্ষ করিয়া বলিল, "যাও !"

গোবিন্দলাল বলিল, "যাই।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিলেন।

ভ্রমর তাহার বস্ত্র ধরিল—"কোথা যাও ?"

গো। কোথা যাই বল দেখি ?

ভ্র। এবার বলিব।

গো। বল দেখি।

ভ্র। রোহিণীকে বাঁচাইতে।

"তাই।" বলিয়া গোবিন্দলাল ভোমরার মুখ চুম্বন করিলেন। পরদুঃখ কাতরের হৃদয় পরদুঃখকাতরে বুঝিল—তাই গোবিন্দ লাল ভ্রমরের মুখচুম্বন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দলাল কৃষ্ণকান্ত রায়ের সদর কাছারিতে গিয়া দর্শন দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত প্রাতঃকালেই কাছারিতে বসিয়াছিলেন। গদির উপর মসনদ করিয়া বসিয়া, সোনার আলবোলায় অম্বরি তামাকু চড়াইয়া মর্ত্তালোকে স্বর্গের অনুকরণ করিতেছিলেন। একপাশে রাশি২ দপ্তরে বাঁধা চিঠা, খতিয়ান, দাখিলা, জমা ওয়াশীল, থোকা, কবচা, বাকিজায়, শেহা, বোকড—আর একপাশে নায়েব, গোমস্তা, কারকুন, মুহুরি, তহশীলদার, আমীন, পাইক, প্রজা। সম্মুখে, অধোবদনা, অবগুণ্ঠনবতী রোহিণী।

গোবিন্দলাল আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে জ্যেঠা মহাশয়?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, রোহিণী অবগুণ্ঠন ঈষৎ মুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি ক্ষণিক কটাক্ষ করিল। কৃষ্ণকান্ত তাঁহার কথার কি উত্তর করিলেন, তৎপ্রতি গোবিন্দলাল বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, সেই কটাক্ষের অর্থ কি। শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন, "এ কাতর কটাক্ষের অর্থ, ভিক্ষা।"

কি ভিক্ষা? গোবিন্দলাল ভাবিলেন, আর্ত্তের ভিক্ষা আর কি? বিপদ্ হইতে উদ্ধার। সেই বাপীতীরে সোপানোপরে দাঁড়াইয়া যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার এই সময়ে মনে পড়িল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে বলিয়াছিলেন, "তোমার যদি কোন বিষয়ের কষ্ট থাকে তবে আজি হউক, কা.ল হউক, আমাকে জানাইও।" আজ ত রোহিণীর কষ্ট বটে, বুঝি এই ইঙ্গিতে রোহিণী তাঁহাকে তাহা জানাইল।

গোবিন্দলাল মনে ২ ভাবিলেন "তোমার মঙ্গল সাধি, ইহা আমার ইচ্ছা। কেন না ইহলোকে তোমার সহায় কেহ নাই দেখিতেছি। কিন্তু তুমি যে লোকের হাতে পড়িয়াছ—তোমার রক্ষা সহজ নহে।" এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে জ্যেষ্ঠতাতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে জ্যেঠা মহাশয়?"

বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত একবার সকল কথা আনুপূর্ব্বিক গোবিন্দলালকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিণীর কটাক্ষের ব্যাখ্যায় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, কানে কিছুই শুনেন নাই। ভ্রাতুষ্পুত্র আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, জ্যেঠা মহাশয়?" শুনিয়া বৃদ্ধ মনে মনে ভাবিল, "হয়েছে। ছেলেটা বুঝি মাগির চাঁদ পানা মুখখানা দেখে ভুলে গেল!" কৃষ্ণকান্ত আবার আনুপূর্ব্বিক গতরাত্রের বৃত্তান্ত গোবিন্দলালকে শুনাইলেন। সমাপন করিয়া বলিলেন,

"এ সেই হরা পাজির কারসাজি। বোধ হইতেছে, এ মাগি তাহার কাছে টাকা খাইয়া জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিবার জন্য আসিয়াছিল।

তার পর ধরা পড়িয়া ভয়ে জাল উইল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।”

গো। রোহিণী কি বলে?

কৃ। ও আর বলিবে কি? বলে তা নয়।

গোবিন্দলাল রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তা নয় ত তবে কি রোহিণি?”

রোহিণী মুখ না তুলিয়া, গদ্গদ কণ্ঠে বলিল, “আমি আপনাদের হাতে পড়িয়াছি যাহা করিবার হয় করুন। আমি আর কিছু বলিব না।”

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “দেখিলে বদজাতি।”

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, “এ পৃথিবীতে সকলেই বদজাত নহে। ইহার ভিতর বদজাতি ছাড়া আর কিছু থাকিতে পারে।” প্রকাশ্যে বলিলেন,

“ইহার প্রতি কি হুকুম দিয়াছেন? একে কি থানায় পাঠাইবেন?”

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “আমার কাছে আবার থানা ফৌজদারি কি। আমিই থানা, আমিই মেজেষ্টর, আমিই জজ। বিশেষ এই ক্ষুদ্র স্ত্রীলোককে জেলে দিয়া আমার কি পৌরুষ বাড়িবে?”

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে কি করিবেন?”

কৃ। ইহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া কুলার বাতাস দিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আমার এলেকায় আর না আসিতে পারে।

গোবিন্দলাল আবার রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বল রোহিণি?”

রোহিণী বলিল, “ক্ষতি কি।”

গোবিন্দলাল বিস্মিত হইলেন। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কৃষ্ণকান্তকে বলিলেন, “একটা নিবেদন আছে?”

কৃ। কি?

গো। ইহাকে একবার ছাড়িয়া দিন। আমি জামিন হইতেছি—বেলা দশটার সময়ে আনিয়া দিব।

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, “বুঝি যা ভেবেছি তাই। বাবাজির কিছু গরজ দেখ্‌ছি।” প্রকাশ্যে বলিলেন, “কোথায় যাইবে? কেন ছাড়িব?”

গোবিন্দলাল বলিলেন, “আসল কথা কি, জানা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এত লোকের সাক্ষাতে আসল কথা এ প্রকাশ করিবে না। ইহাকে একবার অন্দরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিব।”

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, “ওর গোষ্ঠির মুণ্ডু করবে। এ কালের ছেলে পুলে বড় বেহায়া হয়ে উঠেছে। রহ ছুঁচো আমিও তোর উপর এক চাল চালিব।” এই ভাবিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “বেস্ ত।” বলিয়া কৃষ্ণকান্ত একজন নগ্দীকে বলিলেন, “ওরে! একে সঙ্গে করিয়া একজন চাকরাণী দিয়া মেজ বৌমার কাছে পাঠিয়ে দে ত। দেখিস যেন পলায় না।”

নন্দী রোহিণীকে লইয়া গেল। গোবিন্দলাল প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "দুর্গা! দুর্গা! ছেলেগুলো হলো কি?"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দলাল অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন যে ভ্রমর, রোহিণীকে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাল কথা বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু পাছে এ দায় সম্বন্ধে ভাল কথা বলিলেও রোহিণীর কান্না আসে এ জন্য তাহাও বলিতে পারিতেছে না। গোবিন্দলাল আসিলেন দেখিয়া, ভ্রমর যেন দায় হইতে উদ্ধার পাইল। শীঘ্রগতি দূরে গিয়া গোবিন্দলালকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরের কাছে গেলেন। ভ্রমর গোবিন্দলালকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"রোহিণী এখানে কেন?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি গোপনে উহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। তাহার পর উহার কপালে যা থাকে হবে।"

ভ্র। কি জিজ্ঞাসা করিবে?

গো। উহার মনের কথা। আমাকে উহার কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয়, আড়াল হইতে শুনিও।

ভোমরা বড় অপ্রতিভ হইল। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া ছুটিয়া সে অঞ্চল হইতে পলাইল। একেবারে পাকশালায় উপস্থিত হইয়া, পিছন হইতে পাচিকার চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল, "রাঁধুনি ঠাকুরঝি, রাঁধ্তে রাঁধ্তে, একটি রূপ কথা বল না।"

এদিকে গোবিন্দলাল, রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এ বৃত্তান্ত আমাকে সকল বিশ্বাস করিয়া বলিবে কি?"

বলিবার জন্য রোহিণীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল—কিন্তু যে জাতি জীবন্তে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিত, রোহিণীও সেই জাতীয়া—আর্য্যকন্যা। বলিল, "কর্ত্তার কাছে সবিশেষ শুনিয়াছেন ত।"

গো। কর্ত্তা বলেন, তুমি জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে। তাই কি?

রো। তা নয়।

গো। তবে কি?

রো। বলিয়া কি হইবে?

গো। তোমার ভাল হইতে পারে।

রো। আপনি বিশ্বাস করিলে ত?

গো। বিশ্বাসযোগ্য কথা হইলে কেন বিশ্বাস করিব না?

রো। বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে।

গো। আমার কাছে কি বিশ্বাসযোগ্য কি অবিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমি জানি, তুমি জানিবে কিপ্রকারে? আমি অবিশ্বাসযোগ্য কথাতেও কখন২ বিশ্বাস করি।

রোহিণী মনে মনে বলিল, "বুঝি বিধাতা তোমাকে এত গুণেই গুণবান্ করিয়াছেন। নহিলে আমি তোমার জন্যে

মরিতে বসিব কেন? যাই হৌক, আমি ত মরিতে বসিয়াছি কিন্তু তোমার একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব।" প্রকাশ্যে বলিল, "সে আপনার মহিমা। কিন্তু আপনাকে এ দুঃখের কাহিনী বলিয়াই বা কি হইবে?"

গো। যদি আমি তোমার কোন উপকার করিতে পারি।

রো। কি উপকার করিবেন?

গোবিন্দলাল ভাবিলেন, "ইহার যোড়া নাই। যাই হউক এ কাতরা—ইহাকে সহজে পরিত্যাগ করা নহে।" প্রকাশ্যে বলিলেন,

"যদি পারি, কর্ত্তাকে অনুরোধ করিব। তিনি তোমায় ত্যাগ করিবেন।"

রো। আর যদি আপনি অনুরোধ না করেন, তবে তিনি আমায় কি করিবেন?

গো। শুনিয়াছ ত?

রো। আমার মাথা মুড়াইবেন ঘোল ঢালিয়া দিবেন, দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবেন। ইহার ভাল মন্দ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।—এ কলঙ্কের পর, দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেই আমার উপকার। আমাকে তাড়াইয়া না দিলে, আমি আপনিই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব। আর এ দেশে মুখ দেখাইব কিপ্রকারে? ঘোল ঢালা বড় গুরুতর দণ্ড নয়, ধুইলেই ঘোল যাইবে। বাকি এই কেশ—এই বলিয়া, রোহিণী একবার আপনার তরঙ্গক্ষুব্ধ কৃষ্ণ তড়াগ তুল্য কেশদাম প্রতি দৃষ্টি করিল—বলিতে লাগিল—"এই কেশ—আপনি কাঁচি আনিতে বলুন, আমি বৌঠাকরুনের চুলের দড়ি বিনাইবার জন্য ইহার সকল গুলি কাটিয়া দিয়া যাইতেছি।"

গোবিন্দলাল ব্যথিত হইলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি রোহিণি। কলঙ্কই তোমার দণ্ড। সে দণ্ড হইতে রক্ষা না হইলে, অন্য দণ্ডে তোমার আপত্তি নাই।"

রোহিণী এইবার কাঁদিল। হৃদয়মধ্যে গোবিন্দলালকে শতসহস্র ধন্যবাদ করিতে লাগিল। বলিল,

"যদি বুঝিয়াছেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, এ কলঙ্কদণ্ড হইতে কি আমায় রক্ষা করিতে পারিবেন?"

গোবিন্দলাল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না। আসল কথা শুনিতে পাইলে, বলিতে পারি, যে পারিব কি না।"

রোহিণী বলিল, "কি জানিতে চাহেন, জিজ্ঞাসা করুন।"

গো। তুমি যাহা পোড়াইয়াছ, তাহা কি?

রো। জাল উইল।

গো। কোথায় পাইয়াছিলে?

রো। কর্ত্তার ঘরে, দেরাজে।

গো। জাল উইল সেখানে কিপ্রকারে আসিল?

রো। আমিই রাখিয়া গিয়াছিলাম। যে দিন আসল উইল লেখা পড়া হয়, সেইদিন রাত্রে আসিয়া আসল উইল

চুরি করিয়া জাল উইল রাখিয়া গিয়াছিলাম।

গো। কেন, তোমার কি প্রয়োজন?

রো। হরলাল বাবুর অনুরোধে।

গোবিন্দলাল, অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া ভ্রূকুটী করিলেন। দেখিয়া, রোহিণী বলিল,

"তাহা নহে। এই কার্য্যের জন্য তিনি আমাকে একহাজার টাকা দিয়াছেন। নোট আজিও আমার ঘরে আছে। আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আনিয়া দেখাইতেছি।"

গোবিন্দলাল, বলিলেন, "তবে কালি রাত্রে আবার কি করিতে আসিয়াছিলে?"

রো। আসল উইল রাখিয়া জাল উইল চুরি করিবার জন্য।

গো। কেন? জাল উইলে কি ছিল?

রো। বড় বাবুর বার আনা—আপনার এক পাই।

গো। আমি ত তোমায় কোন টাকা দিই নাই—তবে কেন আবার উইল বদলাইতে আসিয়াছিলে?

রোহিণী কাঁদিতে লাগিল। বহুকষ্টে রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল, "না—টাকা দেন নাই—কিন্তু যাহা আমি ইহজন্মে কখন পাই নাই—যাহা ইহজন্মে আর কখন পাইব না—আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন।"

গো। কি সে, রোহিণি?

রো। সেই বারুণী পুকুরের তীরে, মনে করুন।

গো। কি, রোহিণি?

রো। কি? ইহজন্মে, আমি বলিতে পারিব না—কি। মেজ বাবু—আর কিছু বলিবেন না। এ রোগের চিকিৎসা নাই—আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ পাইলে খাইতাম। কিন্তু সে আপনার বাড়ীতে নহে। আপনি আমার অন্য উপকার করিতে পারেন না—কিন্তু এক উপকার করিতে পারেন—আমায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিন। তার পর যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে না হয়, আমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া, দেশ ছাড়া করিয়া দিবেন।

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন যেমন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার আহ্লাদ হইল না—রাগও হইল না। তাঁহার হৃদয় সমুদ্র—সমুদ্রবৎ সে হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল। বলিলেন,

"রোহিণি, মৃত্যুই বোধ হয়, তোমার ভাল, কিন্তু মরণে কাজ নাই। সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছি—আপনার আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন? আমার কথা শুন—আগে বড় বাবুর সে টাকাগুলি আনিয়া দাও—সে টাকা তোমার রাখা উচিত নহে। আমি সে টাকা তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিব। তার পর—"

গোবিন্দলাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। রোহিণী বলিল, "বলুন না ?"

গো। তার পর, তোমাকে এদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

রো। কেন ?

গো। তুমি আপনিই ত বলিতেছিলে, তুমি এদেশ ত্যাগ করিতে চাও।

রো। আমি বলিতেছিলাম লজ্জায়, আপনি বলেন কেন ?

গো। তোমায় আমায় আর দেখা শুনা না হয়।

রোহিণী দেখিল, গোবিন্দলাল সব বুঝিয়াছেন। মনে মনে, বড় অপ্রতিভ হইল—বড় সুখী হইল। তাহার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল। আবার তাহার বাঁচিতে সাধ হইল। আবার তাহার দেশে থাকিতে বাসনা জন্মিল। মনুষ্য বড়ই পরাধীন।

রোহিণী বলিল, "আমি এখনই যাইতে রাজি আছি। কিন্তু কোথায় যাইব ?

গো। কলিকাতায়। সেখানে আমি আমার একজন বন্ধুকে পত্র দিতেছি। তিনি তোমাকে এক খানি বাড়ী কিনিয়া দিবেন, তোমার টাকা লাগিবে না।

রো। আমার খুড়ার কি হইবে ?

গো। তিনি তোমার সঙ্গে যাইবেন, নহিলে তোমাকে কলিকাতায় যাইতে বলিতাম না।

রো। সেখানে দিনপাত করিব কি প্রকারে ?

গো। আমার বন্ধু তোমার খুড়ার একটি চাকরি করিয়া দিবেন।

রো। খুড়া দেশত্যাগে সম্মত হইবেন কেন ?

গো। তুমি কি তাঁহাকে এই ব্যাপারের পর সম্মত করাইতে পারিবে না ?

রো। পারিব। কিন্তু আপনার জ্যেষ্ঠতাতকে সম্মত করিবে কে ? তিনি আমাকে সহজে ছাড়িবেন কেন ?

গো। আমি অনুরোধ করিব।

রো। তাহা হইলে আমার কলঙ্কের উপর কলঙ্ক। আপনারও কিছু কলঙ্ক।

গো। সত্য। তোমার জন্য, কর্ত্তার কাছে, ভ্রমর অনুরোধ করিবে। তুমি এখন ভ্রমরের অনুসন্ধানে যাও। তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া, আপনি এই বাড়ীতেই থাকিও। ডাকিলে যেন পাই।

রোহিণী সজলনয়নে গোবিন্দলালকে দেখিতে দেখিতে ভ্রমরের অনুসন্ধানে গেল। এই রূপে, কলঙ্কে, বন্ধনে, রোহিণীর প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ হইল।

রাষ্ট্রবিপ্লব।

রাজা অথবা রাজস্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসকলের দ্বারা উত্তেজিত কি উৎপাতিত হইয়া প্রকৃতিবর্গ বিদ্রোহ উপস্থিত করে, ও তদ্দ্বারা সকল প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপ ঘটনাকে রাষ্ট্রবিপ্লব কহে।

পৃথিবী মধ্যে আসিয়া খণ্ডের প্রজাগণ অনেকাংশে নিরীহ ও উৎসাহহীন। তথাচ এখানেও মধ্যে২ রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া থাকে। ইতিহাসে রাষ্ট্রবিপ্লবের বিষয় ভূরি উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে আধুনিক ইউরোপ মহাখণ্ডের অন্তর্ভূত ভিন্ন২ দেশে যে বিপ্লব ঘটিয়াছে ও উত্তর আমেরিকায় যেএকবার ঐ সংক্রান্ত তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হয় তাহাই ইতিহাসের বিশেষ আলোচ্য।

লোকে কথায় বলে রাজার পাপে রাজ্যনাশ। কি পাপে রাজার রাজ্য নাশ হয় তাহা রাজা প্রজা, উভয়েরই সর্ব্বথা বিচার্য্য। ফলতঃ যখন প্রকৃতিমণ্ডলী মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় একবার উত্থিত হয়, তখন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। উচ্চ পদবীর লোকেরা প্রকৃতি সাধারণের বিদ্রোহ স্রোতে ভাসিয়া যান। সে বেগ সম্বরণ করা কাহার সাধ্য? ঐরাবতও ভাগীরথীর ভীষণ বেগে গা ঢালিয়া দিয়া থাকে। তরঙ্গাঘাতে উভয় কুল কম্পিত হইতে থাকে। উচ্চ নীচ ও নীচ উচ্চ হয়। কোথাও নূতন দ্বীপ সৃষ্টি, কোথাও পুরাতন উত্তুঙ্গ গিরিরাজি বিদারিত ও খণ্ডীকৃত হইতে থাকে। ফলতঃ সুসুপ্ত প্রকৃতি অতি কোমল ও সহিষ্ণু, কিন্তু একবার উত্ত্যক্ত ও জাগ্রত হইলে আর নিস্তার নাই। শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন, সামাজিক রীতি নীতির বিপর্য্যয় ও লোকের অবস্থাগত অনেক তারতম্য ঘটিয়া উঠে। কি পাপে এতাদৃশ অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হয়, ইতিহাস সমালোচন দ্বারা তাহা জানা যায়।

ইংরেজ নৃপতি দ্বিতীয় চার্লস্ ইতিহাসকে মিথ্যাবাদী বলিতেন। কিন্তু সত্যের আশ্রয় ব্যতীত মিথ্যা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। ইতিহাস স্থায়ী ও লোকসমাজে আদৃত; সুতরাং ঐতিহাসিক মিথ্যা কথা যে ঐতিহাসিক সত্যের উপর নির্ম্মিত, তাহাতে সংশয় নাই। ইতিহাসে প্রকৃতি ও পার্থিব উভয়েরই চরিত্র ও কার্য্যগত অনেক সত্য কথা জানিতে পারা যায়। ইতিহাসে পূর্ব্বাপর দেখিলেই কি পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত তাহা প্রতীয়মান হইবে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, গ্রীস্ ও স্পেন রাজ্যে যে২ রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে ক্রমানুয়ে তাহা আলোচিত হইতেছে। উল্লিখিত দেশ সমূহের মধ্যে ইংলণ্ডে প্রথমে রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছিল, অতএব তাহার বিষয় প্রথমেই বিবৃত হইতেছে।

কখন২ কোন দেশে বিদ্যার চর্চ্চা দ্বারা অথবা নূতন ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা লোকের

অন্তঃকরণে স্বাধীন চিন্তার উদয় হয। ঐ চিন্তা দ্বারা ক্রমশঃ প্রবৃত্তি সমূহ উত্তেজিত হইয়া আচার ব্যবহার সংস্করণ কার্য্যে নীত হয। এইরূপে দেশে সমাজবিপ্লব ঘটে এবং তাহার সঙ্গেই রাজকীয় দোষের আলোচন ও সংশোধনের চেষ্টা হইতে থাকে। সকল লোকের একাগ্রতা জন্মে। রাজা প্রতিবাদী হইলে পদচ্যুত হন, উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা অপদস্থ অথবা তাড়িত হন। সুতরাং রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া যায়। কখনও বা সমাজবিপ্লব পরে ঘটে। কেবল রাজ অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা প্রজাপুঞ্জের সহায়তায় শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করেন। কোন২ স্থলে প্রজারা ধনাঢ্যদিগের সহায়তায় কি বিনা সাহায্যে বিপ্লব উপস্থিত করে। ক্রমে নূতন পদ্ধতিতে সমাজ সংস্থাপিত হইতে থাকে।

প্রথমে ইংলণ্ডের নর্ম্মান্‌বংশীয় রাজারা উচ্চ ও ধনাঢ্যদিগের সহায়তায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ধনাঢ্য ভূম্যধিকারীরা রাজবলকে সঙ্কোচিত রাখিয়াছিল। তাহাদিগের অমতে রাজা কিছুই করিতে পারিতেন না। রাজা জন, তাহাদের প্রভাবে প্রজাদিগের কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলতঃ রাজা প্রজা উভয়ে ভূম্যধিকারীদিগের সহায়সাপেক্ষ ছিলেন। যেদিকে তাহারা থাকিত সেইদিকেই জয়। কালক্রমে ভূম্যধিকারীরা রাজাকে বাধ্য রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; ভূম্যধিকারীতে ভূম্যধিকারীতে ঈর্ষ্যা ও বিবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল, "গোলাপের যুদ্ধ" নামক বিবাদে নর্ম্মান বংশীয়গণ দুই দলে বিভক্ত হইল। ঐ বিবাদের অবসান হইতে২ ভূম্যধিকারীরা প্রায় উন্মুলিত ও ধরাশায়ী হইলেন। অবশিষ্ট যাহারা রহিলেন তাহারা নিস্তেজ ও ধনহীন হইলেন। রাজার একাধিপত্য হইল। টুডর বংশীয় রাজারা প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজারা সহ্য করিল। তৎপরে ষ্টুয়ার্ট বংশ। তাঁহারা আরও অত্যাচারী। ইতিমধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা দ্বারা জ্ঞানোন্নতি হইতে লাগিল। নূতন ধর্ম্মসংস্থাপন দ্বারা প্রজারা ঐকমত্য লাভ করিল—অধ্যবসায় বৃদ্ধি হইল। প্রজার চক্ষু ফুটিল। তখন রাজা প্রথম চার্লস্। পদে২ প্রজারা তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিল। যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই যুদ্ধে ইংলণ্ডের গৃহে২ অনল জ্বলিল। রাজা মিথ্যাবাদী, রাজা ধনলোভী, রাজা স্বয়ং বিধিবিহীন, স্বেচ্ছাচারী, তথাচ রাজা সাক্ষাৎ দেবতা। বড় লোকেরা রাজার দোষ দেখিতে পাইলেন না। আর পাইবেনই বা কেন? রাষ্ট্রবিপ্লব হইলে সমাজবিপ্লব হইবে; তাঁহাদিগের ধন, মান, কুল, সকলই যাইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। রাজদণ্ড লৌহের হইলেও রাজদণ্ড, তাহার আঘাত সহনীয়। মূর্খ ইতর লোকের আঘাত কি সহ্য হয়? ওপক্ষে প্রজাসাধারণ ক্লেশের সীমান্ত লাভ করিয়াছিল। যুদ্ধে জয় হয় ভাল, না হয় অধিক

ক্লেশের সম্ভাবনা কি? অতএব রাজায় প্রজায় যুদ্ধ হইতে২ প্রজায় প্রজায় মর্ম্মান্তিক হইল। বহুদিন ব্যাপিয়া নররক্তে দেশ প্লাবিত হইল। ক্রমে রাজার প্রাণ দণ্ড হইল। তথনও অনল নিবিল না। সৈনিকেরা প্রজাপ্রতিনিধিদিগের উপর কর্তৃত্ব আরম্ভ করিল। অবশেষে সেনাপতি ক্রমওএল একাধিপত্য লাভ করিলেন।

উদ্বেলিত সাগর কৃত্রিম বাঁধে আবদ্ধ থাকেনা। পুনর্ব্বার রাজতনয় ইংলণ্ডে আহুত হইলেন। কিন্তু তিনিও "বাপ কি বেটা।" প্রজারা প্রথমে সহ্য করিল বটে, কিন্তু একবার চক্ষু ফুটিলে মুদিত হওয়া ভার। দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় জেম্‌স্ রাজা হইলেন। তিনিও অত্যাচারী। বলদ্বারা ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিলেন। প্রজারা ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। রাজা রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তৃতীয় উইলিয়ম প্রজা দ্বারা আহুত হইয়া সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন। ক্রমে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালীর সোপান গঠিত হইতে লাগিল। এক্ষণে প্রজাপ্রতিনিধিগণ রাজকার্য্যের প্রধান অবলম্বন হইয়াছেন। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে যে বিপ্লবের সূত্রপাত হয় তাহাই কয়েক বৎসরের জন্য স্থগিত থাকিয়া ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে নবীন ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং বইন নদীর তীরে দ্বিতীয় জেমসের পরাজয় দ্বারা সমাপ্তি প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ডীয় শাসনপ্রণালীর প্রকৃষ্ট পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। ইংরেজেরা সাধারণতঃ প্রাচীন পদ্ধতির পক্ষপাতী। এই জন্যই কেবল অদ্যাপি ঐ বিপ্লবের পর রাজপদের লোপ হয় নাই। তথাচ দ্বিতীয় জেমসের বংশ আর ইংলণ্ডে আসিতে পান নাই। প্রজাদিগের সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা অব্যাহত রহিল। রাজার ধনতৃষা হ্রাস হইল। আজ এক কথা কাল অন্য, আর হইল না। করগ্রহণ, আয়ব্যয়, প্রজার মতসাপেক্ষ হইল। অতএব মন্দ রাজাকর্তৃক পরিণামে ইংরেজদিগের উপকার দর্শিয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লব তাহাদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ ফলদায়ক হইয়াছে। এমন ফল আর কুত্রাপি ফলে নাই। ফলতঃ যে দেশের লোক প্রাচীন পদ্ধতির পক্ষ, সেদেশে বিপ্লব দ্বারা অনিষ্ট অল্প হয়; কারণ অনেক বিবেচনার পর নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়।

ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাজ্ঞী এলিজেবেথের পূর্ব্বেই সমাজ নূতন ভাবে গঠিত হইতেছিল; বিপ্লব দ্বারা বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহা নূতন আকার ধারণ করিল। ক্রমে২ শাসনপ্রণালীতে দুইটী দল লক্ষিত হইল। প্রাচীন ও নব্য অথবা আদি ও উন্নতিশীল। একদল চলিত প্রণালীর পোষক একদল নূতন প্রবর্ত্তক। এই দুই দল অদ্যাপি "কমন্‌স" অর্থাৎ প্রজা প্রতিনিধিদিগের মধ্যে লক্ষিত হইতেছে এবং ইহাদিগের অন্যতর ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিত্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

প্রকৃতিবৃন্দ উন্নতমনা ও স্বাধীনভাব অবলম্বন পূর্ব্বক এই অবধি আপনাদের স্বত্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। উচ্চ ও ধনাঢ্য শ্রেণীর লোকেরা ও রাজারা তাহাদের সহায়তা আকাঙ্ক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজনীতি ও ব্যবহার শাস্ত্র সকলের উপর কর্তৃত্ব পাইল। এই পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের রাজারা প্রজাদিগের ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের বিষয়ে নিরপেক্ষ হইলেন। এমনকি ক্রমে২ সেই ভাব বৃদ্ধি হইয়া এক্ষণে কোন ধর্ম্মই রাজরক্ষিত হইবে না এইরূপ কল্পনা হইতেছে। বস্তুতঃ তদানীন্তন প্রজারা আপনাদের ধর্ম্মপ্রণালীর উপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং রাজরক্ষিত প্রণালীর বিপক্ষ। এই দলের লোকেরা ক্রমে২ উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছিলেন ও তাঁহাদিগের বংশধরেরা খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বাধীনতা লাভ ও মান রক্ষার্থ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং তাহাদের দ্বারা "ইউনাইটেড ষ্টেট্স" অর্থাৎ "মিলিত রাজ্য" স্থাপিত হইয়াছে। এখানকার লোকেরা দুইবার ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। অতএব যে বিষবৃক্ষের বীজ সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডীয় ষ্টুয়ার্ট বংশীয় রাজারা প্রজাপীড়ন দ্বারা রোপিত করিয়া যুদ্ধ বিগ্রহে প্রথম জলসিক্ত ও পালিত করিয়াছিলেন তাহার ফল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে হানোবর বংশীয় তৃতীয় জর্জ ভোগ করিলেন।

খৃঃ ১৬৪২ হইতে ১৬৬০ পর্য্যন্ত ও পুনবায় ১৬৮৮ হইতে ১৬৯০ পর্য্যন্ত রাজপীড়নে যে রাষ্ট্র বিপ্লব হয় তাহাতে প্রজা পক্ষও কথঞ্চিৎ পাপী ছিল। কেন না তাহারা উত্তেজিত হইয়া রাজার প্রকৃত স্বত্বেরও হন্তা হইয়াছিল। রাজা ও মরিলেন প্রজারাও মরিল। ইংলণ্ডের অনেক পরিবার একেবারে কালগ্রাসে পতিত হইল। অনেক পরিবার নিঃস্ব হইল। কেহ২ দেশ পরিত্যাগ করিয়া উত্তর আমেরিকার ভীষণ অরণ্যে হিংস্র জন্তু ও বন্যজাতির আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইরূপে রাজার রাজ্য নাশ, প্রজার বনবাস, হইল। রাজবংশ তাড়িত, প্রজার কেহ২ পলায়িত। রাষ্ট্রবিপ্লবের এই ফল ইংলণ্ডে ঘটিয়াছিল। ইহাতেও অনিষ্টের ভাগ অল্প। অন্যদেশে এতদপেক্ষাও গুরুতর।

কথিত সময়ে সমাজ দুইদলে বিভক্ত হইল। এক দল বেশ বিন্যাস করিতে, দীর্ঘ চাঁচর রাখিতে, গন্ধাদি সেবনে, নৃত্যগীত বাদ্য করিতে সর্ব্বদা তৎপর। সুরাপান ও পরদার বহুল পরিমাণে ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। রাজা দ্বিতীয় চার্লস্, ফরাশী সম্রাট্ চতুর্দ্দশ লুইয়ের আশ্রিত হইয়া তৎসভাস্থ অসৎ লোকের সংসর্গে এই সকল দুর্ম্মতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পারিষদ বর্গও তদনুরূপ হইলেন। যখন ১৬৬০ খৃঃ অব্দে রাজা ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখন হইতেই দেশের ধনাঢ্য ও ভূম্য-

ধিকারীরা ঐরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণ হই-লেন। স্ত্রীলোকের সতীত্ব, সত্যবাক্য, তাঁহাদিগের নিকট কবিকল্পনাসম্ভূত বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারা সাধারণতঃ দাতা, উদারস্বভাব, বিদ্যোৎসাহী, সবলপ্রকৃতি ছিলেন। তাৎকালিক ইংরেজি কাব্য নাটকাদি তাঁহাদিগের দ্বারা অধিকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল।

এদিকে অন্য দল বেশ ভূষার প্রতি বিরক্ত, ধর্ম্মানুরক্ত, ধর্ম্মকথানুরক্ত ও আড়ম্বর ত্যাগী হইলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মের ভাণ করিতেন মাত্র, কোপণ স্বভাব ও ক্রূর ও দ্বেষী ছিলেন। নাটকের চিত্রকার্য্যের ও ভাস্কর্য্যের প্রতি বিদ্বেষ ছিল। তবে মিণ্টন ও বনিয়ান এই দলের লোক হইয়াও উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বটে। ফলতঃ এই রাষ্ট্রবিপ্লবে ইংরেজি সাহিত্য সংসারেও বিপ্লব ঘটিয়াছিল। প্রথম দলস্থ কবিরা ফরাসী দিগের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। আদি রসের ঘটা আরম্ভ হইল। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় যে অসাধারণ মানব চরিত্রজ্ঞ সেক্সপিয়ার প্রভৃতি কবিকুল চূড়ামণিরা ইংরেজি সাহিত্যের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন তৎপরিবর্ত্তে আদিরস ঘটিত গল্পের ঘটা কখন বা শব্দের ছটা ও ছন্দোলালিত্যের বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল। ইহাদিগের মধ্যে ড্রাইডেন ও অটওএ উৎকৃষ্ট ছিলেন। কিন্তু এই অবধি কাব্যের সারভাগের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কবিরা ক্রমে ক্রমে ছন্দের উৎকর্ষের প্রতি যত্ন করিতে লাগিলেন। শব্দ মাধুরিতে এই দলপ্রসূত ইংরেজ কবি পোপ কিছু দিন পরে সাধারণ নিকৃষ্ট কাব্যকারের আদর্শ হইয়াছিলেন। পোপ ইংরেজি ভারত। পোপের অনুকরণে ইংরেজি সাহিত্য কিছু কালের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। অতএব ইংলণ্ডীয় রাষ্ট্রবিপ্লব ইংরেজি সাহিত্যের অঙ্গে চিরকালের জন্য কলঙ্ক চিহ্ন স্থাপন করিয়াছে, কিছুতেই তাহা মুছিবে না। পোপের অন্যান্য গুণে তিনি আদরণীয় থাকিবেন কিন্তু দোষগুলি, কাহারও ভুলিবার নহে।

সাহিত্য জাতিচরিত্রের আদর্শ। যে জাতি মধ্যে যেরূপ সাহিত্যের আদর সে জাতির চরিত্র তদনুরূপ। যেখানে আদি ও হাস্যরস আদরের সামগ্রী সে খানকার লোক কি চরিত্রের তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইংরেজচরিত্রে এক কালীন যে কলঙ্করেখা পড়িয়াছিল ইংরেজি সাহিত্যে তাহা অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই প্রকারে ইংলণ্ডীয় রাষ্ট্র বিপ্লবের ফল ইংরেজসমাজে, শাসনপ্রণালীতে, আচার ব্যবহারে ও সাহিত্যে সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে।

যখন প্রাচীন পদ্ধতিপ্রিয় ইংরেজদিগের মধ্যেও রাষ্ট্রবিপ্লবের ফল সমাজের অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত ভেদ করিয়াছে তখন উদ্ধতপ্রকৃতি জাতিগণের মধ্যে রাষ্ট্র-

বিপ্লব, সমাজে যে একপ্রকার প্রলয় উপস্থিত করে তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে রাষ্ট্রবিপ্লব সর্ব্বথা অবিধেয় এরূপ বিবেচনা করা অনুচিত। যেমন জড় প্রকৃতি অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বশীভূত সেইরূপ মনুষ্যদিগের মনও নিয়মের অধীন এবং সমাজ ও রাজ্যপ্রণালী মনের অধীন; অতএব যে২ কারণ দ্বারা সমাজের মানসিক পরিবর্ত্তন হয় তদ্দ্বারা বিপ্লব ঘটে। ফলতঃ সর্ব্বত্র নিত্যই সমাজ মধ্যে বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে। অতএব বিপ্লব অনিবার্য্য। কোন না কোন সময়ে সকল দেশেই বিপ্লব ঘটিয়া থাকে। বিপ্লব ত্রিধা। ধার্ম্ম্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়। কেবল দেখা উচিত যে ইহার মধ্যে কোনটীই ভয়ানক না হয়। বিপ্লব, যে খানে কোমল মূর্ত্তি ধারণ করে সেখানেও যে সহজ তাহা নহে। রাজার কর্ত্তব্য যাহাতে প্রজাদিগের বিদ্রোহপ্রবৃত্তি উত্তেজিত না হয় ইহারই চেষ্টা পান। প্রজার কর্ত্তব্য রাজার শাসনেচ্ছা অপ্রকৃত বলধারণ না করে। উভয়ের সামঞ্জস্য যত দিন থাকে তত দিন বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠে না। রাজার বিবেচনা করা উচিত যে আগ্নেয় পর্ব্বতের শিখায় বসিয়া আছেন, কোন্ দিন অগ্ন্যুৎপাত হয় তাহার নিশ্চয় নাই। প্রজা দেখিবেন যে যেমন স্নিগ্ধচ্ছায়াদায়িনী মেঘমালা আরোহণে বজ্রপাণি বাসব বিরাজ করেন, রাজগণও তদ্রূপ; প্রজাগণ, রাজমহিমার শীতলচ্ছায়ায় থাকিয়া বজ্র দেখিতে পায়না। কিন্তু মন্দ্রধ্বনিতে কম্পিত করেন মাত্র, কিন্তু মনে করিলে তাড়িতাঘাতে মস্তকচূর্ণ করিতে পারেন। দুঃখের বিষয় এই যে বিশ্ববিধাতার প্রত্যক্ষ উপদেশ অবহেলন করিয়া নিত্য নিত্যই আমরা বিপদে পড়িতেছি। ইতিহাসের সৃষ্টি পর্য্যন্ত এখনও রাজা বা প্রজা কেহই শিখিল না। অথবা এই কৌশলে তাঁহার কোন নিগূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধ হইতেছে। মনুষ্য বুদ্ধি তত দূর দৃষ্টিসম্পন্ন নহে। মেকিয়াবেলির দুশ্চেষ্টা, বিস্মার্কের কৌশল, পিটের দূরদৃষ্টি ও মেজারিণের মন্ত্রণা অপরিহার্য্য প্রকৃতিনিয়মের নিকট হেঁটমুণ্ড হইয়া থাকে। একজন বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞের কৌশল সমাজকে বান্ধিয়া রাখিতে পারে না। উভয়ের মিল নহিলে যত চেষ্টাবৃদ্ধি হয় তত ফল অল্প হয়। সুচতুর রাজা এইটী বিবেচনা করিয়া চলিলেই ভাল।

আজিও দন্ত সকল অবিচ্ছিন্ন মুক্তামালার লজ্জাস্থল, হয় ত আপনার নিদ্রা অদ্যাপি এমন প্রগাঢ়, যে দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যাও তাহা ভাঙ্গিতে পারেন না;—তথাপি, হয় ত আপনি প্রাচীন। নয়ত, আপনার কেশগুলি শাদা কালোয় গঙ্গা যমুনা হইয়া গিয়াছে, দশন মুক্তাপাতি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দুই একটি মুক্তা হারাইয়া গিয়াছে—নিদ্রা,চক্ষুর প্রতারণামাত্র, তথাপি আপনি যুবা। তুমি বলিবে ইহার অর্থ, "বয়সেতে বিজ্ঞ নহে, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।" তাহা নহে—আমি বিজ্ঞতার কথা বলিতেছি না, প্রাচীনতার কথা বলিতেছি। প্রাচীনতা বয়সেরই ফল, আর কিছুরই নহে। ধাতু বিশেষে কিছু তারতম্য হয়, কেহ চল্লিশে বুড়া, কেহ বিয়াল্লিশে যুবা। কিন্তু তুমি কখন দেখিবে না, যে বয়সে অধিক তারতম্য ঘটে। যে পঁয়তাল্লিশে যুবা বলাইতে চায়, সে হয় যমভয়ে নিতান্ত ভীত, নয় তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছে; যে পঁয়ত্রিশে বুড়া বলাইতে চায়, সে হয় খড়াই ভাল বাসে, নয় পীড়িত, নয় কোন বড় দুঃখে দুঃখী।

কিন্তু এই অর্দ্ধেক পথ অতিবাহিত করিয়া, প্রথম চস্‌মা খানি হাতে করিয়া, রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে ঠিক বলা দায় যে আমি বুড়া হইয়াছি কি না। বুঝি বা হইয়াছি। বুঝি হই নাই। মনে২ ভরসা আছে একটু চক্ষুর দোষ হৌক, দুই একগাছা চুল পাকুক,আজিও প্রাচীন হই নাই। কই, কিছু ত প্রাচীন হয় নাই? এই চিরপ্রাচীন—ভুবনমণ্ডল ত আজিও নবীন, আমার প্রিয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয় নাই; আমার সৌন্দর্য্যমাখা, নীলবসনা, গঙ্গার ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ ত প্রাচীন হয় নাই; প্রভাতের বায়ু, বকুল কামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্যামলতা, এবং নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা, কেহ ত প্রাচীন হয় নাই—তেমনই কোমল, তেমনই সুন্দর আছে, আমি কেবল প্রাচীন হইলাম? আমি একথায় বিশ্বাস করিব না। পৃথিবীতে উচ্চ হাসি ত আজিও আছে,কেবল আমার হাসির দিন গেল? পৃথিবীতে উৎসাহ, ক্রীড়া, রঙ্গ, আজিও তেমনি অপর্য্যাপ্ত, কেবল আমারই পক্ষে নাই? জগৎ আলোকময়, কেবল আমারই রাত্রি আসিতেছে? সলমন্ কোম্পানির দোকানে বজ্রাঘাত হউক, আমি এ চস্‌মা ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আমি বুড়া বয়স স্বীকার করিব না।

তবু আসে—ছাড়ান যায় না। ধীরে২ দিনে২, পলে২,বয়শ্চোর আসিয়া, এদেহপুর প্রবেশ করিতেছে—আমি যাহা মনে ভাবি না কেন, আমি বুড়া, প্রতি নিশ্বাসে তাহা জানিতে পারিতেছি। অন্যে হাসে, আমি কেবল ঠোঁট হেলাইয়া তাহাদিগের মন রাখি। অন্যে কাঁদে, আমি কেবল লোকলজ্জায় মুখ ভার করিয়া থাকি—ভাবি ইহারা এ বৃথা কালহরণ করিতেছে কেন? উৎসাহ আমার কাছে পণ্ডশ্রম—আশা আমার কাছে আত্মপ্রতারণা। কই,

আমার ত আশা ভরসা কিছু নাই? কই—দূর হৌক, যাহা নাই তাহা আর খুঁজিয়া কাজ নাই।

খুঁজিয়া দেখিব কি? যে কুসুমদাম এ জীবনকানন আলো করিত, পথিপার্শ্বে একে২ তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। যে মুখমণ্ডল সকল ভাল বাসিতাম, একে২ অদৃশ্য হইয়াছে, না হয় রৌদ্রবিশুষ্ক বৈকালের ফুলের মত, শুকাইয়া উঠিয়াছে। কই, আর এ ভগ্ন মন্দিরে, এ পরিত্যক্ত নাট্যশালায়, এ ভাঙ্গা মজলিষে, সে উজ্জ্বলদীপাবলী কই? একে একে নিবিয়া যাইতেছে। কেবল মুখ নহে—হৃদয়! সে সরল, সে ভাল বাসা পরিপূর্ণ, সে বিশ্বাসে দৃঢ়, সৌহার্দ্দ্যে স্থির, অপরাধেও প্রসন্ন, সে বন্ধুহৃদয় কই? নাই। কার দোষে নাই? আমার দোষে নহে। বন্ধুরও দোষে নহে। বয়সের দোষে অথবা যমের দোষে।

তাতে ক্ষতি কি? একা আসিয়াছি, একা যাইব—তাহার ভাবনা কি? এ লোকালয়ের সঙ্গে আমার বনিয়া উঠিল না—আচ্ছা—রোখ্‌সোদ। পৃথিবি! তুমি তোমার নিয়মিত পথে আবর্ত্তন করিতে থাক, আমি আমার অভীষ্ট স্থানে গমন করি—তোমায় আমায় সম্বন্ধ রহিত হইল—তাহাতে, হে মৃন্ময়ি জড়পিণ্ডগৌরবপীড়িতে বসুন্ধরে! তোমারই বা ক্ষতি কি, আমারই বা ক্ষতি কি? তুমি অনন্ত কাল, শূন্যপথে ঘুরিবে, আমি আর অল্প দিন ঘুরিব মাত্র। তার পরে তোমার কপালে ছাই গুলি দিয়া, যাঁর কাছে সকল জ্বালা জুড়ায়, তাঁর কাছে গিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব!

তবে, স্থির হইল এক প্রকার যে বুড়া বয়সে পড়িয়াছি। এখন কর্ত্তব্য কি? "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ?" এ কোন গণ্ডমূর্খের কথা। আমার বন কোথা? এ বয়সে, এই অট্টালিকাময়ী লোকপূর্ণা আপণীসমাকুলা নগরই বন। কেন না হে বর্ষীয়ান্ পাঠক! তোমার আমার সঙ্গে আর ইহার মধ্যে কাহারও সহৃদয়তা নাই। বিপদ্ কালে কেহ কেহ আসিয়া বলিতে পারে, যে "বুড়া! তুমি অনেক দেখিয়াছ, এ বিপদে কি করিব বলিয়া দাও,—" কিন্তু, সম্পদ্ কালে কেহই বলিবে না, "বুড়া, আজি আমার আনন্দের দিন, তুমি আসিয়া আমাদিগের উৎসব বৃদ্ধি কর!" বরং আমোদ আহ্লাদ কালে বলিবে, "দেখ ভাই, যেন বুড়া বেটা জানিতে না পারে।" তবে আর অরণ্যের বাকি কি?

যেখানে আগে ভাল বাসার প্রত্যাশা করিতে, এখন সেখানে তুমি কেবল ভয় বা ভক্তির পাত্র। যে পুত্র, তোমার যৌবনকালে, তাহার শৈশবকালে, তোমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াও, অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থাতেই, ক্ষুদ্র হস্তপ্রসারণ করিয়া, তোমার অনুসন্ধান করিত, সে এখন লোকমুখে সম্বাদ লয়, পিতা কেমন আছেন। পরের ছেলে, সুন্দর দেখিয়া যাহাকে কোলে তুলিয়া, তুমি আদর

করিয়াছিলে, সে এখন কালক্রমে লব্ধ-বয়ঃ, কর্কশকান্তি, হয় ত মহাপাপিষ্ঠ, পৃথিবীর পাপস্রোত বাড়াইতেছে, হয় ত, তোমারই দ্বেষক—তুমি কেবল কাঁদিয়া বলিতে পার, "ইহাকে আমি কোলে পিঠে করিয়াছি।" তুমি যাহাকে কোলে বসাইয়া, ক, খ, শিখাইয়াছিলে, সে হয় ত এখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তোমার মূর্খতা দেখিয়া মনেং উপহাস করে। যাহার ইস্কুলের বেতন দিয়া তুমি মানুষ করিয়াছিলে, সে হয় ত এখন তোমারে টাকা ধার দিয়া, তোমারই কাছে সুদ খায়। তুমি যাহাকে শিখাইতে, হয় ত সেই তোমায় শিখাইতেছে। যে তোমার অগ্রাহ্য ছিল, তুমি আজি তার অগ্রাহ্য। আর অরণ্যের বাকি কি?

অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া, বহির্জগতেও এইরূপ দেখিবে। যেখানে তুমি স্বহস্তে পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলে,—বাছিয়া বাছিয়া, গোলাপ চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, বিগ্নোনিয়া, সাইপ্রেস অরকেরিয়া আনিয়া পুঁতিয়াছিলে, পাত্রহস্তে স্বয়ং জলসিঞ্চন করিয়াছিলে, সেখানে দেখিবে, ছোলা মটরের চাস,—হারাধন পোদ, গামছা কাঁদে, মোটাং বলদ লইয়া, নির্ব্বিঘ্নে লাঙ্গল দিতেছে—সে লাঙ্গলের ফাল তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। যে অট্টালিকা তুমি যৌবনে, অনেক সাধ মনেং রাখিয়া, অনেক সাধ পুরাইয়া, যত্নে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলে, যাহাতে পালঙ্ক পাড়িয়া, নয়নে নয়নে অধরে অধরে মিলাইয়া, ইহজীবনের অনশ্বর প্রণয়ের প্রথম পবিত্র সম্ভাষণ করিয়াছিলে, হয় ত দেখিবে সে গৃহের ইষ্টক সকল দামু-ঘোষের আস্তাবলের সুরকির জন্য চূর্ণ হইতেছে; সে পালঙ্কের ভগ্নাংশ লইয়া কৈলাশীর মা পাচিকা, ভাতের হাঁড়িতে জাল দিতেছে—আর অরণ্যের বাকি কি?

সকল জ্বালার উপর জ্বালা, আমি সেই যৌবনে, যাহাকে সুন্দর দেখিয়াছিলাম—এখন সে কুৎসিত। আমার প্রিয়বন্ধু দাসুমিত্র, যৌবনেব রূপে স্ফীতকণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্ব্বে বেড়াইত,—কত মাগী গঙ্গার ঘাটে, স্নানকালে তাঁহাকে দেখিয়া নমঃশিবায় নমঃ বলিয়া ফুল দিতে, "দাসু মিত্রায় নমঃ" বলিয়া ফুল দিয়াছে। এখন সেই দাসুমিত্রের শুষ্ক কণ্ঠ, পলিত কেশ, দন্তহীন, লোল চর্ম্ম, শীর্ণকায়। দাসুর, একটা ব্রাণ্ডি আর তিনটা মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল,—এখন দাসু নামাবলীর ভরে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দিলে, পাত মুছিয়া ফেলে। আর অরণ্যের বাকি কি?

গদার মাকে দেখ। যখন আমার সেই পুষ্পোদ্যানে, তরঙ্গিণী নামে যুবতী ফুল চুরি করিতে যাইত, মনে হইত নন্দন কানন হইতে সচল সপুষ্প পারিজাত বৃক্ষ আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার অলক দাম লইয়া উদ্যান বায়ু ক্রীড়া করিত, তাহার অঞ্চলে কাঁটা বিঁধিয়া দিয়া, গোলাপ গাছ রসকেলি করিত। আর আজি গদার মাকে দেখ। বকাবকি করিতেং

চাল ঝাড়িতেছে—মলিনবসনা বিকট-দশনা, তীব্ররসনা—দীর্ঘাঙ্গিণী, কৃষ্ণাঙ্গিনী, কৃশাঙ্গিনী,—লোলচর্ম্ম, পলিত কেশ, শুষ্কবাহু, কর্কশ কণ্ঠ। এই সেই তরঙ্গিণী—আর অরণ্যের বাকি কি?

তবে, স্থির, বনে যাওয়া হইবে না। তবে কি করিব—

শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং
যৌবনে বিষয়ৈষিণাং
বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাং
যোগেনান্তে তনুত্যজাম্।

সর্ব্বগুণবান্ রঘুগণের বার্দ্ধক্যের এই ব্যবস্থা কালিদাস করিয়াছেন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি—কালিদাস চল্লিশ পার হইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই। তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে লিখিয়াছিলেন, এবং কুমার সম্ভব চল্লিশ পার করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি দুইটি কবিতা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—

প্রথম, অজবিলাপে,

ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং
তববিশ্রান্তকথং দুনোতিমাং
নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
বিরতাভ্যন্তর ষট্‌পদস্বনং।*

এটি যৌবনের কান্না।

তারপর রতিবিলাপে,

গতএব নতে নিবর্ত্ততে
স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্যমা
মবিসহ্য ব্যসনেন ধূমিতাম্॥†

এটি বুড়া বয়সের কান্না।—

তা যাই হউক, কালিদাস বুড়া বয়সের গৌরব বুঝিলে কখনও বৃদ্ধের কপালে মুনিবৃত্তি লিখিতেন না। বিস্মার্ক, ম্যোল্‌ট্‌কে, ও ফ্রেডেরিকউইলিয়ম বুড়া; তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে—জর্ম্মান ঐকজাত্য কোথা থাকিত? টিয়র প্রাচীন—টিয়র মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে, ফ্রান্‌সের স্বাধীনতা এবং সাধারণ তন্ত্রাবলম্বন কোথা থাকিত? গ্লাডষ্টোন এবং ডিস্রেলি বুড়া—তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে, পার্লিমেণ্টের রিফর্ম এবং আয়রিশ চর্চ্চের ডিসেষ্টাব্লিষমেণ্ট কোথা থাকিত?

প্রাচীন বয়সই বিষয়ৈষার সময়। আমি অন্ত্র দন্ত হীন ত্রিকালের বুড়ার কথা বলিতেছি না—তাঁহারা দ্বিতীয় শৈশবে উপস্থিত। যাঁহারা আর যুবা নন বলিয়াই বুড়া, আমি তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি। যৌবন কর্ম্মের সময় বটে, কিন্তু তখন কাজ ভাল হয় না। একে বুদ্ধি অপরিপক্ব, তাহাতে আবার রাগ দ্বেষ ভোগাশক্তি, এবং স্ত্রীগণের অনু-

* বায়ুবশে অলকাগুলিন চালিত হইতেছে—অথচ বাক্যহীন তোমার এই মুখ রাত্রিকালে প্রমুদিত সুতরাং অভ্যন্তরে ভ্রমরগুঞ্জন রহিত একটি পঙ্কের ন্যায় আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

† তোমার সেই সখা বায়ুতাড়িত দীপের ন্যায় পরলোকে গমন করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না। আমি নির্ব্বাপিত দীপের দশাবৎ অসহ্য দুঃখে ধূমিত হইতেছি দেখ।

সন্ধানে, তাহা সতত হীনপ্রভ; এজন্য মনুষ্য যৌবনে সচরাচর কার্য্যক্ষম হয় না। যৌবন অতীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, এবং ভোগাশক্তির অনধীন, এজন্য সেই কার্য্যকারিতার সময়। এই জন্য, আমার পরামর্শ, যে বুড়া হইয়াছি বলিয়া, কেহ স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তির ভাণ করিবে না। বার্দ্ধক্যেও বিষয় চিন্তা করিবে।

তোমরা বলিবে,এ কথা বলিতে হইবে না, কেহই জীবন থাকিতে ও শক্তি থাকিতে বিষয়চেষ্টা পরিত্যাগ করে না। মাতৃস্তন পান অবধি উইল করা পর্য্যন্ত আবাল বৃদ্ধ কেবল বিষয়ান্বেষণে বিব্রত। সত্য, কিন্তু আমি সেরূপ বিষয়ানুসন্ধানে বৃদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছি না। যৌবনে যে কাজ করিয়াছ, সে আপনার জন্য; তার পর যৌবন গেলে যত কাজ করিবে, পরের জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ। ভাবিওনা যে, আজিও আপনার কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না—পরের কাজ করিব কি? আপনার কাজ ফুরায় না—যদি মনুষ্যজীবন লক্ষবর্ষ পরিমিত হইত, তবু আপনার কাজ ফুরাইত না—মনুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা নাই—অন্ত নাই। তাই বলি, বার্দ্ধক্যে, আপনার কাজ ফুরাইয়াছে, বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও। এই মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর।

যদি বল, বার্দ্ধক্যেও যদি, আপনার জন্য হৌক, পরের জন্য হৌক, বিষয় কার্য্যে নিয়ত থাকিব, তবে ঈশ্বরচিন্তা করিব কবে?—পরকালের কাজ করিব কবে? আমি বলি আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীন কালের জন্য তুলিয়া রাখিবে কেন? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই—ইহার জন্য অন্য কোন কার্য্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর, এবং পবিশুদ্ধ হয়।

আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের এ সকল কথা ভাল লাগিতেছে না। তাঁহারা এতক্ষণ বলিতেছেন, তরঙ্গিণী যুবতীর কথা হইতেছিল—হইতে হইতে আবার ঈশ্বরের নাম কেন? এই মাত্র বুড়াবয়সের ঢেকি পাতিয়া, বঙ্গদর্শনের জন্য ধান ভানিতেছিলে—আবার এ শিবের গীত কেন? দোষ হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু, মনে মনে বোধ হয়, যে সকল কাজেই একটু একটু শিবের গীত ভাল।

ভাল হউক, বা না হউক, প্রাচীনের অন্য উপায় নাই। তোমার তরঙ্গিণী হেমাঙ্গিনী সুরঙ্গিণী কুরঙ্গিণীর দল, আর আমার দিকে ঘেঁষিবে না। তোমার মিল, কোম্‌ত, স্পেন্সর, ফুয়রবাক্, আর

মনোরঞ্জন করিতে পারে না। তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অসার—সকলই অন্ধের মৃগয়া। আজিকার বর্ষার দুর্দ্দিনে, —আজি এ কালরাত্রির শেষ কুলগ্নে, —এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশীথ মেঘাগমে—আমায় আর কে রাখিবে? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে, প্রখরবাহিনী বৈতরণীর আবর্ত্তভীষণ উপকূলে—এ দুস্তর পারাবারের প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা করিবে? অতিবেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে—অন্ধকার, প্রভো। চারিদিকেই অন্ধকার! আমার এ ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতের ভরে বড় ভারি হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে?

কেন ভাল বাসি ?

১

কি দিব উত্তর? আমি কেন ভাল বাসি?
আজি পারাবার সম, হায় ভালবাসা মম,
কেন উপজিল সিন্ধু, এই অম্বুরাশি,
কে বলিবে? কে বলিবে কেন ভালবাসি?

২

অনন্ত অতল সিন্ধু। পশি বারি তলে,
কেমনে বলিব বল, কোথা হতে নিরমল,
বহিল সে ক্ষুদ্রস্রোত, পরিণাম যার,
আজি প্রিয়তমে, এই প্রেম পারাবার।

৩

যে তরু অনন্য ছায়া হৃদয় আমার,
করিয়াছে, আজপ্রিয়ে! কেমনে চিরিয়েহিয়ে,
দেখাব সে পাদপের অঙ্কুর কোথায়?
কেন ভাল বাসি হায়! বুঝাব তোমায়।

৪

হায় রে হৃদয় যবে, কিশোর কোমল,
প্রেমের প্রতিমা তায়, কেমনে অঙ্কিত হায়
হইল অজ্ঞাতে, তুমি জান শশধর;
কেন ভালবাসি, তুমি দাওনা উত্তর।

৫

তুমি কাল! জান তুমি, নিরাশা-অনলে,
গোপনে হৃদয় মম, পুড়িয়া পাষাণ সম,
করিয়াছ, মুদ্রিয়াছ গভীর রেখায়
স্মৃতি অস্ত্রে, নিরুপম সেই প্রতিমায়।

৬

কত দিন কত বর্ষ। জান তুমি কাল।
এহৃদয় যার তরে, জ্বলিয়াছে স্তরে স্তরে,
ফাটিয়াছে বুক, তবু ফুটেনি বচন।
কেন ভাল বাসি তারে কহনা এখন।

৭

কেন বাসি ভাল? তুমি সচন্দ্র শর্ব্বরি,
দেখেছ প্রথম তুমি, এহৃদয় বনভূমি—
সুখময়, ঝলসিতে সে রূপ-কিরণে,
প্রবেশিতে দাবানল কুসুম-কাননে।

৮

ছিল এহৃদয় ক্ষুদ্র প্রেমসরোবর,
একটী নক্ষত্র তায়, ভাসিত, সে চিত্ত হায়!
কেন মরুময় আজি পিপাসা লহরী?—
কেন ভালবাসি, কহ সচন্দ্র শর্ব্বরি।

৯

শর্ব্বরি। তোমার অঙ্কে চাপিয়া হৃদয়,
হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি, মরিয়াছি, বাঁচিয়াছি,
দহিয়াছি, সহিয়াছি, তীব্র জ্বালা রাশি;
শর্ব্বরি! কহনা তুমি কেন ভাল বাসি।

১০

তব অন্ধকারে সখি, খুলিয়া হৃদয়,
দেখেছি অন্তরান্তরে, নিত্য যে বিরাজ করে
দেখিয়াছ তুমি সেই কৃপণের ধন,
হৃদয়-বাসিনী মম জীবন-জীবন॥

১১

দেখিয়াছ তুমি সেই মার্জ্জিত কুন্তল,
স্বকুন্তল কিরীটিনী, প্রেমের প্রতিমা খানি,
আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশ রাশি
দেখিয়াছ কহ তবে কেন ভাল বাসি।

১২

সে কেশ আঁধারে সেই রূপ কহিনুর,
সে বদন, চন্দ্র? নানা, সে আননপদ্ম? তা না,
পদ্মরাগে পূর্ণচন্দ্র মণ্ডিত মধুর।
প্রসন্ন সজল নেত্র, হায় তৃষ্ণাতুর।

১৩

এ হৃদয়ে, নিশীথিনি। জাগ্রতে নিদ্রায়,
যেই দৃষ্টি-সুধাদান, মাতিয়া বিমুগ্ধ প্রাণ
করিয়াছে সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ সুশীতল!—
কেন ভাল বাসি, নিশি, বুঝিলে সকল।

১৪

জীবন, যৌবন, আশা, কীর্ত্তি, ধন, মান,
তৃণবৎ ঠেলি পায়, আসিনু উন্মাদ প্রায়
যার কাছে; হায়! তার মন বুঝিবারে,
সে কি জিজ্ঞাসিল কেন ভালবাসি তারে?

১৫

তুমি পত্র, তুমি চিত্র—সর্ব্বস্ব আমার
অক্ষরে অক্ষরে-পত্রে, রেখায়রেখার-চিত্রে,
কত জিজ্ঞাসিয়া, কত কাঁদিয়াছি হায়।
কেন ভালবাসি, আহা বলনা তাহায়।

১৬

কেন ভালবাসি প্রিয়ে, বলিব কেমনে,
কোথা আমি, কোথা তুমি, মধ্যে এই মরুভূমি
নির্ম্মম সংসার,—কিসে শুনিবে সুন্দর
হৃদয়ে হৃদয়ে যার সম্ভবে উত্তর।

১৭

কেন ভালবাসি যদি শুনিতে বাসনা,
নিষ্ঠুর সংসার ধাম, ছাড়ি বনে যাই প্রাণ,
সাজিয়া নবীন যোগী, নবীন যোগিনী,*
প্রণয়-সঙ্গীতে ভাসি দিবস রজনী।

১৮

খাব বন ফল মূল, পরিব বাকল,
সাজাইয়া বনফুলে, বসি বন-স্রোত-কূলে,
কব বনদেবী-পদে, প্রণয়ে উচ্ছ্বাসি,
নির্ঝরের কলকলে, কেন ভালবাসি।

১৯

চল উচ্চগিরি-শৃঙ্গে বসিয়া নির্জ্জনে,
রবিকরে মনোলোভা, দেখি দূর সিন্ধুশোভা,
প্রকৃতির সান্ধ্য শোভা নিরখি নয়নে,
কব কেন ভালবাসি প্রেমানন্দ মনে।

২০

কপোত কপোতী মত মুখে মুখ দিয়া,
তরুলতা আলিঙ্গিয়া বসিবে, চঞ্চল হিয়া
নাচিবে, সতৃষ্ণনেত্রে চাহিয়া তোমায়,
কেন ভাল বাসি, কবে নীরব ভাষায়।

* তাই ত! বং সং।

২১

পারিবে না? ভীমরবে পশিবে তথায়
সংসারের কোলাহল? অতল জলধিতল
অগম্য তাহার—চল পশিগে তথায়,
কেন ভালবাসি প্রাণ। কহিব তোমায়।

২২

না পার, দাঁড়াও তুমি সংসার বেলায়,
প্রেমের প্রতিমা খানি, দেখিতে২ আমি
ডুবিব, ঢাকিবে যবে নীল অম্বুরাশি
চাহিও, বুঝিবে হায় কেন ভালবাসি।

আমাদের গৌরবের দুই সময়।

উপক্রমণিকা।

(সময় তালিকা উদ্ধারের চেষ্টা বিফল।)

যে দিন হইতে সর উইলিয়ম জোন্সের অনুবাদিত শকুন্তলা ইয়ুরোপে প্রচারিত হইল সেই দিন হইতে ভারতবর্ষের ক্রনলজি বা সময়তালিকা নির্ণয়ার্থ চেষ্টা হইতেছে। সর উইলিয়ম জোন্স নিজে, উইল্‌সন্ কোলব্রুক মাক্সমুলর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ কেহ জ্যোতিষগণনা, কেহ পুরাণ, কেহ ভোজপ্রবন্ধ, কেহ বা তাম্রফলকাদি লইয়া এই সময় তালিকা উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। আজি এক-জন মহামহোপাধ্যায় "অমোঘযুক্তি" "অভ্রান্ততর্ক" এবং "অকাট্য প্রমাণ" বলে "এ বিষয়ে আর সন্দেহ হইতে পারে না ইহাতে কোন রূপ ভ্রম নাই" এই-রূপ জোরে২ লিখিয়া এক পূর্ণতালিকা দিয়া গেলেন, কালি আর একজন উঠিয়া সেই অমোঘযুক্তি অভ্রান্ততর্ক ও অকাট্য-প্রমাণ বলে সেইরূপ জোর জোর কথায় তাহার সব উল্টাইয়া দিলেন। অথচ উভয়েরই যুক্তি এক, প্রমাণ এক ও তর্ক এক। এইরূপ ৭০।৮০ বৎসর চলিয়া আসিতেছে। কত মত যে প্রচারিত হইল বলা যায় না। কিন্তু যাহা হইবার নয় তাহা তুমি আমি চেষ্টা করিলেও হইবে না, দিগ্‌গজ পণ্ডিতে চেষ্টা করিলেও হই-বেনা। গ্রীক সময় তালিকানির্ণয়চেষ্টা ২০০০ বৎসর পরে বৃথা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

(পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় চেষ্টাও বৃথা)

ইঁহাদের মধ্যে একদল আর দিন মাস বৎসর নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করেন না। কেবল পৌর্ব্বাপর্য্য অর্থাৎ কে কাহার পরে বা পূর্ব্বে নির্ণয় করিবার জন্য মাত্র প্রয়াস পান। ইহাদের দ্বারা কতক উপ-কার হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইঁহাদেরও নির্ণয়প্রণালী অপূর্ব্ব। আজি কালিদাসের মধ্যে ভবভূতির ভাবের একটী কবিতা পাইয়া একজন বলিলেন "কালিদাস ভব-ভূতির পর।" কালি আর এক জন (যিনি আগে কালিদাস পড়িয়াছেন) বলিলেন "ভবভূতিই ও স্থলে কালিদাসের অনু-কর্ত্তা।" কে সত্য কে মিথ্যা জানিবার কোন

উপায় নাই অথচ উভয়েই প্রাণ দিবেন সেও স্বীকার মত ত্যাগ করিবেন না। যেমন কাব্যাদিতে তেমনি দর্শনেও। আজি গৌতমসূত্রে বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ নিরাকরণ দেখিয়া বলিলাম গৌতম আগে, বুদ্ধ পরে; কালি হয় ত বৌদ্ধ সূত্রে ন্যায় শাস্ত্রের পরমাণুবাদ নিরাকৃত দেখিব। সাংখ্য বেদান্ত ন্যায় প্রভৃতি প্রাচীন সূত্র সমূহে পরস্পর মতের খণ্ডন মুণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় কি রূপে হইবে?

(মতোন্নতি পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় সম্ভব নহে)

আর একদল একটু ঘুরাইয়া বলেন যে গ্রন্থকার ও গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় না হউক মনুষ্যের মানসিক উন্নতি, মতের উন্নতি লইয়া কতকটা সময় তালিকা নির্ণয় হইতে পারে। তাঁহারা ইয়ুরোপের মানসিক উন্নতির ইতিহাস জানেন ভারতবর্ষে সেই সকল নিয়ম প্রয়োগ করিয়া সময় তালিকা উদ্ধার সম্ভব এই তাঁহাদের বিশ্বাস। কিন্তু ইয়ুরোপের নিয়ম ভারতবর্ষে খাটিবে কি?

(এইরূপ নির্ণয় চেষ্টায় কি উপকার দর্শিয়াছে।)

এইরূপে প্রায় ১০০ এক শত বৎসর পৃথিবীশুদ্ধ লোক সময় তালিকা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। কেহই কিছু করিতে পারিতেছে না—কিন্তু বিধাতার এমনি আশ্চর্য্য নিয়ম যে একেবারে নিগুর্ণ ও নিষ্প্রয়োজন জগতে কিছুই নাই। এই নির্ণয় প্রস্তাবে অনেক নূতন সংবাদ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ঈশপের গল্পে যেমন ক্ষেত্রমধ্যে স্বর্ণ না পাওয়াগেলেও প্রচুর শস্য লাভ হইয়াছিল, সেইরূপ সময় নির্ণয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও উহাতে সুধাময় ফল উৎপাদন করিয়াছে।

(আমরা জানিয়াছি আমাদের দুইটী গৌরবের দিন ছিল।)

এই সমস্ত নূতন খবর ও পুরাতন যাহাছিল একত্র সংগৃহীত হইলে দেখা যাইবে ভারতবর্ষের মনের গতি কোন দিকে ধাবিত। সমাজের গতি রীতিনীতি কোন পথে চলিয়া আসিয়াছে। বরাবর কোন একটা সময় তালিকা ধরিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে আমাদের দেশে শাস্ত্রচর্চ্চা কোন কালেই একেবারে বন্ধ ছিল না ইহাদের বুদ্ধির চালনা কখন রহিত হয় নাই। হয় দর্শন, নয় স্মৃতি, না হয় পুরাণ—কিছু না হয় কাব্য ব্যাকরণ গণিত বরাবর রচিত হইয়া আসিয়াছে। কেবল দুই সময়ে এইরূপ শাস্ত্রচর্চ্চা অত্যন্ত প্রবল হয়। ঐ দুইটীই ভারতবর্ষের প্রধান সময়, ইহাই আমাদের গৌরবের দিন। একটি হিন্দুস্থানের আর একটী দক্ষিণের। একটীতে মৌলিকতা পরিপূর্ণ—অপরটীতে প্রকৃষ্টরূপ চর্চ্চামাত্র; মূলের দোহাই অধিক কিন্তু মৌলিকতারও কমি নাই। একটির প্রভাবে সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ কম্পিত হয়, আর একটির প্রভাব ভারতবর্ষীয় জাতি মাত্রে পর্য্যবসিত। একটীর চরম ফল উন্নতি, আর একটীর ফল অধোগতি।

তথাপি প্রথমটি দ্বিতীযটীব মূল, প্রথমটি না হইলে দ্বিতীষটির নামও শুনিতে পাইতাম না। জিজ্ঞাসা হইতে পাবে তবে কিরূপে ফল দুই প্রকাব হইল। উত্তব। সমাজেব অবস্থায়; কতকটা দৈবই বল আব অদৃষ্টই বল আর অনুল্লঙ্ঘনীয় সামাজিক নিয়মই বল একটী হইতে সুধাময় অপবটি হইতে বিষময ফল জন্মিয়াছে। প্রথমটি প্রবল অর্থাৎ সমাজিক উন্নতিই মূল পরমার্থ তত প্রবল নহে—অপবটিতে হাই চর্চ্চ টোবি মত; উন্নতির গন্ধও নাই। সবই পবমার্থ—ইহলোকেব নামও নাই।

এই দুইটী সময়ের বিশদ সবিস্তাব বর্ণনা প্রদান কবিলে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসেব দুইটী অতি জটিল অংশ পবিষ্কাব হইতে পারে। যে আর্য্য আর্য্য কবিয়া দেশশুদ্ধ লোক ব্যতিব্যস্ত, যে আর্য্যনাম বঙ্গীয় যুবকেব মুখে দিবানিশি ধ্বনিত, সেই আর্য্যগণেব প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ছিল—এবং যে গৌবব তাঁহাদের উপব দিয়া আমরা তাহার অংশ আদায় কবি, সে গৌববেব তাঁহাবা কতদূব অধিকাবী ছিলেন জানা যাইতে পারে। কোন জাতির ইতিহাস ধারাবাহিক পাঠ অপেক্ষা কোন বিষম বিপ্লবের সময় তাহাদের ইতিহাস উত্তম রূপে দেখিতে পারিলে তাহাদের স্বভাব বিলক্ষণ বুঝা যায়। বিপদের সময় নহিলে মনুষ্যের কত ক্ষমতা জানিতে পাবা যায় না—সে কত দূর কাজ করিতে পারে কতদূর চিন্তা কবিতে পাবে কতদূব সহ্য কবিতে পাবে বলা যাষ না। জাতীয স্বভাবও ঠিক সেই রূপ।

সম্ভবতঃ এই দুইটী বুদ্ধি বিপ্লবেব একটি যীশু খৃষ্টেব জন্মেব পূর্ব্বে ৯০০ বৎসব হইতে আবম্ভ হইযা ৪০০ বৎসব সমান তেজে সুফল প্রদান কবে। অপবটি খৃষ্ট জন্মেব ৬০০ বৎসব পবে আবম্ভ হইযা ৩০০ বৎসব ধবিয়া ভাবতেব পুনঃসংস্কাব কবে। প্রথমটীতে বৈদিক উপদ্রবেব শেষ হয। দ্বিতীষটীতে পৌবাণিকদিগেব শ্রীবৃদ্ধি হয। প্রথমটীব প্রভাবে সমস্ত ভাবতে বিদ্যুৎ সঞ্চাব হয, দ্বিতীষটীতে একজাতিব একাধিপত্য সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হয অথচ দুইটীতেই আমাদিগেব সমান গৌবব। আমাদের সমান সম্মান। প্রথম বিপ্লবেব কথা অনেকে বলিযাছেন এজন্য এখানে সংক্ষেপে মাত্র বলিব। দ্বিতীযটীব বর্ণনাব বিস্তাব আবশ্যক যেহেতু সে কথাব এ পর্য্যন্ত কেহ উল্লেখ কবেন নাই।

প্রথম অধ্যায়।

(প্রথম বিপ্লবেব প্রাধান্যও প্রয়োজন।)

প্রথম বিপ্লবটী ইউয়োপীয় পণ্ডিতেবা সকলেই স্বীকাব কবিয়া থাকেন। উহাব প্রভাব অসীম বহুকাল স্থাযী ও জগদ্ব্যাপী। উহার প্রভাব ভারতবর্ষবাসীদিগেব হাড়েং বিঁধিয়া আছে, ৩০০০ তিন সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে তথাপি উহার শক্তির অণুমাত্র হ্রাস হয় নাই। ভারত-

চবিত্রে অনেক মলা পড়িয়াছে অনেক উন্নতিও হইগাছে [অনেকে যে বলেন কেবল অধঃপাতে গিয়াছে তাহা আমবা স্বীকাব কবি না] কিন্তু আদত আজিও ঠিক আছে। উপরিউক্ত বিপ্লবে আমাদিগকে যাহা কবিয়াছে আমবা আজিও তাহাই আছি। ভাবতচবিত্রে ভাবত অদৃষ্টে সেই সমযে যে শিল পডিয়াছে সেই মোহবেব অঙ্ক আজিও বর্ত্তমান আছে। শুদ্ধ ভাবত নয় এসিয়াও এই বিপ্লবেব ফলভাগী। এসিয়াব অদৃষ্টও উহা হইতে ফিবিযাছে, এসিয়াব সভ্যতাও ঐ বিপ্লবেব ফল। এসিযাব দুববস্থাও ইহাব স্কন্ধে ন্যস্ত হইতে পাবে। এমন কি এই তিন সহস্র বৎসব ধবিযা ইউবোপও অনেক অংশে উহাব নিকট ঋণী। এবং এই যে ঊনবিংশ শতাব্দী ঊনবিংশ শতাব্দী বলিযা ইউবোপ এত জাঁক কবেন, সংস্কৃত সাহিত্য আবিষ্কার কি সেই ঊনবিংশ শতাব্দীব মহীয়সী উন্নতিব অন্যতম উদ্দীপন কাবণ নহে? যেমন ষোডশ শতাব্দীতে ইউবোপে গ্রীকবিদ্যাব প্রথম প্রচাবে ও প্রথম আলোচনায় একটী প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হয় সংস্কৃত সাহিত্য আবিষ্কার সংস্কৃতশাস্ত্র আলোচনাও ততদূর হৌক আর নাই হৌক ইউরোপীয় উন্নতিকে দ্রুত গতি প্রদান করিয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সংস্কৃত সাহিত্য,'সংস্কৃত বিজ্ঞান, সংস্কৃত দর্শনও উপরোক্ত বিপ্লব হইতে উৎপন্ন। অতএব সেই বিপ্লবের নিকট পৃথিবী শুদ্ধ ঋণী এজন্য উহাব কাবণ স্থিতি উৎপত্তিফল ও প্রভাব সংক্ষেপে অবগত হওয়া আবশ্যক।

(বিপ্লবের পূর্ব্বতন অবস্থা।)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি খৃষ্টেব ৮।৯ শত বৎসব পূর্ব্বে ভাবতবর্ষীয় দিগেব মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। তাহার কাবণ নির্দ্দেশ কবার পূর্ব্বে তাহার আগে আর্য্যসমাজেব অবস্থা কিরূপ ছিল জানা উচিত। জানিবাব কিন্তু কোন উপাযই নাই। কেবল অনুমান মাত্র। অনুমানে বোধ হয় ইহাব পূর্ব্বে আর্য্যজাতি পঞ্জাবে বাস কবিতেন। তাহাদেব মধ্যে ব্যবসায গত বিভিন্নতা ছিল বটে কিন্তু জাতিভেদ ছিল না। কেহ পুবোহিত ছিলেন,কেহ শাসনকর্ত্তা ছিলেন, কেহ কৃষিব্যবসায়ী ছিলেন কেহ বা অন্যান্য ব্যবসায় করিতেন। প্রথম পঞ্জাব আধিপত্য। আধিপত্য বিস্তাবেব সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মেব প্রভাব বৃদ্ধি হইল। পুরোহিতদিগেব ক্ষমতা বৃদ্ধি হইল। আর্য্যভূমি যাগযজ্ঞময় হইয়া উঠিল; রাজসূয় অশ্বমেধ বাজপেয় সোমযাগ শ্যেনযাগ কাবীর যাগ প্রভৃতি বড়২ যজ্ঞ হইতে লাগিল। পুবোহিতেবা ক্রমে একদল ক্রমে একজাতি ক্রমে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। বাজারা কেবল যুদ্ধেব সময় প্রাণ দিবাব জন্য রহিল। ক্রমে সমাজের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নূতন দেশ অধিকার আবশ্যক হইল। আর্য্যগণ পঞ্জাবসীমা অতিক্রম করিয়া হিন্দুস্থানে উপস্থিত

হইলেন। দিনকতক শতানীরা তাঁহাদের পূর্ব্বসীমা হইল। শেষ তাহারও পূর্ব্ব পারে আর্য্যগণের বাস হইতে লাগিল। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যগণ মিথিলার পূর্ব্বে যে কখনও আসেন নাই তাহা এক প্রকার স্থিরই। কারণ ব্রাহ্মণাদি প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গদেশের নামও শুনা যায় না। ব্রাহ্মণেরা এই নূতন দেশে আধিপত্য করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু এ সকল দেশ ক্ষত্ররুধিরে অর্জ্জিত; তাহারা বিরোধী হইল। এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিরোধ পূর্ব্বোক্ত বিপ্লবের একটী কারণ। ব্রাহ্মণেরা যেমন একটি দল জাতি হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়েরাও নূতন দেশে তাহাই হইলেন। আর্য্যগণ তিন জাতিতে বিভক্ত হইল। পুরোহিতগণ ব্রাহ্মণ,যোদ্ধৃগণ ক্ষত্রিয়, অবশিষ্টগণ বিশ্‌ অর্থাৎ প্রজা। তাহার নীচে পরাজিত অনার্য্যগণ ছিল। *চাতুর্ব্বর্ণ বিভাগ হিন্দুস্থানেই হয়।* পঞ্জাবে এরূপ বিভাগ ছিল কি না সন্দেহ। প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায় আর্য্যগণ প্রথম যে দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেন তথাকার অদিম অধিবাসী দিগকে সমূলে বিনাশ করিতেন। পঞ্জাবেও বোধ হয় তাহাই হইয়াছিল। চাতুর্ব্বর্ণ বিভাগ যে হিন্দুস্থানে হয় তাহার আর এক কারণ এই মনুর বর্ণধর্ম্মগ্রন্থে (মনুসংহিতায়) হিন্দুস্থানেরই প্রাধান্য অধিক। আমরা যে অনার্য্যদিগের নাম করিলাম তাহারাও নিতান্ত নির্ব্বিরোধী ছিল না। তাহাদের ধর্ম্ম ছিল, রাজ্য শাসনপ্রণালী ছিল, সভ্যতা ছিল। তাহাদিগের দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বজ্ঞতার প্রতি লোকের সন্দেহ হইতে লাগিল। এই অনার্য্যজাতির সম্পর্কই উপরিউক্ত বিপ্লবের দ্বিতীয় কারণ। ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি অনুসারে অনেকে পৌরোহিত্য ত্যাগ করিয়া জ্ঞানোন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য উপাধ্যায় হইতে লাগিলেন। ঋষি মুনি হইতে লাগিলেন। আর একদল ব্রাহ্মণ অন্যান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। মনুতে ব্রাহ্মণদিগকে কৃষিবাণিজ্য ও কুসীদ গ্রহণ করিবার আজ্ঞা দেওয়া আছে; যিনি যে ব্যবসারই করুন সকলেই স্বজাতির প্রাধান্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর। ক্ষত্রিয় রাজাদের অনেকেও ব্রাহ্মণ দিগের পক্ষ। বিশেষ পঞ্জাবস্থ ক্ষত্রিয়গণের ত ব্রাহ্মণদিগের বিরোধী হইবার *কোন উপায়ই ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মণ* দিগের একটি প্রকাণ্ড দল হইল। অপরদিকে হিন্দুস্থানের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ উৎপীড়িত অনার্য্যগণ আর এক দল একেবারেই আর্য্য অধিকারের প্রতি দ্বেষবান্। বিশেষ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অভক্তি।

বিপ্লবের কারণ।

ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য ও অনার্য্য সভ্যতার সম্পর্ক, এই দুইটীই উপরিউক্ত মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ। ঋষিদিগের কোন প্রণালীবদ্ধ শাসন ছিল না, সেও একটী কারণ। ঋষিরা আপন আপন তপোবনে আপন আপন মতানু-

যায়ী উপদেশ দিতেন। তাঁহাদের উপরে কাহারও তত্ত্বাবধারণ করিবার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহাদিগের মধ্যেও আবার অনেকে স্বজাতিদিগের অত্যাচারে অত্যন্ত ক্ষোভ করিতেন এবং অনেকে প্রকাশ্য ভাবে ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যোগ দিতেন। জাবালি মুনি যে উপদেশ দিতেন তাহা একপ্রকার চার্ব্বাকদর্শন বলিলেও হয়। বশিষ্ঠাদি দশরথের সহিত রাম পরশুরামের সহিত বিবাদ করেন, তাহাও পুরাণাদিতে শুনা যায়। পুনশ্চ লেখাপড়া শিখিবার কোন বাধাই ছিল না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলেই দুই একটা বিষয় ভিন্ন প্রায় সমান শিক্ষা পাইত। সুতরাং তিন জাতিরই মানসিক উন্নতি যথেষ্ট হইত। কেবল যাগ যজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগেরই হস্তে থাকিত। জনক রাজা তাহাও করিতে দিতেন না। তিনি স্বয়ং সকল কার্য্য করিতেন। তিনি নিজে ঋষিদিগের ন্যায় শিক্ষা দিতেন। এইরূপ অনেকগুলি ক্ষত্রিয় রাজর্ষিও ছিল। সুতরাং, যাগযজ্ঞাদি ভিন্ন সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অন্ততঃ একপ্রকার শিক্ষাই পাইতেন। অনার্য্যগণ যাহারা নূতন অধিকৃত হইয়াছিল তাহাদের অনেকেই আর্য্যদিগের দলে ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। এবং অধিকাংশ শূদ্রনামে একটী স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। অনেকে বনদুর্গ জলদুর্গ ও গিরিদুর্গ মধ্যে স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। শূদ্রদিগের মধ্যে আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকলাপ জাজ্বল্যমান ছিল। উহাদের অনেকেই ব্রাহ্মণদিগকে এমন কি সমস্ত আর্য্যজাতিদিগকে ঘৃণা করিত। উহারা স্বতন্ত্র আইনে শাসিত হইত এমন কি উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আজিও শূদ্রেরা আমাদের আইন অনুসারে চলে না। দায়ভাগে শূদ্রের উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। উহাদের মধ্যে প্রবীণেরা অনেকেই কেবল অবসর প্রতীক্ষায় ছিল। যে সকল অনার্য্যেরা অধীনতা স্বীকার করে নাই, তাহারাও স্বজাতীয়দিগকে সাহায্য করিতে ত্রুটী করিত না। তাহারা আপন ধর্ম্মে রত থাকিয়া ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম কর্ম্মের নানা ব্যাঘাত করিত এবং উপহাসাদি করিত। প্রতি বনে প্রতি পর্ব্বতে প্রতি দুর্গে অনার্য্যদিগের স্বাধীনতা ছিল। ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ সমাজনিয়ম তাহাতে বৃহৎরাজ্যস্থাপন একপ্রকার অসম্ভব। আর্য্যভূমি নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রায় দেখা যায় ক্ষুদ্র রাজ্যে সভ্যতা ও সুনিয়ম প্রবেশ করিলে শীঘ্র শীঘ্রই তাহার উন্নতি লাভ হয়।

(পূর্ব্বোক্ত বিপ্লবের প্রকৃতি।)

এইরূপ মিশ্রিত সমাজে স্বাধীনভাবে চিন্তা প্রবল হওয়া একান্ত সম্ভব। তাহাতে আবার দুই সভ্যজাতির বহুকাল ধরিয়া একত্র বাস। তুলনা সামগ্রী লোকের চক্ষে দুই বেলা। এইখানে অনার্য্যগণ আমাদের অপেক্ষা ভাল এইখানে মন্দ। এই এই স্থলে আমাদের পরিবর্ত্তন আবশ্যক এই এই স্থলে আমা-

দের নিয়ম অনার্য্যগণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই তুলনা একবার আরম্ভ হইলেই লোকের মানসিক প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বৈরীভাব হেতু সেই পরিবর্ত্ত সত্বর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে হিন্দুস্থানের আর্য্যগণ পঞ্জাব ও কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আপনাদিগকে নিকৃষ্ট মনে করিতে লাগিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা আর্য্যগণের তৎকালীন ইতিবৃত্ত ভাল জানি না কেবল নানা শাস্ত্রীয় কতকগুলি পুস্তক পড়িয়া অনুমান করি মাত্র। কিন্তু অনার্য্যসমাজের কোন সম্বাদই জানি না; জানিবার উপায়ও নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে দুই জাতির সংঘর্ষে মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। পরিবর্ত্তন সময়ে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হয়। সে কাণ্ড পরে লিখিব। এখন সেই মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বোক্ত পুরোহিত, অধ্যাপক ও অন্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণসপক্ষ ও বিপক্ষ ক্ষত্রিয় সংক্ষেপে, সমস্ত আর্য্য এবং অনার্য্যসমাজ কি আকার ধারণ করে তাহাই লিখিতেছি। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন সভ্যতার লক্ষণ দেওয়া বড় কঠিন। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় সভ্যতার দুই মূর্ত্তি আছে (১) আন্তরিক (২) বাহ্যিক। উপরিউক্ত ভারতবর্ষীয় বিপ্লবে দুই মূর্ত্তিরই উন্নতি হয়।

(১) মানসিকবৃত্তির উন্নতি দুই প্রকার (ক) বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি ও (খ) হৃদয়বৃত্তির উন্নতি।

(ক) বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি দর্শনগণে প্রকাশ আছে। সময়তালিকা মাত্রেই দর্শনগুলিকে এই বিপ্লব কালে রচিত স্থির হইয়াছে। এই কয় শতাব্দীতে উহাদের উৎপত্তি স্থিতি ও সংগ্রহ। যুগপৎ সমস্ত হিন্দুস্থানে নানা মতের উৎপত্তি হয়। আজি একজন জগৎ শূন্যময় বলিলেন। কালি আর একজন বলিলেন ক্ষণিক জ্ঞান মাত্র সত্য। পরশ্ব একজন প্রত্যক্ষবাদ সৃষ্টি করিলেন। আজি একজন বলিলেন চক্ষের জ্যোতি পদার্থে পড়িয়া পদার্থের উপলব্ধি হয়। কালি আর একজন ঠিক বিপরীত মত চালাইয়া দিলেন। এক অঞ্চলে আত্মার অনাদিনিধনত্ব প্রমাণ হইল আর এক অঞ্চলে আত্মা অনিত্য বলিয়া দেহের সহিত ভস্মসাৎ হইয়া গেলেন। একেবারে শত শত মতের উৎপত্তি হইল। ক্রমে এই সকল মতের সংগ্রহ আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণ পক্ষীয়দিগের মত ছয়জনে সংগ্রহ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা এই ষড্‌ দর্শনের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন; গোতমাদি নিজে সংগ্রহকার মাত্র। তাঁহাদের নিজের মতও তাঁহাদের পুস্তকে অনেক আছে। বিশেষ অনেক চলিত মতের তাঁহারা সমালোচনা করিয়া সমুদয় পুস্তকে এরূপ মৌলিকতা ও চিন্তাশীলতা প্রকাশ করিলেন যে পরবর্ত্তী লোকে জানিল যে ঐ

সকল মত তাঁহাদের নিজেরই। তাঁহারা নানামতের সমালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা সকল গ্রন্থেই সকল মতের খণ্ডন মুণ্ডন দেখিতে পাই। সুতরাং তাহা দেখিয়া সাংখ্য ন্যায়ের পর বা ন্যায় সাংখ্যের পর এরূপ বিবেচনা হইতে পারে না। এমন হইতে পারে ন্যায়সূত্রকার মিথিলায় বসিয়া বুদ্ধির নিত্যতা খণ্ডন করিলেন। সাংখ্য সূত্রকার পঞ্জাবে বসিয়া বুদ্ধিনিত্যতার উপর সমস্ত সাংখ্যশাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। বুদ্ধিনিত্যতা মত তাঁহাদের কাহারই নিজের নয়। অথচ তৎকালে প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণবিরুদ্ধপক্ষীয়দিগের মধ্যেও পূর্ব্বোক্তরূপ সংগ্রহ হইল। ব্রাহ্মণবিরুদ্ধমতে কয়খানি দর্শন সংগ্রহ ছিল ও তাহাদের কি প্রকার ভাব জানিবার উপায় নাই। অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের দর্শনাবলী অধ্যয়ন করিলে অনেক দূর বলা যাইতে পারে কিন্তু ঐ সকল দর্শন আজিও মুদ্রিত হয় নাই। এখন এই পর্য্যন্ত বলা যায় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা আর না করা ব্রাহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণবিরোধী দর্শন নির্ণয়ের উপায়। তোমরা যতদূর স্বাধীন ভাবে চিন্তা করনা বেদের প্রামাণ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিলেই ব্রাহ্মণেরা তোমাকে আপন দলভুক্ত করিয়া লইবে। নচেৎ তোমাকে নাস্তিক বলিয়া বাহির করিয়া দিবে মনু এ বিষয়ের সাক্ষী।

যোঽবমন্যেত তে মূলে (শ্রুতিস্মৃতী) হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥

(যে কেহ হেতুশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মের মূল শ্রুতি ও স্মৃতিকে অপমান করিবে সে নাস্তিক বেদ নিন্দক। তাহাকে সাধুরা সমাজচ্যুত করিবেন।) বেদের বিরুদ্ধে হেতু প্রয়োগ করিলেই নাস্তিক ও সাধুদিগের বহিষ্কার্য্য হইল। নচেৎ সকল মতেই ধর্ম্ম। এক্ষণে প্রমাণ হইল ষড় দর্শন, ষড় দর্শনের মূল উপনিষদ, ও ব্রাহ্মণবিরোধী দর্শন এই কালের।

(খ) হৃদয় বৃত্তির উন্নতিও এই সময়ে যথেষ্ট হয়। বিস্তারে তৎকালীন সমাজের হৃদয়বৃত্তির উন্নতি বর্ণন করিতে গেলে, "পুঁথি বেড়ে যায়।" এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে এই কালে ধর্ম্মশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি যাহা ছিল তাহা যাগ যজ্ঞ লইয়া এবং নারশংস, পুরাকল্প প্রভৃতি পুরাণ ও গল্প লইয়া ব্যস্ত থাকিত। এই কালে যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র হয় তাহাতে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি, পুত্রের পিতা মাতার প্রতি, গৃহস্থের অতিথির প্রতি, রাজার প্রজার প্রতি, শিষ্যের গুরুর প্রতি, কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা বিস্তাররূপে বর্ণিত আছে। মনুষ্য মনুষ্যের প্রতি অনেক অধিক পরিমাণে সদ্ব্যবহার করিতে শিখে। এমন কি অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি যেমন মনুষ্যের প্রতি তেমনি পশুপক্ষীর প্রতি ব্যবহার করিতে

উপদেশ দেন। যাহা আজিও কোন ধর্ম্মে কোন দেশে হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই, সেই সর্ব্বভূত প্রতি দয়া প্রচার হয় এবং কার্য্যে পরিণত হয়। ব্রাহ্মণেরাও সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের নিজের স্বার্থরক্ষার্থ উহার অনেক বিশেষ নিয়ম করিয়াছিলেন। সেই সকল বিশেষ নিয়মও এত অধিক যে সাধারণ নিয়ম কথায় মাত্র পর্য্যবসিত হয়। তাঁহাদের বিরোধী সর্ব্বভূতে দয়া যেমন মুখে প্রচার করিতেন বিশেষ নিয়মও তেমনি অবজ্ঞা করিতেন। সুতরাং বাক্য ও কার্য্য উভয় প্রকারেই তাঁহারা সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে প্রধান বলিতেন, অবশিষ্ট মনুষ্যের উপর আধিপত্য প্রকাশ করিতেন, শূদ্রদিগকে দাস করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রাণিহিংসা করিতেন। তাঁহাদের বিরোধীরা সর্ব্বমনুষ্যকে সমানাধিকার প্রদান করেন ও অহিংসা প্রচার করেন। এই পর্য্যন্ত আন্তরিক উন্নতি। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মশাস্ত্রেই হৃদয়বৃত্তিগত উন্নতি বিশেষ দৃষ্ট হয় সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু যতদিন বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রচার না হয় ততদিন বলা যায় না সে উন্নতি কতদূর দাঁড়াইয়া ছিল। মনু একস্থানে লিখিয়াছেন যাগ যজ্ঞ সন্ধ্যা বন্দনাদি না করিয়াও যদি লোকে সত্য, শৌচ, দয়া, আর্জ্জব দশধা ধর্ম্ম আচরণ করে তবে সে স্বর্গলাভ করিবে। অর্থাৎ তিনি সমাজধর্ম্মকে পারত্রিক ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) বাহ্যিক উন্নতি সমাজবন্ধনকে বলা যায়। এই সময় আইনের* সৃষ্টি হয়। রাজনীতি দণ্ডনীতির সৃষ্টি হয় ঋণাদান প্রভৃতি অষ্টাদশ বিবাদ পদের সৃষ্টি হয়। সমাজ আইন তন্ত্র হয়—আইনই প্রবল আইনের রক্ষক ব্রাহ্মণ রাজা নহেন। রাজার ক্ষমতা অসীম কিন্তু তাঁহাকে আইনমতে চলিতে হইবে নচেৎ নরকে যাইতে হইবে। ব্রাহ্মণদিগের গ্রন্থে রাজা অত্যাচারী হইলেও তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ স্পষ্টাক্ষরে উপদিষ্ট নাই প্রত্যুত দোষ বলিয়া লেখা আছে। কিন্তু তাহারই পরে লেখা আছে অমুক অমুক অত্যাচারী রাজার অদৃষ্টে অমুক অমুক দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল সুতরাং যদিও প্রকাশ্যে রাজদ্রোহ প্রচার করুন আর না করুন তাঁহারা অত্যাচারী রাজাকে অধিক দিন রাজত্ব করিতে দিতেন না। বৌদ্ধদিগের রাজ্যশাসনের বিষয় ঠিক বলা যায় না কিন্তু বৌদ্ধ সমাজ ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে অনেক অংশে উন্নত ছিল। একজন

* আমাদের স্মৃতিতে পারত্রিক ধর্ম্ম (religion) লৌকিক ধর্ম্ম (morals) ও দণ্ডনীত্যাদি তিনই উক্ত হইয়াছে আধুনিক সভ্যসমাজে তিনটীর জন্য তিন প্রকার শাস্ত্র আছে। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদিতে পারত্রিক ধর্ম্মের উপদেশ আছে, লৌকিক ধর্ম্ম ও দণ্ডনীত্যাদি এই সময়েই রচিত।

ইংলণ্ডীয় ইতিহাসবিদ বলেন আর্য্য জাতির রাজ্যশাসন অতিপ্রাচীনকালে সর্ব্বত্রই একরূপ ছিল। কি গ্রীস কি জর্ম্মাণি কি হিন্দুস্থান সর্ব্বত্র একজন রাজা তাঁহার পর কতকগুলি জ্ঞানী বড়লোক তাহার নীচে আর্য্য জাতীয় সাধারণ লোক তাহারনীচে দাস (আর্য্য ও অনার্য্য)। দাসভিন্ন সকলেরই রাজ্যমধ্যে কথা থাকিত। এরূপ সমাজে বৃহৎ রাজ্য স্থাপন হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ সমাজে ঠিক এইরূপ ছিল। বৌদ্ধ সমাজে বোধ হয় গোড়া হইতেই চীনের মত কোমল প্রাকৃতিক যথেচ্ছাচার প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ পুরোহিতেরা ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ঐহিক ক্ষমতা গ্রহণার্থ প্রসারিতহস্ত ছিলেন না। কিন্তু বৌদ্ধ দিগের কথা আজি আমরা কিছু বলিলাম না।

সামাজিক ব্যতীত সাংসারিক উন্নতি বিষয়ে অনেক লেখা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে চর্ব্বিতচর্ব্বণ নিষ্প্রয়োজন। মন্বাদি গ্রন্থে জলপাত্র ভোজনপাত্র আহারীয় দ্রব্যাদি সকল কথাই আছে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অনেক দূর উন্নতি হইয়াছিল। খাদখননাদি কার্য্য, পথ নির্ম্মাণ ধর্ম্মকর্ম্ম মধ্যে গণিত থাকায় রাজার আর পবলিকওয়ার্কস্ বলিয়া একটি সর্ব্বভুক্ ডিপার্টমেণ্ট রাখিতে হইত না। এবিষয়েও হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধদিগের উন্নতি অধিক।

আমরা ইতিপূর্ব্বে তদানীন্তন হিন্দুস্থান্ সমাজকে যে কয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। বুদ্ধিবিপ্লব উপলক্ষে সকলেই উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সকল দলেরই লিখিত পুস্তক আছে। পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ হইতে আমরা কল্প, গৃহ্য প্রভৃতি সূত্র পাই। উহা পারত্রিক ধর্ম্মে যাগযজ্ঞ সন্ধ্যাবন্দনাদি বিধানে নিযুক্ত। অধ্যাপক ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে ষড়্দর্শন, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাই। ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের নিকট কোন গ্রন্থ পাইয়াছি কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহাদের দ্বারায় স্বীয় অবলম্বিত ব্যবসায়ে পুস্তক লেখা হইয়াছিল বলিতে সাহস করা যায়। আয়ুর্ব্বেদ অশ্বশাস্ত্র, হস্তীশাস্ত্র কৌটীল্য কামন্দকীয় মূল স্বরূপ রাজনীতি এবং অর্থশাস্ত্র উহাঁদের দ্বারাই রচিত হয়। অর্থাৎ এই কালীন ব্যবসায়ীদিগের রচিত গ্রন্থাদি পরসময়ে সংগৃহীত হইয়া আয়ুর্ব্বেদাদিরূপে পরিণত হয়। বৈদিক ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ ও প্রাকৃত ব্যাকরণের দুই এক খানি গ্রন্থ এই কালে লিখিত হয়। ব্রাহ্মণ পক্ষীয় ক্ষত্রিয় হইতে আমরা মোক্ষ শাস্ত্র প্রাপ্ত হই। জনক রাজা উহার অধ্যাপক। ব্রাহ্মণ বিরোধী ক্ষাত্র হইতে আমরা বুদ্ধাদি শাস্ত্র প্রাপ্ত হই। অনার্য্য দিগের রচিত কোন পুস্তক আমরা পাই নাই। পূর্ব্বাঞ্চলীয় অনার্য্যেরা ব্রাহ্মণবিরোধী মত প্রচার বিষয়ে অনেক সাহায্য করে। এমন কি বোধ হয় অনার্য্য সম্পর্ক ব্যতিরেকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি হইত কিনা সন্দেহ। এতৎকালীন অনার্য্যেরা ব্রাহ্মণ-

দিগের ধর্ম্মকেও যথেষ্ট পরিমাণে কলুষিত করে। ব্রাহ্মণেরা অনেক স্থলে উঁহাদের দেবতা দিগকে বৈদিক দেবতার সহিত একাকার করিয়াছেন।

শৈশবসহচরী।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।*

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্মশানে।

রাত্রি দ্বিতীয়প্রহরে বসুন্ধরার ঘাটে একটি শবদাহ হইতেছিল। উপরে নীল নভোমণ্ডলে অসংখ্য তারকা নিঃশব্দে ভাসিতেছে—নিম্নে জাহ্নবী নিঃশব্দে গাঢ় অন্ধকারে ভাসিতেছে। রজনী গাঢ় অন্ধকারময়ী,ভয়ঙ্করা,শব্দহীনা; কেবল কোন হতভাগ্যের ঐ চিতার অগ্নির পিট্ পিট শব্দ আর গর্জ্জন শুনা যাইতেছিল। ভীষণ অন্ধকারে স্বভাবের কিছুই লক্ষ্য হইতেছিল না। কেবল সেই সর্ব্বসংহারী সর্ব্বদেশব্যাপী অগ্নি একটি নশ্বর হিন্দুদেহ ধ্বংস করিতেছে, ইহাই দেখা যাইতে ছিল; আর তদালোকে তৎপার্শ্বে বসিয়া অনতিদূরে শবদাহককে দেখা যাইতেছিল। দাহকারী এক সুন্দর যুবা পুরুষ একদৃষ্টে অগ্নিপ্রতি চাহিয়াছিলেন। সে মুখমণ্ডল একবার দেখিলে আর ভুলিবার নহে,—সে রূপ নহে,সে মুখশ্রী নহে। কোন গভীর হৃদয়ঘাতিনী চিন্তাযুক্ত সে মুখমণ্ডল—তাহা একবার দেখিলে আর ভুলিবার নহে। সে মূর্ত্তি কেবল সেই নিবিড় অন্ধকারময়ী যামিনীতে সেই কল্লোলিনীর সৈকতোপরি শ্মশানোপযোগী। যুবক দুই জানুপরি ঈষৎ বক্রভাবে মস্তক রাখিয়া অগ্নির প্রতি চাহিয়াছিলেন। একমুহূর্ত্তের মধ্যে সেই মহাকাল অগ্নি সেই মনুষ্যদেহ ধ্বংস করিল—তাঁহাকে পথের কাঙ্গাল করিল। রজনীকান্ত কাঙ্গাল হউন, তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু আজ তাঁহার অগ্নিতে যাহাকে পোড়াইল তাহা কি আর কখন দেখিতে পাইবেন না—প্রাণ দিলেও দেখিতে পাইবেন না, এ বিশ্বমণ্ডলে খুঁজিলে কি কোথাও পাইবেন না? আজি হউক কালি হউক দশদিন বিলম্বে হউক আর কি কখন দেখিতে পাইবেন না? অগ্নিতে পোড়াইলে কি কোন চিহ্ন থাকে না? হা বিধাতঃ! তুমি কি নিষ্ঠুর! ক্রমে অগ্নি নিস্তেজ হইয়া আসিল, শবদেহ

---

* বঙ্গদর্শনের চতুর্থ খণ্ডে ৪২০ পৃষ্ঠা দেখ।

পুড়িয়া অঙ্গার হইল, অগ্নি নির্ব্বাণ হইল। রজনীকান্ত সেইপ্রকারে সেই খানে বসিয়া আছেন। একটি শবভুক্ কুক্কুব লোলজিহ্বা বহিষ্কৃত কবিয়া শ্মশানেব নিকট আসিয়া দাঁড়াইল আবাব ফিরিয়া গেল। বজনীকান্ত এক দৃষ্টে সেই শ্মশান প্রতি চহিযাছিলেন। ক্রমে পূর্ব্বদিক্ ঈষৎ পবিষ্কাব হইল। গঙ্গাব হৃদযহইতে ক্রমে অন্ধকাব অন্তর্হিত হইতে লাগিল, সমস্ত বাত্রি নির্ব্বাত ছিল, এক্ষণে দক্ষিণদিক্ হইতে মৃদু মৃদু সমীবণ গঙ্গাব হৃদয ঈষৎ চঞ্চল কবিল। দুই একবাব বসুন্ধবাব ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানে ঠুন ঠুন শব্দ হইল। দুই চাবিটি গ্রাম্য কুলকামিনী দ্রুতপদে মৃদুমধুর কথোপকথনে এবং কখন২ মৃদুমধুব হাস্য কবিতে২ গঙ্গাস্নানে আসিতেছিল।

তৎপবে একটী বৃদ্ধ গ্রামবাসী আসিয়া জলে নামিল। এবং কিঞ্চিৎ পবেই শ্মশানপ্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে চীৎকাব কবিয়া উঠিল। "একি রজনী বাবু যে।" রজনীকান্ত ঐ চীৎকারে প্রকৃতিস্থ হইলেন। ঘাটেব দিকে আস্তে২ মস্তক ফিরাইলেন। দেখিলেন, যামিনী প্রভাত হইয়াছে, এবং জলে দাঁড়াইয়া কতিপয় অবগুণ্ঠনবতী ও একজন তাঁহার প্রতিবাসী ব্রাহ্মণ, তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন। রজনীকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাঁহার পদদ্বয় অবশ হওয়াতে দাঁড়াইতে অক্ষম হইলেন। নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষে অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইলেন। ইত্যবসরে সেই ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা কবিল, "রজনী বাবু আপনার বেশ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে আপনি পিতৃ অথবা মাতৃহীন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাবা ত বহুদিন হইল স্বর্গে গিয়াছেন। তবে আজ আপনার এ বেশ কেন?" বজনীকান্ত অতি মৃদুস্ববে উত্তর কবিলেন, "আজ আমি মাতৃহীন হইলাম।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "সে কি আপনার—" বজনীকান্ত কোন প্রশ্ন কবিতে হস্তোত্তোলন কবিয়া নিষেধ করিলেন। তৎপরে আস্তে২ শ্মশানেব নিকট যাইয়া পবিশিষ্ট কার্য্য সমাপন কবিয়া বসুন্ধবার ঘাটেব দিকে স্নানকরিতে চলিলেন। অতি মৃদুপাদবিক্ষেপে মস্তক নত করিয়া চলিলেন। রজনীকান্তেব চক্ষে জল নাই— কিন্তু প্রতিপদ বিক্ষেপে যে কত কান্না কাঁদিতেছেন তাহা কেবল যাহাবা সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছিল তাহাবাই বুঝিয়াছিল। বজনীকান্ত যত নিকটবর্ত্তী হইতেছিলেন ততই তাঁহাব মুখমণ্ডল পবিষ্কাবরূপে দৃষ্ট হইতেছিল। তাঁহার মুখশ্রীর ভীষণ পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবগুণ্ঠনবতীদিগেব মধ্যে একজন কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু সে সময়ে কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। রজনী আসিয়া জলে নামিলেন। হঠাৎ রমণীদিগের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। স্থিরচক্ষে একটি রমণীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন কিন্তু আর সে ঘাটে নামিলেন না। দ্রুতপদে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রমণীদিগের মধ্যে এক

জন আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল, "কুমুদিনি রজনীকান্ত অমন করে ফিরে গেল কেন?" কুমুদিনী উত্তর করিল "বোধ হয় আমাকে—আমাদের দেখে।" তখন কুমুদিনী কাঁদিতেছিল।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণীত গ্রন্থাবলী। গ্রন্থকারের জীবনীসম্বলিত।*

কয়বৎসর হইল বঙ্কিম বাবু বঙ্গদর্শনে *প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে ৺ দীনবন্ধু* মিত্রের গ্রন্থাবলী তাঁহার তত্ত্বাবধারণে পুনর্মুদ্রিত করিবেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবু অনবকাশবশতঃ নিজ কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করিতে পারেন নাই। এক্ষণে দীনবন্ধু বাবুর পুত্রগণ কর্ত্তৃক সেই সকল গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু কেবল গ্রন্থকারের একটি জীবনী লিখিয়া দিয়াছেন। তাহা এই সংগ্রহে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পাঠকগণ শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন, যে এই সংগ্রহে দীনবন্ধু বাবুর কতকগুলি নূতন রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুরধুনী কাব্যের প্রথম ভাগ দীনবন্ধু বাবু প্রকাশিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার দ্বিতীয় ভাগ এই প্রথম প্রচারিত হইল। এতদ্ভিন্ন "পোড়া মহেশ্বর" নামে একটী গদ্য প্রবন্ধ এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এতৎ পাঠে অনেকেই বুঝিতে পারিবেন যে মনে করিলে দীনবন্ধু বাবু অতি উৎকৃষ্ট গদ্য রচনা করিতে পারিতেন। "প্রভাত" নামে পদ্য, এবং "যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ" ইত্যাখ্যের গদ্য প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবুর লিখিত জীবনী মধ্যে পাঠকেরা "জামাই ষষ্ঠী" নামে একটি পদ্যের উল্লেখ দেখিবেন। উহা প্রথমে প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে পঁচিশ কি ত্রিশ বৎসর পরে প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল। উহাকে কতকটা অশ্লীলতাদোষে দূষিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাহা হইলেও উহাতে হাস্যরসের অবতারণায় যুবা কবির অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় আছে। বোধ হয় দীনবন্ধুর কোন পদ্য রচনায় এতটা হাস্যরসের আধিক্য নাই। প্রথম প্রকাশকালে, ঐ কবিতা বঙ্গসমাজে এতাদৃশ সমাদৃত হইয়াছিল, যে সেই সংখ্যক প্রভাকর খানি পুনর্মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত তাহা প্রতি খণ্ড আট আনা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন।

* রায় দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী। গ্রন্থকারের জীবনী সম্বলিত। তৎপুত্রগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং প্রকাশিত। কলিকাতা। গিরিশ-বিদ্যারত্ন। ১৮৭৭।

বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

পঞ্চম খণ্ড।

ভারতে একতা।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে একপ্রকার সাধারণ সহানুভূতি থাকে, উহাই জাতীয় বন্ধনের মূল। সেইপ্রকার বিশেষ সহানুভূতি এক জাতীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যেরূপ থাকে, তাঁহাদের সহিত অপর কোন জাতির সেরূপ থাকিতে পারে না। সেই সহানুভূতি বশতঃই তাঁহারা পরস্পরের সহিত যোগ দিয়া কার্য্য করিতে, ও সকলে মিলিয়া এক রাজশাসনের অধীন থাকিতে ইচ্ছা করেন। এই প্রকার ভাবকে জাতীয় ভাব বলা যায়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কি কি কারণে এই জাতীয় ভাব বা জাতীয় বন্ধনের উৎপত্তি হয়। অলোচনাদ্বারা কয়েকটী কারণ স্থিরীকৃত হইয়াছে। জাতিবন্ধনের একটি কারণ ধর্ম্ম। এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলে পরস্পরের সহিত প্রগাঢ় সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। ধর্ম্মানুগত সহানুভূতির যে কি প্রকার আশ্চর্য্য বল, মনুষ্যজাতির সমগ্র ইতিবৃত্ত তদ্বিষয়ে উচ্চৈঃস্বরে সাক্ষ্য দিতেছে। বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম প্রভৃতি প্রচলিত ধর্ম্ম সকল কি অদ্ভুত পরাক্রম সহকারে লক্ষ লক্ষ মানবকে এক দুরতিক্রমণীয় বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে! কোন সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ কোন কালে বুদ্ধিকৌশলে যাহা করিতে সক্ষম হন নাই, শাক্যসিংহ, ইশা ও মহম্মদ তাহা স্ব স্ব প্রচারিত ধর্ম্মমতদ্বারা সংসিদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মজনিত সহানুভূতির বল, দেশ ও কাল উভয় সম্বন্ধেই পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উপরে যে কয়েকটি ধর্ম্মের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই একথার সত্যতা বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ। মুসলমান ধর্ম্ম প্রভৃতি

ধর্ম্ম সকল পৃথিবীর বিভিন্ন খণ্ডে লক্ষ লক্ষ নর নারীর উপর যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে,—যে দৃঢ়তর বন্ধনে তাহাদিগকে বদ্ধ করিয়াছে, তাহা কখন কোন অন্য রাজনৈতিক বা সামাজিক কারণে সংঘটিত হয় নাই। শত শত রাজ্য ও রাজার অভ্যুদয় ও বিনাশ হইয়াছে, নব নব সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে, বিবিধ দার্শনিক মতের প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে, অসংখ্য ঘটনাবলী পৃষ্ঠে বহন করিয়া শত শত শতাব্দী নদীস্রোতের ন্যায় চলিয়া গিয়াছে, তথাচ অদ্যাপি পৃথিবীতলে মুষা ও মহম্মদ, শাক্যসিংহ ও ঈশার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। জাতিবন্ধন সম্বন্ধে ধর্ম্ম যে একটি প্রধান কারণ তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই।

ভাষা আর একটি কারণ। পরস্পরের নিকট পরস্পরের মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলে যাদৃশ সহানুভূতি জন্মিয়া থাকে, অন্য প্রকারে কখনই সে প্রকার সহানুভূতি জন্মিতে পারে না। এক বংশে জন্ম অপর কারণ। এক বংশে যাঁহাদিগের জন্ম তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে একটি সম্বন্ধ অনুভব করেন, এবং সেই জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজে এক প্রকার যোগ নিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। বাসস্থানের প্রাকৃতিক সীমা চতুর্থ কারণ। নদী পর্ব্বত প্রভৃতি দ্বারা কোন ভূখণ্ড সীমাবদ্ধ হইলে তদন্তর্গত অধিবাসিগণের পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা জন্য যাদৃশ যোগ সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা, উক্ত সীমার বাহিরে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের সহিত তাদৃশ নিকট সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর একত্ব জাতিবন্ধনের পঞ্চম কারণ। যাঁহাদের পুরাবৃত্ত এক অর্থাৎ যাঁহাদের পিতৃপুরুষেরা এক কার্য্যে একত্রে যোগ দিয়াছিলেন, এক প্রকার ঘটনা যাঁহাদের সম্পদ ও বিপদ, সুখ ও দুঃখের কারণ হইয়াছিল, তাঁহারা পরস্পরের সহিত সহজে যুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পিতৃপুরুষদিগের কার্য্যের গৌরব বা হীনতা স্মরণ করিয়া এক সাধারণ সুখ দুঃখ, অহঙ্কার ও লজ্জা অনুভব করিয়া থাকেন। সামাজিক আচার ব্যবহার জাতিবন্ধনের ষষ্ঠ কারণ। একপ্রকার সামাজিক আচার ব্যবহার হইলে লোকে সামাজিক কার্য্য উপলক্ষে পরস্পর মিলিত হইতে পারে; সুতরাং তাহাদের মধ্যে অতি সহজেই নৈকট্য সংস্থাপিত হয়। প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণ সপ্তম কারণ। এক এক জাতির এক এক প্রকার বিশেষ প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজ অধ্যবসায়শীল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহসী ও অর্থলিপ্সু। ফরাসি আমোদপ্রিয়, সরল, ক্ষীণপ্রতিজ্ঞ। বাঙ্গালি চতুর, কোমলহৃদয়, ভীরু। শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিগত একতা, জাতীয়ভাব সংরক্ষিত ও দৃঢ়ীকৃত করিয়া থাকে।

জাতীয়ভাবের যে সকল কারণ ও

লক্ষণ প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি পর্য্যায় ক্রমে উল্লিখিত হইল, তাহা উহাদের গুরুত্ব ও কার্য্যকারিতার পরিমাণ অনুসারে করা হয় নাই। ঐ কয়েকটি কারণের প্রত্যেকটিই জাতীয়ভাবের মূলে বর্তমান রহিয়াছে, ইহাই কেবল বলা হইল। উহাদের আপেক্ষিক কার্য্যকারিতার বিষয় বিচার করা হইতেছে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল লক্ষণদ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে ভারতবাসিগণকে একজাতি বলিয়া প্রতি পন্ন করা যায় কি না। ভারতবর্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড ভূখণ্ডকে এক দেশ না বলিয়া এক মহাদেশ বলাই যেন অধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ইয়ুরোপ হইতে রুসিয়াকে ছাড়িয়া দেও,যে অবশিষ্ট অংশ রহিল, ভারতবর্ষের আয়তন তদপেক্ষা অধিক ক্ষুদ্রতর হইবে না। এমন বৃহৎ দেশে বিংশতি কোটির অধিক অধিবাসিগণের মধ্যে জাতীয় একতা সম্বন্ধ হওয়া যে সহজ নহে ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। সে যাহা হউক, জাতীয়ভাবের লক্ষণ কয়েকটির সহিত মিলাইয়া দেখা যাউক যে, চীন বা রুসিয় প্রভৃতি জাতির ন্যায় ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটি জাতি আছে কি না। দুই প্রকার হইতে পারে, প্রথম, ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ, উহার অন্তর্গত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি বাস করিতেছে। দ্বিতীয় ভারতবর্ষ একটি দেশ,এবং উহাতে ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া এক বিশেষ জাতি বাস করিতেছে। এ দুইএর মধ্যে কোন্‌টি সত্য? প্রথমতঃ ধর্ম্ম লইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতবাসিগণ এক ধর্ম্মাবলম্বী নহেন। সাঁওতাল, ভিল প্রভৃতি অসভ্য জাতি সকলকে ছাড়িয়া দিলেও, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই প্রকাণ্ড সম্প্রদায়ে তাঁহারা বিভক্ত রহিয়াছেন। উক্ত দুই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ধর্ম্মজনিত বিদ্বেষ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। মুসলমানের সংখ্যা সমগ্র অধিবাসীর সঙ্গে তুলনা করিলে প্রায় এক পঞ্চমাংশ হইবে। কেবল হিন্দুদিগের মধ্যে যে ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে তাহা হিন্দুধর্ম্ম নামে সর্ব্বত্র আখ্যাত হইলেও, বস্তুতিক উহা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বাঙ্গালায় যাহা ধর্ম্ম,পঞ্জাবে তাহা ধর্ম্ম নহে, আবার পঞ্জাবে যাহা ধর্ম্ম, মান্দ্রাজে তাহা ধর্ম্ম নহে। কেবল সামান্য সামান্য বিষয়ে যে প্রভেদ লক্ষিত হয় এরূপ নহে, অতি প্রধান ও গুরুতর বিষয়েও তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এস্থলে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। বঙ্গদেশে অন্ন ব্যঞ্জন অগ্নিপক্ক হইলে উহা উচ্ছিষ্টের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—বস্ত্রের সহিত উহার সংস্পর্শ হইলে সে বস্ত্র ধৌত করা আবশ্যক। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভোজনাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টই উক্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কেবল অগ্নিপক্ক অন্নের সহিত বস্ত্রাদির সংস্পর্শ কোন দোষ নত বলিয়া মনে করা হয় না। কিন্তু

এ দৃষ্টান্তটিও অপেক্ষাকৃত সামান্য বিষয় সম্বন্ধে হইল। বাস্তবিক অতি গুরুতর বিষয়েও যে এই প্রকার প্রভেদ লক্ষিত হয় তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যে সকল বঙ্গদেশবাসী হিন্দু কখন পঞ্জাবে গমন করেন নাই, তাঁহারা শুনিলে অবাক্ হইবেন যে, উক্ত প্রদেশে শূদ্রে অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করে, ব্রাহ্মণে তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়া আহার করিয়া থাকেন তাহাতে কোন দোষ হয় না। লাহোরে গিয়া দেখ বাজারে কাহার জাতিতে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিতেছে, অতি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণেও তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছেন। কাশ্মীরে যদি মুসলমান অন্ন বহন করিয়া লইয়া আইসে তাহা অতি শুদ্ধসত্ব ব্রাহ্মণেরও পরিত্যাজ্য হয় না। মৎস্যভোজন বাঙ্গালির নিকট অতি নির্দ্দোষ দৈনিক কার্য্য, কিন্তু উত্তর পশ্চিম প্রদেশবাসীর নিকট উহা যার পর নাই ঘৃণিত, অশ্রদ্ধেয় ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য। কোন হিন্দুস্থানী মৎস্য ভোজন করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়। আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালি হিন্দুদিগের নিকট কুক্কুট মাংসাহার যে কি বিষম দোষাবহ ব্যাপার, কতদূর ধর্ম্মহানিকর ও ঘৃণিত কার্য্য তাহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদেশে যাও সেখানে আর এক অবস্থা দেখিতে পাইবে। সেখানে ব্রাহ্মণজাতি নিরামিষভোজী; কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য সকল জাতিই অম্লান বদনে অতি উপাদেয় জ্ঞানে কুক্কুট মাংস ভোজন করিয়া থাকেন। কেহ তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন না, তজ্জন্য কাহাকেও জাতিচ্যুত হইতে হয় না। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আচার বিষয়ে কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল; বাস্তবিক তদ্বিষয়ে রাশি রাশি প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ধর্ম্মবিষয়ক মতের বিভিন্নতা যে কতদূর অধিক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ, ভাষা সম্বন্ধেও সেই প্রকার বা ততোধিক। আর্য্য ও অনার্য্য কত প্রকার ভাষাই ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে। এমন একটি ভাষাও নাই যাহা সমস্ত ভারতবাসী ব্যবহার করিয়া থাকে বা করিতে পারে। হিন্দি ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মান্দ্রাজ প্রদেশ ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই উক্ত ভাষায় কথা বলিলে লোকে প্রায় বুঝিতে পারে।

বংশ সম্বন্ধেও দেখা যাইতেছে যে, ভারতবাসিগণ বিভিন্ন বংশ (race) হইতে সমুৎপন্ন। আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই প্রধান বিভাগে ভারতবাসিগণ বিভক্ত। অনেকে মনে করেন যে এতদ্দেশীয় মুসলমানগণ অনার্য্য বংশসম্ভূত। বাস্তবিক তাহা নহে। মুসলমানদিগের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক লোকের পূর্ব্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন; তাঁহারা যে কোন কারণে হউক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট মুসলমানদিগের মধ্যে যাঁহাদের পূর্ব্বপু-

রুষগণ পারস্য ও আফ্গানস্থান হইতে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও আর্য্যবংশীয়। কেবল যাঁহারা আরব ও তুর্কিস্থান হইতে সমাগত তাঁহারাই অনার্য্য, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে। সেই অল্পসংখ্যক মুসলমান ভিন্ন আরও বহুসংখ্যক অনার্য্য বংশজাত লোক ভারতবর্ষে বাস করিতেছে। গারো প্রভৃতি অনার্য্য অসভ্য জাতির কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই। সুসভ্য হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও শত সহস্র লোক অনার্য্য বংশজাত। ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মান্দ্রাজ প্রদেশবাসিগণের, আর্য্যবংশীয় বলিয়া গৌরব করিবার অধিকার নাই। তাঁহাদের আকৃতি আর্য্যবংশীয়দিগের মত নহে, উহা সম্পূর্ণরূপে অনার্য্যদিগের তুল্য। উক্ত প্রদেশে দুইটি ভাষা প্রচলিত আছে, তেলুগু ও তামিল। ঐ দুটিই অনার্য্য ভাষা। সংস্কৃতের সহিত উহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা বাঙ্গালায় বলি "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন।" হিন্দু স্থানীরা বলেন "আপ কাঁহাসে আতেহেঁ," ইত্যাদি ভারত প্রচলিত আর্য্য ভাষা মাত্রেই সংস্কৃতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মান্দ্রাজীরা বলিবেন "ঙ্গাঙ্গড় ইযাপড়্দু ইন্দিড় হিড়।" পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, মান্দ্রাজীরা রামায়ণবর্ণিত মহা ঘটনার সময় হইতে ক্রমে ক্রমে আর্য্যজাতির সহিত সংমিলিত হইয়াছে। বংশ অনুসারে বলিতে গেলে মান্দ্রাজ প্রদেশবাসী হিন্দুদিগের অপেক্ষা ইউরোপীয়গণ আমাদের নিকট কুটুম্ব। ভাষাবিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে ইহা সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ইংরেজ, জর্ম্মান, ফরাসি, হিন্দু প্রভৃতি জাতি সকল এক মূল জাতি হইতে উৎপন্ন।

ভারতবর্ষের চতুঃসীমা এরূপ দুর্ভেদ্যরূপে পরিবেষ্টিত যে বিদেশীয় জাতির সহিত বহুকাল পর্য্যন্ত এদেশের অধিবাসিগণের অধিক সংশ্রব হয় নাই। কিন্তু আবার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসিগণের মধ্যেও কোন কালে পরস্পরের অধিক সংশ্রব সংঘটিত হয় নাই। বিভিন্ন প্রদেশ সকল এত দূরবর্ত্তী ও তত্তৎস্থলে গমনাগমনের এত অসুবিধা যে, উক্ত সকল প্রদেশবাসিগণের মধ্যে আলাপ পরিচয় হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। রেলওয়ে সংস্থাপনের পূর্ব্বে বোম্বাই হইতে বাঙ্গালা এবং মান্দ্রাজ হইতে পঞ্জাব যাত্রা যে কি দুরূহ ব্যাপার ছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুবৃহৎ স্রোতস্বতী, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী, ভয়ঙ্কর অরণ্য, পর্য্যটকগণের গতিরোধ করিবার জন্য ভারতের নানা স্থানে বর্ত্তমান। সুতরাং দূরপ্রদেশনিবাসী ভারত সন্তানগণের মধ্যে এতদূর বিচ্ছিন্নভাব সমুপস্থিত হইয়াছে যে, তাঁহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। এক্ষণে রেলওয়ের সৃষ্টি হইয়া অল্পে অল্পে এই শোচনীয় অবস্থা বিদূরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র।

ভারতবাসিগণের মধ্যে পুরাবৃত্ত সম-

স্বীয় ঘটনার একতাও নাই। হিন্দুদিগের মূল ইতিহাসের একতা আছে। সকল হিন্দুই সমভাবে গৌরব করিয়া বলিতে পারেন, আমাদের রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির, আমাদের ব্যাস ও বাল্মীকি, আমাদের ভবভূতি ও কালিদাস, আমাদের আর্য্যভট্ট ও ভাস্করাচার্য্য। ভারতবর্ষের যেখানে ইচ্ছা যাও, দেখিবে, প্রাচীন আর্য্যপিতৃপুরুষগণের নামে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত হিন্দুসন্তানমাত্রেরই মস্তক অবনত হইয়া থাকে। সেই পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষগণের নামে যাহা বলিবে তাহাই তাঁহাদের হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে আঘাত করিবে। কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দুদিগের পরবর্ত্তী ইতিবৃত্তের মধ্যে একতা নাই। শিখ, মহারাষ্ট্রীয়, রাজপুত, বাঙ্গালি প্রভৃতি জাতিসকলের ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস। এতদ্ভিন্ন মুসলমানদিগের সহিত ঐতিহাসিক একতা ত কিছুই নাই। আমাদের আদি গৌরবের ক্ষেত্র আর্য্যাবর্ত্ত, তাঁহাদের আরব দেশ। আমরা বিজিত, তাঁহারা বিজেতা।

অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধে যেরূপ দর্শিত হইল, সামাজিক আচারব্যবহার সম্বন্ধেও সেইরূপ। ভারতবর্ষস্থ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিক প্রথাসম্বন্ধে যারপর নাই ভিন্নতা। ধর্ম্মানুগত আচার সম্বন্ধে যে প্রকার ঘোরতর প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এস্থলে কেবল সামাজিক প্রথার বিষয় বলা যাইতেছে। বিবাহ সামাজিক কার্য্য সকলের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। এই বিবাহসম্বন্ধে অতিশয় প্রভেদ লক্ষিত হয়। অপেক্ষাকৃত সামান্য সামান্য প্রভেদের বিষয় এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রধান প্রধান দুই একটির কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। বঙ্গদেশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি ভারতের প্রায় অধিকাংশ স্থানবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে বহুকাল হইতে পতিবিহীনা রমণীগণের পক্ষে পুনঃপরিণয় যারপর নাই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস রহিয়াছে, চিরবৈধব্যই তাঁহাদিগের অবশ্য বহনীয় ও প্রতিপাল্য কার্য্য বলিয়া মনে করা হইতেছে। তথাচ দেখুন উড়িষ্যা প্রদেশে এক প্রকার বিধবাবিবাহ প্রচলিত রহিয়াছে। দাম্পত্য সম্বন্ধ বিষয়ে বিবিধ সম্প্রদায় মধ্যে অনেক তারতম্য ও ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। মাঙ্গালোর কোচিন, কালিকট প্রভৃতি মলবার উপকূলস্থ অনেক স্থানে বিবাহবন্ধন যারপর নাই শিথিল। নেয়ার, বেলোয়ার প্রভৃতি জাতিসকলের মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে এই এক চমৎকার নিয়ম প্রচলিত আছে যে পুত্র না হইয়া ভাগিনেয় বিষয়াধিকারী হইয়া থাকে। এই সৃষ্টি ছাড়া প্রথার যুক্তি এই যে, ভাগিনেয়ের শরীরে যে বংশের শোণিত প্রবাহিত হইতেছে ইহা নিশ্চিত; কিন্তু দাম্পত্য বন্ধনের শিথিলতা বশতঃ পুত্র সম্বন্ধে সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কে কাহার সন্তান স্থির হওয়া কঠিন বলিয়াই এই প্রকার নিয়ম

প্রচলিত রহিয়াছে। আমাদের দেশের চৈতন্যবৈষ্ণবদিগের মধ্যে বিবাহ ও দাম্পত্য সম্বন্ধ বিষয়ে কি প্রকার প্রথা সকল প্রচলিত আছে, তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং তদ্বিষয়ে বিশেষ করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সামাজিক প্রথাসম্বন্ধে আর একটি দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা করি। স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের অবস্থা এক-প্রকার নহে। বঙ্গদেশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে অবরোধ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। পঞ্জাবে অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণে রহিয়াছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে অবরোধপ্রথা নাই বলিলেই হয়। বিন্ধ্যাচল অবরোধ প্রথার সীমা। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে ভদ্রমহিলাগণ প্রকাশ্যরূপে রাজ-পথ দিয়া গমনাগমন করেন, তাহাতে কেহই দোষ মনে করেন না। তথায় অবগুণ্ঠনদিবার নিয়ম নাই, এবং অপর পুরুষের সহিত আলাপ করিতেও নিষেধ নাই।

প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণ অনুসারে বিচার করিলেও দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসিগণের মধ্যে প্রকৃতিগত একতা নাই। ফরাসি, ইংরেজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রকৃতি যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তাঁহাদেরও সেইরূপ মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। সবলকায় ও সাহসী পঞ্জাবী; অধ্যবসায় ও উদ্যমশীল মহারাষ্ট্রীয়; বুদ্ধিমান্, দুর্ব্বল দেহ ও ভীরু বঙ্গবাসী ইত্যাদি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসিগণের প্রকৃতির ভিন্নতা লক্ষিত হইতেছে।

জাতীয় ভাবের লক্ষণ কয়েকটি লইয়া দেখান হইল যে, তাহার কোনটিই সাধারণ ভাবে সকল ভারতবাসীর মধ্যে বর্ত্তমান নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, আমাদের (ভারতবর্ষীয়গণের) কোন বিশেষ জাতীয় ভাব আছে? যখন সকল বিষয়েই অনৈক্য, তখন এক ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া পরিচয় দিবার আমাদের অধিকার কোথায়? কোন চিন্তাশীল পণ্ডিত বলেন যে, জাতীয় ভাবের অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ভাষাই সর্ব্ব প্রধান। সে ভাষা সম্বন্ধেও যখন এতদূর ভিন্নতা, তখন একতা সূত্রে বদ্ধ হইবার আমাদের আশা কোথায়? এই প্রস্তাব লেখক একবার মান্দ্রাজে গমন করিয়াছিলেন। তথাকার কোন আফিসে জনৈক তৎ-প্রদেশবাসীর সহিত ইংরেজী ভাষায় আলাপ করিতেছেন, এমন সময় একজন ইংরেজ আসিয়া বলিলেন, "আপনারা কি পরস্পরকে স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় বলিয়া মনে করেন?" তাঁহারা সে কথায় হাঁ বলিয়া উত্তর করায়, সাহেব বলিলেন, "তবে কেন আপনারা আপনাদের মাতৃ-ভাষায় কথা বার্ত্তা বলুন না।" সাহেব প্রকৃত অবস্থা জানিতেন বলিয়া ও কথাটি বিদ্রূপ করিয়াই বলিয়াছিলেন। তাঁহা-দের পক্ষেও বাস্তবিক ইংরেজী ভিন্ন অন্য কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় পরস্পর আলাপ করা অসম্ভব ছিল। মান্দ্রাজী যদি হিন্দি

জানিতেন তাহা হইলেও এক প্রকার চলিতে পারিত। শিক্ষিত বাঙ্গালি ও শিক্ষিত মান্দ্রাজীর পরস্পর আলাপ করিতে হইলে ইংরেজী ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

সমগ্রভারতে কখন এক ধর্ম্ম ও এক ভাষা প্রচলিত হইবে কি না এ প্রশ্নের মীমাংসা করা সহজ নহে। যিনি বিশ্বাস করেন যে, সত্যের জয় এককালে হইবেই হইবে, তিনি নিজে যে ধর্ম্মাবলম্বী তাহাই সমস্ত ভারতের,—কেবল ভারতের কেন—সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমরা এ স্থলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না।

নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন লোকও আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, ক্রমে ইংরেজী ভাষাই ভারতের সাধারণ ভাষা হইবে। যাঁহারা সে প্রকার বিশ্বাস করেন করুন, আমরা কিন্তু সে কথায় হাস্য না করিয়াথাকিতে পারি না। শত শত যোজন দূরবর্ত্তী সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপ বিশেষের ভাষা যে ভারতের বিংশতি কোটী অধিবাসীর সাধারণ ভাষা হইবে, ইহার তুল্য অসম্ভব কথা কিছুই হইতে পারে না। সংসারে যদি কিছু অসম্ভব থাকে তবে উহাই সে অসম্ভব। মানবজাতির পুরাবৃত্তে এবম্বিধ ঘটনার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কোন প্রকার যুক্তিতেও উক্ত বাক্যের সারবত্তা উপলব্ধি হয় না। এক সময়ে অনেক মের্জা সাহেবও পারস্যভাষা ভারতীয় সকল ভাষা লোপ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

প্রচলিত দেশীয় ভাষা সকলের মধ্যে যদি কোন ভাষার পক্ষে ভারতের সাধারণ ভাষা হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা হিন্দি সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে। কেন না ভারতে হিন্দি ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। হিন্দি যে স্থানের প্রচলিত ভাষা নহে সেখানকার লোকও সহজ হিন্দিতে কথা বলিলে বুঝিতে পারেন। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের যে প্রকার আশ্চর্য্য উন্নতি হইতেছে, হিন্দি ভাষার পক্ষে সে প্রকার না হওয়া অতিশয় আক্ষেপের বিষয়। বাঙ্গালার ন্যায় হিন্দির উন্নতি হইলে শতগুণ অধিক উপকারের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদেশ সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। সেখানকার লোক হিন্দি বলিতেও পারে না বুঝিতেও পারে না।

তবে কি ভারতবাসিগণের একতাসূত্রে বদ্ধ হইবার কোন উপায় নাই? এমন কি কোন সাধারণ ভূমি নাই যেখানে তাঁহারা সকলে মিলিয়া ভ্রাতৃভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারেন? অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, সমুদয় ভারতবাসিগণ কখনই একতাবন্ধনে বদ্ধ হইতে পারিবেন না। তাঁহারা বলেন যে, এ দেশে কোন কালে যাহা হয় নাই তাহা এক্ষণে কি প্রকারে হইবে। কোন বিষয়েই যাঁহাদের মিল নাই তাঁহারা কেমন করিয়া পরস্পর সংমিলিত হই-

রেন। ভারতের ভাবী মঙ্গল সম্বন্ধে আমরা এই সকল ব্যক্তির ন্যায় একবারে সম্পূর্ণরূপে হতাশ নহি। এক সাধারণ একতাসূত্রে সকল ভারত সন্তানের বদ্ধ হওয়া যে সম্পূর্ণ অসম্ভব আমরা এরূপ মনে করি না। ইহা সত্য বটে যে, সমগ্র ভারত কোন কালে একতাবন্ধনে বদ্ধ হইতে পারে নাই। হিন্দু, মুসলমান, ও ইংরেজ এই ত্রিবিধ রাজশাসনকালের মধ্যে কোন কালেই সমগ্র ভারত কোন সাধারণ ভাবে সমবেত হইতে পারে নাই,—*চিরকালই বিচ্ছিন্ন ভাব।* কিন্তু পূর্ব্বে কখন একতা হয় নাই বলিয়া যে ভবিষ্যতেও কখন হইবে না এমন কথা বলা নিতান্ত অসঙ্গত। ভারতের যে অবস্থায় একতা সংস্থাপিত হইতে পারে নাই, ঠিক সেই অবস্থা যতদিন থাকিবে ততদিন নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্নভাবও থাকিবে, কিন্তু যদি সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তবে সে প্রকার বিচ্ছিন্নভাবও চলিয়া যাইতে পারে। বাস্তবিক ইতিমধ্যেই কি অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয় নাই? হিন্দু ও মুসলমান শাসন কালের সহিত বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিলে দুই একটি অতি প্রধান বিষয়ে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। প্রথম, ভারতের সমুদায় অধিবাসিগণ এক সাধারণ রাজশাসনের অধীন হইয়াছেন। পূর্ব্বে কোন কালে এ প্রকার ঘটে নাই। বৌদ্ধ শাসনকালে অশোক প্রভৃতি কোন কোন রাজার সময় ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান এক রাজশাসনের অধীন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এখন যেমন হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত এক বৃটিস সিংহের করকবলিত হইয়াছে,—এক রাজদণ্ডকে বিংশতি কোটি ভারতসন্তান বিনম্র মস্তকে অভিবাদন করিতেছে, এ প্রকার পূর্ব্বে কখন হয় নাই। দ্বিতীয়, এক্ষণে লৌহবর্ত্ম ও তাড়িতবার্ত্তাবহের সৃষ্টি হওয়াতে, ভারতবর্ষের অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশ সকলের অধিবাসিগণের মধ্যেও আলাপ পরিচয় আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালি *পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয়* ভারতবাসিগণ পরস্পরের নিবাসপ্রদেশে আসিয়া পরস্পরের সহিত সদ্ভাব ও সৌহার্দ্য বর্দ্ধন করিতেছেন। সুশিক্ষিত বাঙ্গালি পঞ্জাবে গিয়া উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তৎপ্রদেশবাসিগণের মধ্যে জ্ঞানপ্রচার করিতেছেন, বোম্বাই গমন করিয়া প্রকাশ্য বক্তৃতাদ্বারা তথাকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট আপনাদের মনের ভাব প্রকাশ করিতেছেন। আবার বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের লোকও বঙ্গদেশে আসিয়া আমাদের সহিত আত্মীয়তা করিতেছেন। জাতিতে জাতিতে এ প্রকার সম্মিলন অল্প অল্প আরম্ভ হইয়াছে। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রচার অতি আশ্চর্য্যরূপে ভারতের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছে। মান্দ্রাজ হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ইংরেজীশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের চিন্তাস্রোত সামাজিক ও

রাজনৈতিক উন্নতির দিকে প্রধাবিত। পূর্ব্বে কখন এ প্রকার হয় নাই। ইংরেজী শিক্ষা এখনই অল্প অল্প বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ক্রমে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দিবে যে, একতাবন্ধন ভিন্ন আমাদের উন্নতির আশা নাই। যিনিই কেন যাহা বলুন না, আমরা অসন্দিগ্ধ চিত্তে একটি আশা করিতে পারি যে, ভারতবর্ষ অন্যান্য সহস্র বিষয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন থাকিলেও সকল ভারতবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক একতা সংস্থাপিত হইতে পারে। ভারতবাসিগণ এক্ষণে এক রাজার প্রজা, সকলকেই এক প্রকার রাজনৈতিক মঙ্গলামঙ্গলের অধীন হইতে হইতেছে। সুতরাং অন্য সহস্র বিষয়ে অনৈক্য থাকিলেও আমাদের মধ্যে এই একটি সাধারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই সাধারণ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা ভ্রাতৃভাবে পরস্পরের হস্তধারণ করিতে পারি। অন্যান্য বিষয়ে প্রভেদ সত্ত্বেও আমরা সাধারণ রাজনৈতিক কষ্ট ও অভাব বিদূরিত করিতে, এবং সাধারণ উন্নতি সংসাধন করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত হইতে পারি। পৃথিবীর সুসভ্য জাতি সকলের ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা এ কথা কখনই বলিতে পারেন না যে, এ প্রকার রাজনৈতিক সম্মিলন অসম্ভব। সুইজরলণ্ড, বেল্‌জ্যাম, ও জর্ম্মনির ইতিহাস একথার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত স্থল। সুইজরলণ্ডে রাজনৈতিক একতা বিলক্ষণ রহিয়াছে, অথচ উহার ভিন্ন ভিন্ন কাণ্টনবাসিগণের মধ্যে ধর্ম্ম, বংশ, ও ভাষা এই তিন প্রধান বিষয়েই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। জর্ম্মেনিতে ধর্ম্মসম্বন্ধে ঘোরতর অনৈক্য বিদ্যমান রহিয়াছে—রোমান কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট এই দুই সম্প্রদায়ে অধিবাসিগণ বিভক্ত; অথচ তাঁহাদের মধ্যে রাজনৈতিক একতা বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। বেলজ্যাম দেশে ফ্লেমিস্‌ ও ওয়ালুন নামক প্রদেশদ্বয়ের মধ্যে বংশ ও ভাষাসম্বন্ধে ভিন্নতা রহিয়াছে, অথচ তাঁহাদের মধ্যে জাতীয়একতার ভাব বর্ত্তমান। অপরাপর বিষয়ে প্রভেদ থাকিলেও রাজনৈতিক একতা যে সম্বদ্ধ হইতে পারে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত কয়েকটি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জাতীয়ভাবের যে সকল কারণের কথা বলা হইয়াছে, তাহার কার্য্য, সকল অবস্থার অলঙ্ঘনীয় নহে। নতুবা ভাষা, ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রধান প্রধান কারণ সত্ত্বেও উপরিউক্ত কয়েকটি দেশে রাজনৈতিক একতা বদ্ধমূল হইতে পারিত না।

রাজনৈতিক একতা সংস্থাপন করিতে হইলে, ভাষাবিভাগ অনুসারে ভারতবর্ষকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বিহার হইতে পেসোয়ার পর্য্যন্ত হিন্দিভাষা প্রচলিত, সুতরাং এই প্রথম বিভাগ। উড়িষ্যা, বাঙ্গালা, ও আসাম এই তিন প্রদেশের ভাষা প্রায় একই,

অতএব এই দ্বিতীয় বিভাগ। মধ্যভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি কয়েকটি ভাষার অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য, অতএব উহা তৃতীয় বিভাগ, এবং মান্দ্রাজ প্রদেশে তেলুগু ও তামিল বহুল সাদৃশ্যবিশিষ্ট অনার্য্য ভাষাদ্বয়, অতএব এই চতুর্থ বিভাগ। এই চারি বিভাগে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া চারিটি স্বতন্ত্র রাজ্য হইতে পারে; এবং ঐ চারিটি রাজ্য এক হইয়া একটি মিলিত রাজ্য (Federal government) হইতে পারে।

যে সকল সুশিক্ষিত বাঙ্গালিকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব প্রভৃতি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গিয়া বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতে হয়, এস্থলে তাঁহাদের একটি অতি গুরুতর কর্ত্তব্যভার বুঝা যাইতেছে। যাহাতে উক্ত প্রদেশবাসী ব্যক্তিগণের সহিত সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের সর্ব্বদাই যত্নশীল থাকা কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অতি অল্পসংখ্যক লোকই সেইরূপ যত্ন করিয়া থাকেন। এমন কি অনেক স্থলেই বাঙ্গালি বাবুদিগের অসদাচার জন্য হিন্দুস্থানিগণ তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত বিরক্তি ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। তৎকালে যে দুই একজন বাঙ্গালি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে থাকিতেন তাঁহারা সম্মানিত হইতেন।

এস্থলে মুসলমানদিগের বিষয়ে দুই একটি কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইতেছে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষবুদ্ধি চিরকালই ভারতের অশেষ অকল্যাণের কারণ রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যাহাতে এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয় তদ্বিষয়ে দেশহিতৈষী মাত্রেরই যত্নশীল হওয়া যার পর নাই আবশ্যক। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন ভিন্ন কোন ক্রমেই ভারতের প্রকৃত মঙ্গল সংসিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু এক্ষণকার বাঙ্গালা কবিতালেখক ও নাটককারগণের মধ্যে অনেকেই এই বিদ্বেষানল নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা না করিয়া বরং তাহাতে ক্রমাগত ইন্ধন প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। "যবন যবন" করিয়া অনেকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র যে সকল "না টক না মিষ্ট" নাটক প্রতিদিন প্রসব করিতেছে, তদ্দ্বারা দেশের বিশেষ কোন ইষ্ট হউক আর নাই হউক অনিষ্ট নিতান্ত অল্প হইতেছে না। বঙ্গভূমি সকল "ভারতে যবন" "ভারতের সুখশশী যবন কবলে" ইত্যাদি নাটক সকলের অভিনয়কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত। এখন যবনদিগকে গালি দিয়া দেশের কোন উপকার নাই, অনুপকার বিলক্ষণ আছে। এখন যবনদিগের সহিত সদ্ভাব করিবার সময়। "হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃগণ। তোমাদের পুরাতন বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া এখন নিজ নিজ মঙ্গল কামনায় প্রীতি ও সদ্ভাবের সহিত পরস্পরের সহিত সংমীলিত হও। বর্ত্তমান প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুভব করিয়া ভূতকালের

বিষয় ভুলিয়া যাও।” হিন্দু হউন কি মুসলমান হউন যিনি দেশের প্রকৃত কল্যাণ প্রার্থনা করেন তিনি এই কথাই বলিতে থাকুন। কবিতা, সঙ্গীত ও বক্তৃতায় এই কথা হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিঘোষিত হইতে থাকুক।

“শেষে ডেকে বলি ওরে যুন ভাই,
প্রাচীন শত্রুতা প্রয়োজন নাই,
দেশের দুর্দ্দশা দেখ হল ঢের,
তোরা তো সন্তান প্রিয় ভারতের,
সে শত্রুতা ভুলে, আর প্রাণ খুলে,
পুতে রাখ কথা সম্ভ্রম কাফের,
বল শুধু,—‘মোরা প্রিয় ভারতের,’
ভারতের তোরা তোদের আমরা,
আর পূর্ণ হল আনন্দের ভরা।
সবে একদশা তবে অহঙ্কার,
তবে রে শত্রুতা শোভে না যে আর।
মিলি ভাই ভাই জয়ধ্বনি গাই,
ঘুষিয়া বেড়াই শুভ সমাচার,
আমাদের মাতা বাঁচিল আবার।”

পুষ্পমালা।

আমরা প্রথমতঃ দেখিলাম যে জাতীয়-ভাবের সাতটি কারণ বা লক্ষণ—ধর্ম্ম, ভাষা, বংশ, বাসস্থানের প্রাকৃতিক সীমা, ঐতিহাসিক ঘটনার একত্ব, সামাজিক প্রথা, ও প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণ। এই লক্ষণ কয়েকটি লইয়া বিচার করিয়া দেখা হইল যে, ভারতবর্ষের সমগ্র অধিবাসিগণের মধ্যে ঐ কয়েকটি লক্ষণের প্রায় কোনটিই সাধারণভাবে বর্ত্তমান নাই। সেই জন্য তাঁহাদের মধ্যে কোন কালেই জাতীয়ভাব বদ্ধমূল হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে ভারতের অবস্থাসম্বন্ধে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। সমুদায় ভারতবাসিগণ এক সাধারণ রাজশাসনের অধীন হওয়াতে তাঁহাদের মধ্যে এক সাধারণ সম্বন্ধ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশ সকলের মধ্যেও এক্ষণে গমনাগমনের সুবিধা হওয়াতে পরস্পরের মধ্যে যোগ সংস্থাপনের সম্ভাবনা হইয়াছে। এক্ষণে অন্যান্য বিষয়ে অনৈক্যসত্ত্বেও সুইজরলণ্ড জর্ম্মেনি প্রভৃতি কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের ন্যায় রাজনৈতিক একতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

উপসংহার কালে সুশিক্ষিত বঙ্গবাসিগণকে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহারাই পাশ্চাত্য জ্ঞানোপার্জ্জনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন। জ্ঞানানুসারে দায়িত্বের তারতম্য হইয়া থাকে। সুতরাং যাহাতে সকল কল্যাণের নিদানস্বরূপ জাতীয় একতা ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়, তজ্জন্য অপ্রতিহত উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে যত্ন করা তাঁহাদেরই যারপর নাই কর্ত্তব্য। ইংরেজী ভাষা দ্বারা যাহা হয় হউক, কিন্তু হিন্দি শিক্ষা না করিলে কোনক্রমেই চলিবে না। হিন্দিভাষায় পুস্তক ও বক্তৃতা দ্বারা ভারতের অধিকাংশ স্থানের মঙ্গলসাধন করিতে পারিবেন কেবল বাঙ্গালা বা ইংরেজির চর্চ্চায় হইবে না। ভারতের অধিবাসীর সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে বাঙ্গালা ও ইংরেজী

কয়জন লোক বলিতে বা বুঝিতে পারেন? বাঙ্গালার ন্যায় যে হিন্দির উন্নতি হইতেছে না ইহা দেশের মহা দুর্ভাগ্যের বিষয়। হিন্দি ভাষার সাহায্যে ভারতবর্ষের বিভিন্নপ্রদেশের মধ্যে যাঁহারা ঐক্যবন্ধন সংস্থাপন করিতে পারিবেন তাঁহারাই প্রকৃত ভারতবন্ধু নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। সকলে চেষ্টা করুন, যত্ন করুন যতদিন পরেই হউক মনোরথ পূর্ণ হইবেই হইবে।

নঃ নাঃ

হিন্দুদিগের আগ্নেয়াস্ত্র।

বৈদিক কাল হইতেই আর্য্যেরা পাশ, বজ্র, শিলা, চক্র, ধনু প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করিতেন, তৎপরে রামায়ণ ও মহাভারতের যুদ্ধের সময় অন্যান্য নানাবিধ লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। অগ্নিপুরাণের মতে এই সকল অস্ত্র চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—যন্ত্রমুক্ত, পাণিমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও অমুক্ত। এ সকল অস্ত্র ভিন্ন আগ্নেয় অস্ত্রেরও উল্লেখ আছে কিন্তু তাহা কি প্রকার অস্ত্র বা যন্ত্র ইহার বিশেষ বিবরণ সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। উইলসন্ সাহেব শতঘ্নী নামক যন্ত্র আগ্নেয় যন্ত্র অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু তাহা কি প্রকার ছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নাই। ইহা ভিন্ন হিন্দুগণ মহাযন্ত্র নামক এক প্রকার আগ্নেয় যন্ত্র যুদ্ধকালে ব্যবহার করিতেন।

অদ্য আমরা সেই পূর্ব্বকালের আগ্নেয় যন্ত্রের বিবরণ শুক্রনীতি নামক সংস্কৃত-নীতিশাস্ত্র হইতে নিম্নে লিখিলাম। এই গ্রন্থ শুক্রাচার্য্যপ্রণীত। ইহার উল্লেখ অগ্নিপুরাণ ও মুদ্রারাক্ষস নাটকে আছে। ইহাতে নালিক যন্ত্র ও অগ্নিচূর্ণের বিষয় যে প্রকার লিখিত আছে, তাহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে আমরা প্রাচীনকালে বন্দুক ও বারুদ-গোলা ব্যবহার করিতাম।

(নালিক যন্ত্র)

নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎ ক্ষুদ্র বিভেদতঃ।

তির্য্যগূর্দ্ধং ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চ বিতস্তিকং।

নালিক দুই প্রকার। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র। কিঞ্চিৎ বক্র এবং ঊর্দ্ধ অর্থাৎ লম্বা ও পঞ্চ বিতস্তি পরিমাণ, ও মূল স্থানে ছিদ্রযুক্ত।

মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদি তিলবিন্দুযুতং সদা।

যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃৎ গ্রাবচূর্ণধৃক্ মূলকর্ণকম্।

তাহার মূলে এবং অগ্রে লক্ষ্য ভেদ

সূচক দুইটি তিলবিন্দু থাকিবে, এবং মূলে ছিদ্রস্থানে কর্ণ অর্থাৎ কাণ থাকিবে, অগ্নিজনক প্রস্তর সেই স্থানে যন্ত্রাবদ্ধ থাকিবে।

সুকাষ্ঠোপাঙ্গ বুধ্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুলি বিলান্তরম্।
স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণসন্ধাত্রী শলাকাসংযুতং দৃঢম্।

এই নালিকাস্ত্রটি উত্তম কাষ্ঠের উপাঙ্গে গ্রথিত এবং তাহার মূল অর্থাৎ মুষ্টি বা ধারণ করিবার স্থানও কাষ্ঠনির্ম্মিত। মধ্যম অঙ্গুলি প্রবিষ্ট হয় এরূপ বিল অর্থাৎ মধ্যে ছিদ্র থাকিবে। তাহার গাত্রে অগ্নিচূর্ণের সংঘাতকারী শলাকা আবদ্ধ থাকিবে।

লঘু নালিকমপ্যেতৎ প্রধার্য্যং পত্তিসাদিভিঃ।
যথা যথাতু ত্বক্ সারং যথাস্থূল বিলান্তরম্।
যথা দীর্ঘং বৃহৎ গোলং দূরভেদী তথা তথা।

ইহার নাম লঘুনালিক। ইহা পদাতি সৈন্য এবং অশ্বারোহী সৈন্যেরা ধারণ করিবে। এই লঘু নালিকের ত্বক অর্থাৎ বেধ যেমন পুরু ~~হইয়া থা~~কে, ছিদ্রও তদ্রূপ লম্বা ও দূরভেদী হইয়া থাকে।

মূলকীলভ্রমাল্লক্ষ্য সম সন্ধানভাজিয়ৎ।
বৃহন্নালিক সংজ্ঞন্তৎ কাষ্ঠবুধ্নবিবর্জ্জিতম্।

এই রূপ নালিকাস্ত্র যদি স্থূল হয় এবং কাষ্ঠনির্ম্মিত বুধ্ন অর্থাৎ মূল বা ধরিবার স্থান না থাকে, তাহা হইলে তাহার নাম বৃহন্নালিক।

প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুতং বিজয়প্রদম্।

ইহা এত বৃহৎ হইতে পারে, যে তাহা শকটাদি দ্বারা বহন করিতে হয় এবং ইহা বিজয়প্রদ শোভন অস্ত্র।

(অগ্নি চূর্ণ)

সুবর্চিলবণাৎ পঞ্চ পলানি গন্ধকাৎ পলম্।
অন্তর্ধূম বিপক্কার্ক স্নুহ্যাদ্যঙ্গারতঃ পলম্।
শুদ্ধাৎ সংগ্রাহ্য সঞ্চূর্ণ্য সম্মীল্য প্রপুটেৎ দ্রবৈঃ।
স্নুহ্যর্কাণাং রসেনাস্য শোধয়েদাতপেন চ।
পিষ্ট্বা শর্করবচ্চৈতদগ্নিচূর্ণং ভবেৎ খলু॥

সুবর্চি লবণ অর্থাৎ যবক্ষার বা সোরা ৫ পল, গন্ধক ৫ পল, ধূম বদ্ধ করিয়া দগ্ধ করা অর্ক অর্থাৎ আকন্দ স্নুহী অথাৎ সীজ প্রভৃতি কাষ্ঠের অঙ্গার ১ পল, সংশোধিত ও চূর্ণ করিয়া তাহা সীজ কি অর্ক রসে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্র শুষ্ক করিবে। পরে তাহা শর্করার ন্যায় চূর্ণ করিলে সেই চূর্ণের নাম অগ্নিচূর্ণ। ইহা নালাস্ত্রে ব্যবহার করিবে।

গোলো লৌহময়ো গর্ভ গুটিকঃ কেবলোঽপিবা।
সীসস্য লঘুনালার্থেহ্যন্য ধাতুময়োঽপিবা।
লৌহসারময়ং চাপি নালাস্ত্রন্ত্বন্যধাতুজম্।
নিত্য সম্মার্জনস্বচ্ছ মস্ত্রং পত্তিভি রাবৃতম্।

লৌহময় গোল, তাহার গর্ভে অন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা কি কেবল অর্থাৎ নিরেট্ ইহা বৃহন্নালাস্ত্রের ব্যবহার্য্য। লঘু নালের জন্য সীসনির্ম্মিত গুটিকা কি অন্য ধাতুনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গুটিকা নির্ম্মাণ করিবে। লৌহের সার অর্থাৎ খাঁটি লৌহ কি

তদ্বিধ অন্য ধাতুদ্বারা নির্ম্মিত নালাস্ত্র নিত্য মার্জন দ্বারা স্বচ্ছ রাখিবে। পদাতি ও অশ্বারোহিগণ তাহা ব্যবহার করিবে।

ক্ষিপন্তি চাগ্নি যোগাচ্চ গোলং লক্ষেষু নালগম্।
নালকং শোধয়েদাদৌ দদ্যাত্তত্রাগ্নি-চূর্ণকম্।
নিবেশয়েত দণ্ডেন নালমূলে তথা দৃঢ়ম্।
ততস্তু গোলকং দদ্যাৎ ততঃ কর্ণেঽগ্নি-চূর্ণকম্।
কর্ণ চূর্ণাগ্নিদানেন গোলং লক্ষে নিপা-তয়েৎ।

নালাস্ত্রগত গুলিকা অগ্নিসংযোগ দ্বারা লক্ষ্যে নিক্ষেপ করিবে। তাহার বিধান এইরূপ—প্রথমতঃ নালাস্ত্রটি শোধন করিবে, অর্থাৎ মলিনতা রহিত করিবে, পরে তন্মধ্যে অগ্নিচূর্ণ প্রদান করিবে, তাহা দণ্ডদ্বারা নালমূলে দৃঢ় প্রোথিত করিবে। তৎপরে তাহার মধ্যে গুলিকা নিক্ষেপ করিবে। কর্ণস্থানে অগ্নিচূর্ণ দিবে, সেই কর্ণস্থ অগ্নিচূর্ণে অগ্নি প্রদান করিবে। এইরূপ করিয়া সেই গুলিকা লক্ষ্যে নিপাতন করিবে।

লক্ষ্যভেদী যথা বাণো ধনুর্জ্জ্যা বিনিযো-জিতঃ।
ভবেত্তথা তু সন্ধায—

ধনুকের জ্যা দ্বারা বাণ যেমন বেগে যাইয়া লক্ষ্য ভেদ করে, ইহাও সেইমত বেগে যাইয়া লক্ষ্য ভেদ করিবে।

সমন্যূনাধিকৈ রংশৈরগ্নিচূর্ণান্য নেকশঃ
কল্পয়ন্তি চ তদ্বিদ্যাশ্চন্দ্রিকাভাদিমন্তিচ।

অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বকথিত দ্রব্য এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যের ভাগের ন্যূনাধিক বশতঃ অনেক প্রকার অগ্নিচূর্ণ হইয়া থাকে। তাহা তদ্বিদ্যাবিশারদেরা কল্পনা করিয়াছেন—তাহা চন্দ্রিকাতুল্য দীপ্তিযুক্ত।

(শুক্রনীতি ৪র্থ প্রকরণ।)

এই বিবরণ পাঠ করিয়া বোধ হয় ইউরোপীয়গণ বিশেষ আশ্চর্য্য হইবেন। কামান বন্দুক বারুদ গোলা গুলি প্রথমে ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া তথাকার অধিবাসীরা কতই আত্মগৌরব বর্দ্ধন করেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা দেখুন এ সকলই আমাদের ছিল। তাঁহা-দের বহুকাল পূর্ব্বে এ সকলই আমরা ব্যবহার করিয়াছি।

শুক্রনীতির এই শ্লোক গুলি সহসা আধুনিক বলিতে কেহ বোধ হয় প্রস্তুত নহেন, তবে ইহার আনুষঙ্গিক বলবৎ প্রমাণাভাবে আপাতত এবিষয়ের যথা-বিহিত বিচার করিতে পারিলাম না।

শ্রীরামদাস সেন।

স্বপ্ন-উন্মত্ততা—

১

কি সুখ স্বপন হায় ভাঙ্গিল আমার ?
দেখি নাই হেন স্বপ্ন দেখিব না আর,
জীবন আঁধারে হায়।
কেন বল দেখা যায়
এমন বিজলি খেলা,—সুখের সঞ্চার ?
কেন হেন সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল আমার ?

২

সত্য, প্রিয়বর।
ভ্রমি আশা মরুভূমে পিপাসা কাতর,
দেখিলাম চারু বন অতীব সুন্দর,—
(কিন্তু কি যন্ত্রণা।
আবার পাষাণ খানি কে চাপিল বুকে,
অবরুদ্ধ করি মম ভাবের প্রবাহ ?
হুহু করিতেছে প্রাণ, নাহি সরে মুখে
একটী বচন ; হায় ! একি অন্তর্দাহ ?)

৩

দেখিলাম, প্রিয়বর !
সে চারু কানন কোলে রম্য সরোবর,
প্রেমবারি সুশীতল
করিতেছে টলটল
কিন্তু না ছুঁইতে বারি মোহের সঞ্চার
হইল, পিপাসা মম পুরিল না আর !

৪

সেই মোহ স্বপ্নে,
হায় রে ত্রিদিব শোভা হইল বিকাশ,
শত চন্দ্র প্রকাশিল,
শত সিন্ধু উছলিল,
শত অপ্সরার কণ্ঠে সঙ্গীত ভাসিল,
সঙ্গীতে, সৌরভে, সখে ! হৃদয় ভরিল।

৫

হইনু উন্মত্ত আমি ; শিরায় শিরায়
ত্রিদিব মদিরা যেন কে দিল ঢালিয়া,
মাতিল পাগল প্রাণ,
হায়! হারাইনু জ্ঞান,
শত চন্দ্র করে স্নাত আকাশের পানে
চাহিলাম ; কি দেখিনু ? (নাহি সহে প্রাণে
ধর চাপি বক্ষ মম, কল্পনা ও তার,
করিতেছে চিত্তে মম মোহের সঞ্চার।)

৬

দেখিলাম অনর্গল গগনের দ্বার,
আঁধারিয়া শত চন্দ্র, জ্যোৎস্নার হার
নামিতেছে ধীরে ধীরে হৃদয়ে আমার।
কি মূর্ত্তি ! কি শোভা !
মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে হায় ! কত রূপান্তর,
মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে হায় ! রূপের সাগরে
কত লহরী সুন্দর।

৭

কিন্তু সেই রূপ রাশি,
কোমল পর্য্যঙ্ক অঙ্কে চিত্রিত নিদ্রায়,
মরি কি অপূর্ব্ব চিত্র ! মুক্ত কেশ রাশি
পড়েছে অসাবধানে শয্যা উপাধানে,
কাননের ছায়া যেন জ্যোৎস্নার গায়ে।
শোভে কেশাধারে সেই অতুল বদন,
অস্তগামী পূর্ণশশী সিন্ধু নীলিমায়।

৮

কিন্তু প্রিয়তম।
সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ সেই পদ্মানন ;
আকর্ণ বিশ্রান্ত সেই বিস্তৃত নয়ন,
আবৃত নিদ্রায় ; সেই চারু বক্তাধর
জীবনের মদিরায় সিক্ত নিরন্তর ;—
(সেই মদিরার স্মৃতি
এখনো করিছে মম অবশ অন্তর !)

৯

অতুল সে ভুজবল্লি , বক্ষ অনুপম—
পার্থিব ত্রিদিব ! যেন চারু শিল্পকর
অতরল জ্যোৎস্নায় করেছে গঠন,—
মরি মনোহর !
সর্ব্ব শেষে—বলিব না, বলিব কি ছাই,
যাহার তুলনা নবচক্ষে দেখি নাই—
সেই বর্ণ,—যেই বর্ণ নয়নের জ্যোতি,
মম জীবন আলোক,
কতদীর্ঘ বর্ষ যাহা জাগ্রতে, নিদ্রায়,
করেছে হৃদয় মম বিভাসিত হায় !—

১০

সেই বর্ণ,—না না সখে! পারিব না আমি,
চিত্রিতে তোমার কাছে,—
সে যে বর্ণ জীবন্ত জ্যোৎস্না
দেখি নাই ইহ জন্মে, দেখিতে পাব না।
কিন্তু সেই রূপরাশি, নয়ন, বরণ,
দেখেছি দেখেছি যেন হইল স্মরণ।

১১

(দেও সখে সুরাপাত্র, ওই বিষবারি,
নিবাই স্মৃতির জ্বালা,
তুমি মূর্খ !
নিষ্ঠুর হৃদয় তব,
নাহি কর অনুভব,
সুরাপাত্র হায়! কত সন্তাপসংহারী।)

১২

কিম্বা আন তীক্ষ্ণ ছুরি দেখাই তোমারে,
এ নহে প্রথম হায়।
দেখিনু সে প্রতিমায়,
আন ছুরি চিরি বক্ষ দেখাই তোমারে
আন ছুরি চিরি বক্ষ,
দেখাই স্মৃতির কক্ষ,
এ মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি, গোপনে, আদরে,
রাখিয়াছি কত কাল অন্তর-অন্তরে।

১৩

গোপনে প্রণয়পুষ্পে, নয়নের জলে,
পূজিয়াছি কত কাল হৃদয় বাসিনী ;
প্রতিদিন বলিদান,
দিয়াছি হৃদয় প্রাণ,—
আত্মঘাতী পূজা ! হায় ! তথাপি কখন,
দারুণ যন্ত্রণা কেহ করেনি দর্শন।

১৪

জানিতাম
হায়রে পাষাণময়ী দেবতা আমার ,
জানিতাম
নন্দন কুসুমে শত উপাসক তার
পূজিতেছে নিত্য নিত্য বৈকুণ্ঠে তাহারে।
তবে কেন এই পূজা, আত্মবলিদান ?
নাহি জানিতাম সখে ! কিন্তু জানিতাম—
(দেও সুরাপাত্র হায় ! বলিব এখন)—
এই উপাসনা মম জীবন মরণ।

১৫

আজি সখে সেই
জীবনের আরাধনা, তপস্যার ফল,
দেখিলাম নামিতেছে ত্রিদিব হইতে
আমি ভকত হৃদয়ে।
কাঁপিলেক থর থর,
এই ভগ্ন কলেবর,
অজ্ঞাতে দক্ষিণ কর হলো প্রসারিত,
ফলিল তপস্যা, দেবী পাইল সম্বিত।

১৬

"প্রাণনাথ!—
জীবন সর্ব্বস্ব মম।—জীবন আমার!—
আমার জীবন!
দেখিতেছিলাম আমি স্বপনে তোমারে।"
কহিল মধুরে কর্ণে।
"প্রাণময়ি! প্রেমময়ি! তপস্বী তোমার।"
পড়িনু চরণ প্রান্তে; মনে নাহি আর।

১৭

পোহাল শর্ব্বরী,
প্রভাত কাকলি সহ প্রভাত সমীর
জাগাল আমারে, সখে! পাইনু চেতন,
কিন্তু কোথা সখে! মম তপস্যার ধন?
এ জনমে তারে আমি পাব কি আবার?
কেন হেন সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিল আমার?

১৮

স্বপ্ন!! না না সখে,
এই সুখ, স্বপ্ন যদি? জীবনে আমার
কোথায় প্রকৃত সুখ?
আমার জীবনে আমি,
এই এক সুখ জানি,
স্বপন বলিলে তারে ফাটিবে যে বুক!
নিষ্ঠুর কালের স্রোত, সর্ব্বস্ব আমার
নেও ভাসাইয়া তুমি, তাহে ক্ষতি নাই,
এই মুহূর্ত্তটী মাত্র আমি ভিক্ষা চাই।

১৯

ছাড় কর, প্রিয়তম,
ছাড় কর দেও ওই তীক্ষ্ণ ছুরি খানি,
সর্ব্বস্ব অর্পণ করি,
কালের চরণে পড়ি,
সেই মুহূর্ত্তটী আমি ভিক্ষা মাগি আনি।

২০

আবার পাষাণ খানি চাপিয়াছে বুকে,
আবার দারুণ জ্বালা জ্বলিল আমার,
হুহু করিতেছে প্রাণ,
সংসার শ্মশান জ্ঞান,—
কি পিপাসা! আন সুরা, আন বিষ, ছুরি,
নিবাই দারুণ জ্বালা যন্ত্রণা পাসরি।

শ্রীনঃ

কৃষ্ণকান্তের উইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রমর, শ্বশুরকে কোন প্রকার অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইল না—বড় লজ্জা করে—ছি!

অগত্যা গোবিন্দলাল স্বয়ং কৃষ্ণকান্তের কাছে গেলেন। কৃষ্ণকান্ত তখন, আহারান্তে পালঙ্কে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায়, আলবোলার নল হাতে করিয়া—সুষুপ্ত। এক দিকে তাঁহার নাসিকা, নাদ সুরে গমকে গমকে তান মূর্চ্ছনাদি সহিত নানাবিধ রাগ রাগিণীর আলাপ করিতেছে—আর এক দিকে, তাঁহার মন, অহিফেন প্রসাদাৎ ত্রিভুবনগামী অশ্বে আরূঢ় হইয়া নানাস্থান পর্য্যটন করিতেছে। রোহিণীর চাঁদ পানা মুখ খানা বুড়ারও মনের ভিতর ঢুকিয়া ছিল বোধ হয়,—চাঁদ কোথায় উদয় না হয়?—নহিলে বুড়া আফিঙ্গের ঝোঁকে, ইন্দ্রাণীর স্কন্ধে সে মুখ বসাইবে কেন? কৃষ্ণকান্ত দেখিতেছেন যে রোহিণী হঠাৎ ইন্দ্রের শচী হইয়া, মহাদেবের গোহাল হইতে ষাঁড় চুরি করিতে গিয়াছে। নন্দী ত্রিশূল হস্তে ষাঁড়ের জাব দিতে গিয়া, তাহাকে ধরিয়াছে। দেখিতেছেন, নন্দী রোহিণীর আলুলায়িত কুন্তল দাম ধরিয়া টানাটানি লাগাইয়াছে, এবং ষড়াননের ময়ূর, সন্ধান পাইয়া, তাহার সেই আগুল্ফ বিলম্বিত কুঞ্চিত কেশগুচ্ছকে স্ফীতফণা ফণিশ্রেণী ভ্রমে গিলিতে গিয়াছে—এমত সময়ে স্বয়ং ষড়ানন ময়ূরের দৌরাত্ম্য দেখিয়া নালিশ করিবার জন্য মহাদেবের কাছে উপস্থিত হইয়া ডাকিতেছেন, "জ্যেঠা মহাশয়!"

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, কার্ত্তিক মহাদেবকে কি সম্পর্কে "জ্যেঠা মহাশয় বলিয়া ডাকিতেছেন?" এমত সময়ে কার্ত্তিক আবার ডাকিলেন, "জ্যেঠা মহাশয়।" কৃষ্ণকান্ত বড় বিরক্ত হইয়া কার্ত্তিকের কাণ মলিয়া দিবার অভিপ্রায়ে হস্ত উত্তোলন করিলেন। অমনি কৃষ্ণকান্তের হস্তস্থিত আলবোলার নল, হাত হইতে খসিয়া ঝনাৎ করিয়া পানের বাটার উপর পড়িয়া গেল, পানের বাটা ঝন ঝন ঝনাৎ করিয়া পিকদানির উপর পড়িয়া গেল, এবং নল, বাটা, পিকদানি, সকলেই একত্রে সহগমন করিয়া ভূতলশায়ী হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকান্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি নয়নোন্মীলন করিয়া দেখেন, যে কার্ত্তিকেয় যথার্থই উপস্থিত। মূর্ত্তিমান স্কন্দবীরের ন্যায়, গোবিন্দলাল তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন—ডাকিতেছেন, "জ্যেঠা মহাশয়।" কৃষ্ণকান্ত শশব্যস্তে

উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা গোবিন্দলাল?" বুড়া গোবিন্দলালকে বড় ভাল বাসিত।

গোবিন্দলালও কিছু অপ্রতিভ হইলেন—বলিলেন, "আপনি নিদ্রা যান—আমি এমন কিছু কাজে আসি নাই।" এই বলিয়া, গোবিন্দলাল পিকদানিটি উঠাইয়া সোজা করিয়া রাখিয়া, পানবাটা উঠাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া, নলটি কৃষ্ণকান্তের হাতে দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত শক্ত বুড়া—সহজে ভুলে না—মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"কিছু না, এ ছুঁচো আবার সেই চাঁদ মুখো মাগীর কথা বলিতে আসিয়াছে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "না। আমার ঘুম হইয়াছে—আর ঘুমাইব না।"

গোবিন্দলাল একটু গোলে পড়িলেন। রোহিণীর কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে বলিতে প্রাতে তাঁহার কোন লজ্জা করে নাই—এখন একটু লজ্জা করিতে লাগিল—কথা বলি বলি করিয়া বলিতে পারিলেন না। রোহিণীর সঙ্গে বারুণী পুকুরের কথা হইয়াছিল বলিয়া কি এখন লজ্জা?

বুড়া রঙ্গ দেখিতে লাগিল। গোবিন্দলাল,কোন কথা পাড়িতেছে না দেখিয়া, আপনি জমীদারির কথা পাড়িল—জমীদারির কথার পর সাংসারিক কথা,সাংসারিক কথার পর মোকদ্দমার কথা,তথাপি রোহিণীর দিক দিয়াও গেল না। গোবিন্দলাল রোহিণীর কথা কিছুতেই পাড়িতে পারিলেন না। কৃষ্ণকান্ত মনে মনে ভাবি হাসি হাসিতে লাগিলেন। বুড়া বড় দুষ্ট।

অগত্যা গোবিন্দলাল ফিরিয়া যাইতেছিলেন,—তখন কৃষ্ণকান্ত প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"সকাল বেলা যে মাগীকে তুমি জামিন হইয়া লইয়া গিয়াছিলে, সে মাগী কিছু স্বীকার করিয়াছে?"

তখন গোবিন্দলাল পথ পাইয়া যাহা যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বলিলেন। বারুণী পুষ্করিণী ঘটিত কথাগুলি গোপন করিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,

"এখন তাহার প্রতি কি রূপ করা তোমার অভিপ্রায়?"

গোবিন্দলাল লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আপনার যে অভিপ্রায়, আমাদিগেরও সেই অভিপ্রায়।"

কৃষ্ণকান্ত মনে মনে হাসিয়া মুখে কিছু মাত্র হাসির লক্ষণ না দেখাইয়া বলিলেন, "আমি উহার কথায় বিশ্বাস করি না। উহার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, দেশের বাহির করিয়া দাও—কি বল?"

গোবিন্দলাল চুপ করিয়া রহিলেন। তখন দুষ্ট বুড়া বলিল—"আর তোমরা যদি এমনই বিবেচনা কর, যে উহার দোষ নাই—তবে ছাড়িয়া দাও।"

গোবিন্দলাল তখন নিশ্বাস ছাড়িয়া বুড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রোহিণী, গোবিন্দলালের অনুমতি ক্রমে হরলালের দত্ত নোট বাহির করিয়া লইতে আসিল। ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সিন্দুক হইতে নোট বাহির করিল। ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে আসিতেছিল—কিন্তু গেল না। মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িয়া, নোট গুলির উপর পা রাখিয়া, রোহিণী কাঁদিতে বসিল।

"এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়া হইবে না—না দেখিয়া মরিয়া যাইব। আমি কলিকাতায় গেলে, গোবিন্দলালকে ত দেখিতে পাইব না। আমি যাইব না। এই হরিদ্রাগ্রাম আমার স্বর্গ, এখানে গোবিন্দলালের মন্দির। এই হরিদ্রাগ্রামই আমার শ্মশান, এখানে আমি পুড়িয়া মরিব। শ্মশানে মরিতে পায় না, এমন কপালও আছে! আমি যদি এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া না যাই, ত আমার কে কি করিতে পারে? কৃষ্ণকান্ত রায় আমার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া দেশছাড়া করিয়া দিবে? আমি আবার আসিব। গোবিন্দলাল রাগ করিবে? করে, করুক, —তবু আমি তাহাকে দেখিব। আমার চক্ষু ত কাড়িয়া লইতে পারিবে না। আমি যাব না। কলিকাতায় যাব না—কোথাও যাব না! যাইত, যমের বাড়ী যাব। আর কোথাও না।"

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, কালামুখী রোহিণী উঠিয়া, নোট গুড়াইয়া লইয়া, দ্বার খুলিয়া আবার—"পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষু"—সেই গোবিন্দলালের কাছে চলিল। মনে মনে বলিতে২ চলিল,—"হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখিজনের একমাত্র সহায়! আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর? আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না। আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি—তাহাকে যতবার দেখিব, ততবার—আমার অসহ্য যন্ত্রণা—অনন্ত সুখ। আমি বিধবা—আমার ধর্ম্ম গেল—সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি প্রভু—রাখিব কি প্রভু—হে দেবতা! হে দুর্গা—হে কালি—হে জগন্নাথ—আমায় সুমতি দাও—আমার প্রাণস্থির কর—আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।"

তবু সেই স্ফীত, হৃত, অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয়—থামিল না। কখন ভাবিল গরল খাই, কখন ভাবিল গোবিন্দলালের পদপ্রান্তে পড়িয়া, অন্তঃকরণ মুক্ত করিয়া সকল কথা বলি, কখন ভাবিল পলাইয়া যাই, কখন ভাবিল বারুণীতে ডুবে মরি, কখন ভাবিল ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাই। রোহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে গোবিন্দলালের কাছে, নোট ফিরাইয়া দিল।

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন? কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল ত?"

রো। না

গো। সে কি? এই মাত্র যে আমার কাছে স্বীকার করিয়াছিলে?

রো। যাইতে পারিব না।

গো। বলিতে পারি না। জোর করিবার আমার কোনই অধিকার নাই—কিন্তু গেলে ভাল হইত।

রো। কিসে ভাল হইত?

গোবিন্দলাল অধোবদন হইলেন, স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলিবার তিনি কে?

রোহিণী তখন, চক্ষের জল লুকাইয়া মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিয়া গেল। গোবিন্দলাল নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তখন ভোমরা নাচিতে নাচিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, " ভাবছ কি?"

গো। বল দেখি?

ভ্র। আমার কালরূপ।

গো। ইঃ—

ভোমরা ঘোরতর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল "সে কি? আমায় ভাবছনা? আমি ছাড়া, পৃথিবীতে তোমার অন্য চিন্তা আছে?"

গো। আছে না ত কি? সর্ব্বে সর্ব্বময়ী আর কি? আমি অন্য মানুষ ভাবতেছি।

ভ্রমর,তখন গোবিন্দলালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, মুখচুম্বন করিয়া, আদরে গলিয়া গিয়া, আধো আধো, মৃদু মৃদু হাঁসি মাখা স্বরে, জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য মানুষ—কাকে ভাবছ বল না?"

গো। কি হবে তোমায় বলিয়া?

ভ্র। বল না!

গো। তুমি রাগ করিবে।

ভ্র। করি কর্‌ব—বল না।

গো। যাও, দেখ গিয়া সকলের খাওয়া হলো কি না।

ভ্র। দেখ্‌বো এখন—বল না কে মানুষ?

গো। সিয়াকুল কাঁটা। রোহিণীকে ভাব্‌ছিলাম।

ভো। কেন রোহিণীকে ভাব্‌ছিলে?

গো। তা কি জানি?

ভো। জান—বল না।

গো। মানুষ কি মানুষকে ভাবে না?

ভো। না। যে যাকে ভাল বাসে, সে তাকেই ভাবে। আমি তোমাকে ভাবি—তুমি আমাকে ভাব।

গো। তবে আমি রোহিণীকে ভাল বাসি।

ভো। মিছে কথা—তুমি আমাকে ভাল বাস—আর কাকেও তোমার ভাল বাস্‌তে নাই—কেন রোহিণীকে ভাব্‌ছিলে বল না?

গো। বিধবাকে মাছ খাইতে আছে?

ভো। না।

গো। বিধবাকে মাছ খাইতে নাই, তবু তারিণীর মা মাছ খায় কেন?

ভো। তার পোড়ার মুখ—যা করতে নাই তাই করে।

গো। আমারও পোড়ার মুখ, যা

করতে নাই তাই করি। রোহিণীকে ভাল বাসি।

ধাঁ করিয়া গোবিন্দলালের গালে ভোমরা এক ঠোনা মারিল। বড় রাগ করিয়া বলিল, "আমি শ্রীমতী ভোমরা দাসী—আমার সাক্ষাতে মিছে কথা?"

গোবিন্দলাল হারি মানিল। ভ্রমরের স্কন্ধে হস্ত আরোপিত করিয়া, প্রফুল্ল-নীলোৎপলদলতুল্য মধুরিমাময় তাহার মুখমণ্ডল স্বকরপল্লবে গ্রহণ করিয়া মৃদু মৃদু, অথচ গম্ভীর, কাতরকণ্ঠে গোবিন্দলাল বলিল, "মিছে কথাই ভোমরা। আমি রোহিণীকে ভাল বাসি না। রোহিণী আমায় ভাল বাসে।"

তীব্রবেগে গোবিন্দলালের হাত হইতে মুখমণ্ডল মুক্ত করিয়া ভোমরা দূরে গিয়া দাঁড়াইল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল,

"—আবাগী—পোড়ার মুখী—বাঁদরী—মরুক। মরুক! মরুক। মরুক! মরুক।"

গোবিন্দলাল হাসিয়া বলিলেন, "এখনই এত গালি কেন? তোমার সাত রাজার ধন এক মাণিক এখনও ত কেড়ে নেয় নি।"

ভোমরা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "—দূর তা কেন—তা কি পারে—তা মাগী তোমার সাক্ষাতে বলিল কেন?"

গো। ঠিক ভোমরা—বলা তাহার উচিত ছিল না—তাই ভাবিতেছিলাম। আমি তাহাকে বাস উঠাইয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে বলিয়াছিলাম—আমাকে আর দেখিতে না পায়। খরচ পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার করিয়াছিলাম।

ভো। তার পর?

গো। তার পর, সে রাজি হইল না।

ভো। ভাল, আমি তাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি?

গো। পার, কিন্তু আমি পরামর্শটা শুনিব।

ভো। শোন।

এই বলিয়া ভোমরা "ক্ষীরি! ক্ষীরি" করিয়া একজন চাকরাণীকে ডাকিল।

তখন ক্ষীরোদা—ওরফে ক্ষীরোদমণি ওরফে ক্ষীরাব্ধিতনয়া ওরফে শুধু ক্ষীরি আসিয়া দাঁড়াইল—মোটাসোটা গাঁটা গোটা—মল পায়ে গোট পরা—হাসি চাহনিতে ভরা ভরা। ভোমরা বলিল,

"ক্ষীরি,—রোহিণী পোড়ার মুখীর কাছে এখনই একবার যাইতে পারবি?"

ক্ষীরি বলিল, "পার্‌ব না কেন? কি বল্‌তে হবে?"

ভোমরা বলিল, "আমার নাম করিয়া বলিয়া আয়, যে তিনি বল্‌লেন, তুমি মর।"

"এই? যাই।" বলিয়া ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষীরি—মল বাজাইয়া চলিল। গমন কালে ভোমরা বলিয়া দিল, "কি বলে আমায় বলিয়া যাস্‌।"

"আচ্ছা।" বলিয়া ক্ষীরোদা গেল। অল্পকাল মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বলিয়া আসিয়াছি।"

ভো। সে কি বলিল?

ক্ষীরি। সে বলিল, উপায় বলিয়া দিতে বলিও।

ভো। তবে আবার যা। বলিয়া আয়—যে বারুণী পুকুরে—সন্ধ্যাবেলা কলসী গলায় দিয়ে—বুঝেছিস?

ক্ষীরি। আচ্ছা।

ক্ষীরি আবার গেল। আবার আসিল। ভোমরা জিজ্ঞাসা করিল, "বারুণী পুকুরের কথা বলেছিস?"

ক্ষীরি। বলিয়াছি।

ভো। সে কি বলিল?

ক্ষী। বলিল যে "আচ্ছা।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ছি ভোমরা।"

ভোমরা বলিল, "ভাবিও না। সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে—সে কি মরিতে পারে?"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দলাল, হরলালের হাজার টাকা ডাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন। লিখিয়া দিলেন, আপনি যে জন্য রোহিণীকে টাকা দিয়াছিলেন তাহার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, রোহিণী টাকা ফিরাইয়া দিতেছে।

দৈনিক কার্য্য সমস্ত সমাপ্ত করিয়া, প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে গোবিন্দলাল দিনান্তে বারুণীর তীরবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান ভ্রমণ জীবনে একটি প্রধান সুখ। সকল বৃক্ষের তলায় দুই চারি বার বেড়াইতেন। কিন্তু আমরা সকল বৃক্ষের কথা এখন বলিব না। বারুণীর কূলে, উদ্যান মধ্যে, এক উচ্চ প্রস্তর বেদিকা ছিল, বেদিকা মধ্যে একটি শ্বেতপ্রস্তর খোদিত স্ত্রীপ্রতিমূর্ত্তি—স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধাবৃতা, বিনতলোচনা—একটি ঘট হইতে আপন চরণ দ্বয়ে যেন জল ঢালিতেছে,—তাহার চারিপার্শ্বে বেদিকার উপরে, উজ্জ্বলবর্ণরঞ্জিত মৃণ্ময় আধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সপুষ্প বৃক্ষ—জিরানিয়ম, ভর্বিনা, ইউফর্বিয়া, চন্দ্র মল্লিকা, গোলাব—নীচে, সেই বেদিকা বেষ্টন করিয়া, কামিনী, যূথিকা, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধী দেশী ফুলের সারি, গন্ধে গগন আমোদিত করিতেছে—তাহারই পরে বহুবিধ উজ্জ্বল নীলপীত রক্ত শ্বেত নানা বর্ণের দেশী বিলাতী নয়নরঞ্জনকারী পুষ্প বৃক্ষ শ্রেণী। সেই খানে গোবিন্দলাল বসিতে ভাল বাসিতেন। জ্যোৎস্না রাত্রে কখন কখন ভ্রমরকে উদ্যান ভ্রমণে আনিয়া সেইখানে বসাইতেন। ভ্রমর পাষাণময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধাবৃতা দেখিয়া তাহাকে কালামুখী বলিয়া গালি দিত—কখন কখন আপনি অঞ্চল দিয়া তাহার অঙ্গ আবৃত করিয়া দিত—কখন কখন গৃহ হইতে উত্তম বস্ত্র সঙ্গে আনিয়া তাহাকে পরাইয়া দিয়া যাইত—কখন কখন তাহার হস্তস্থিত ঘট লইয়া টানাটানি বাধাইত।

সেই খানে আজি, গোবিন্দলাল সন্ধ্যাকালে বসিয়া, দর্পণানুরূপ বারুণীর জলশোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে

দেখিতে দেখিলেন, সেই পুষ্করিণীর প্রশস্ত প্রস্তরনির্ম্মিত সোপান পরম্পরায় রোহিণী কলসী কক্ষে অবরোহণ করিতেছে। সব না হইলে চলে, জল না হইলে চলে না। এ দুঃখের দিনেও রোহিণী জল লইতে আসিয়াছে। রোহিণী জলে নামিযা, গাত্রমার্জ্জনা করিবার সম্ভাবনা—দৃষ্টিপথে তাঁহার থাকা অকর্ত্তব্য বলিযা গোবিন্দলাল সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ গোবিন্দলাল এ দিক্ ও দিক্ বেড়াইলেন। শেষ মনে করিলেন, এতক্ষণ রোহিণী উঠিয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া আবার সেই বেদিকাতলে জলনিসেকনিরতা পাষাণসুন্দরীর পদপ্রান্তে আসিয়া বসিলেন। আবার সেই বারুণীর শোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, রোহিণী বা কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষ কোথাও কেহ নাই। কেহ কোথাও নাই—কিন্তু সে জলোপরে একটি কলসী ভাসিতেছে।

কার কলসী? হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হইল—কেহ জল লইতে আসিয়া ডুবিয়া যায় নাই ত? রোহিণীই এই মাত্র জল লইতে আসিয়াছিল। তখন অকস্মাৎ পূর্ব্বাহ্নের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে ভ্রমর রোহিণীকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে বারুণী পুকুরে—সন্ধ্যাবেলা—কলসী গলায় বেঁধে। মনে পড়িল যে রোহিণী প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, "আচ্ছা।"

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ পুষ্করিণীর ঘাটে আসিলেন। সর্ব্বশেষ সোপানে দাঁড়াইয়া পুষ্করিণীর সর্ব্বত্র দেখিতে লাগিলেন। জল, কাচতুল্য স্বচ্ছ। ঘাটের নীচে জলতলস্থ ভূমি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। দেখিলেন, স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈম প্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইযা আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ জলে নামিযা ডুব দিয়া, রোহিণীকে উঠাইয়া, সোপানউপরি শায়িত করিলেন। দেখিলেন রোহিণী জীবিত আছে কি না সন্দেহ; সে সংজ্ঞাহীন, নিশ্বাস প্রশ্বাসরহিত।

উদ্যান হইতে গোবিন্দলাল একজন মালীকে ডাকিলেন। মালীর সাহায্যে রোহিণীকে বহন করিয়া উদ্যানস্থ প্রমোদ গৃহে শুশ্রূষা জন্য লইযা গেলেন। জীবনে হউক, মরণে হউক, রোহিণী শেষে গোবিন্দলালের প্রমোদগৃহে প্রবেশ করিল। ভ্রমর ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোক কখন সে গৃহে প্রবেশ করে নাই।

বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত, সেই মৃত নারীদেহ পালঙ্কে লম্বমান হইয়া প্রজ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশাল দীর্ঘ বিলম্বিত ঘোরকৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজু—তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘে যেন জলবৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদিত; কিন্তু সেই মুদিত

পঙ্কের উপরে ভ্রূযুগ জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণ শোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাট—স্থির,বিস্তারিত,লজ্জাভয় বিহীন, কোন অব্যক্ত ভাববিশিষ্ট—গণ্ড এখনও উজ্জ্বল—অধর এখনও মধুময়, বান্ধুলী পুষ্পের লজ্জাস্থল। গোবিন্দলালের চক্ষে জল পড়িল। বলিলেন, "মরি মরি। কেন তোমায় বিধাতা এতরূপ দিয়া পাঠাইয়া ছিলেন, দিয়াছিলেন ত সুখী করিলেন না কেন? এমন করিয়া তুমি চলিলে কেন?" এই সুন্দরীর আত্মঘাতের তিনি নিজেই যে মূল—এ কথা মনে করিয়া তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল।

আজি গোবিন্দলালের পারীক্ষার দিন। আজ গোবিন্দলাল পিত্তল কি সোণা বুঝা যাইবে।

যদি রোহিণীর জীবন থাকে, রোহিণীকে বাঁচাইতে হইবে। জলমগ্নকে কি প্রকারে বাঁচাইতে হয়, গোবিন্দলাল তাহা জানিতেন। উদরস্থ জল সহজেই বাহির করান যায়। দুই চারি বার রোহিণীকে উঠাইয়া বসাইয়া, পাশ ফিরাইয়া, ঘুরাইয়া, জল উদ্গীর্ণ করাইলেন। কিন্তু তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিল না। সেইটী কঠিন কাজ।

গোবিন্দলাল জানিতেন যাহাকে ডাক্তারেরা Sylvester's Method বলেন তদ্দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত করান যাইতে পারে। মুমূর্ষুর বাহুদ্বয় ধরিয়া ঊর্দ্ধোত্তোলন করিলে, অন্তরস্থ বায়ুকোষ স্ফীত হয়। সেই সময়ে রোগীর মুখে ফুৎকার দিতে হয়। পরে উত্তোলিত বাহুদ্বয়,ধীরে ধীরে নামাইতে হয়। নামাইলে বায়ুকোষ সঙ্কুচিত হয; তখন সেই ফুৎপ্রেরিত বায়ু আপনিই নির্গত হইয়া আইসে। ইহাতে কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে২ বায়ুকোষের কার্য্য স্বতঃ পুনরাগত হইতে থাকে; কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত করাইতে করাইতে সহজ নিশ্বাস প্রশ্বাস আপনি উপস্থিত হয়। রোহিণীকে তাই করিতে হইবে। দুই হাতে দুইটী বাহু তুলিয়া ধরিয়া তাহার মুখে ফুৎকার দিতে হইবে, তাহার সেই পক্ক বিম্ববিনিন্দিত, এখনও সুধাপরিপূর্ণ, মদনমদোন্মাদহলাহলকলসীতুল্য, রাঙ্গা রাঙ্গা মধুর অধরে অধর দিয়া ফুৎকার দিতে হইবে। কি সর্ব্বনাশ। কে দিবে?

গোবিন্দলালের এক সহায়, উড়িয়া মালী। বাগানের অন্য চাকরেরা ইতিপূর্ব্বেই গৃহে গিয়াছিল। তিনি মালীকে বলিলেন, আমি ইহার হাত দুইটি তুলে ধরি, তুই ইহার মুখে ফুঁ দে দেখি?

মুখে ফুঁ! সর্ব্বনাশ! ঐ রাঙ্গা রাঙ্গা সুধামাখা অধরে, মালীর মুখের ফুঁ—তা হেবে না অবধড়!

মালীকে মুনিব যদি শালগ্রামের উপর পা দিতে বলিত, মালী মুনিবের খাতিরে দিলে দিতে পারিত,কিন্তু সেই চাঁদমুখের রাঙ্গা অধরে—সেই জগন্নেথে মুখের ফুঁ! মালী ঘামিতে আরম্ভ করিল। স্পষ্ট বলিল,

"মু ত পারিবে না অবধড়'"

মালী ঠিক বলিয়াছিল। মালী সেই দেবদুর্লভ ওষ্ঠাধরে যদি একবার মুখ দিয়া ফুঁ দিত, তার পর যদি রোহিণী বাঁচিয়া উঠিয়া, আবার সেই ঠোঁট ফুলাইয়া কলসীকক্ষে জল লইয়া, মালীর পানে চাহিয়া, ঘরে যাইত—তবে আর তাহাকে ফুলবাগানের কাজ করিতে হইত না। সে খোন্তা, খুর্‌পো, নিড়িন, কাঁচি, কোদালি, বারুণীর জলে ফেলিয়া দিয়া, এক দৌড়ে ভদরক-অ পানে ছুটিত সন্দেহ নাই—বোধ হয় সুবর্ণরেখার নীলজলে ডুবিয়া মরিত। মালী অত ভাবিয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু মালী ফুঁ দিতে রাজি হইল না।

অগত্যা গোবিন্দলাল তাহাকে বলিলেন, "তবে তুই এইরূপ ইহার হাত দুইটি ধীরে২ উঠাইতে থাক—আমি ফুঁ দিই। তাহার পর ধীরে২ হাত নামাইবি।" মালী তাহা স্বীকার করিল। সে হাত দুইটি ধরিয়া ধীরে২ উঠাইল—গোবিন্দলাল, তখন সেই ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া—রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন।

সেই সময়ে, ভ্রমর, একটা লাঠি লইয়া একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।

মালী রোহিণীর বাহুদ্বয় নামাইল। আবার উঠাইল। আবার গোবিন্দলাল ফুৎকার দিলেন। আবার সেইরূপ হইল। আবার সেইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিলেন। দুই তিন ঘণ্টা এইরূপ করিলেন। রোহিণীর নিশ্বাস বহিল। রোহিণী বাঁচিল।

আমাদের গৌরবের দুই সময়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বুদ্ধিবিপ্লবের ফল।

(পূর্ব্বপ্রস্তাবের সংক্ষিপ্তার্থ।)

আমরা পূর্ব্বপ্রস্তাবে প্রথম বুদ্ধিবিপ্লবের পূর্ব্বতন সামাজিক অবস্থা, উহার কারণ, প্রকৃতি, এবং উহা দ্বারা আন্তরিক ও বাহিক যে সকল উন্নতি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। আর্য্য ও অনার্য্য সমাজের একত্র বাস বিপ্লবের কারণ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বিবাদ তাহার উদ্দীপক। বিপ্লবকালের সকল সম্প্রদায়ের লোক হইতেই আমরা গ্রন্থাদি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সময়ে দর্শনের সৃষ্টি আইনের সৃষ্টি ও সর্ব্বভূতে দয়া.অহিংসাপরমধর্ম্ম প্রভৃতি উন্নত নীতির সৃষ্টি হয়। এক্ষণে উহার ফলগুলি একটু বিস্তারক্রমে বর্ণনা করিব।

(প্রথম ফল যাগ যজ্ঞের বিরলপ্রচার।)

বিপ্লবের পূর্ব্বে লিখিত ব্রাহ্মণ নামক বেদের অংশগুলি নানারূপ যজ্ঞকাণ্ডের নিয়মে পরিপূর্ণ। উহাতে মাসব্যাপী, বৎসরব্যাপী, দ্বাদশ বৎসরব্যাপী, বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞের কথা আছে। ব্রাহ্মণ সকল ছাপা হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহাতে দেখিতে পাই জগতের যাবতীয় দ্রব্যই যজ্ঞের প্রয়োজনে লাগিত। এক স্থানে দেখিয়াছি ইন্দুর মাটীও কাজে লাগিয়াছে। বিপ্লবের পর যাগযজ্ঞ ক্রমে কমিয়াছে। ইহার পর আর অশ্বমেধ গোমেধ প্রভৃতি বড়বড় যজ্ঞের নাম বড় একটা শুনিতে পাই না। যদিও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পর্যান্ত বাজপেয়াদি যজ্ঞ হইয়াছে তথাপি ব্রাহ্মণকালের তুলনায় বিপ্লবের পর যজ্ঞ আর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যজ্ঞতৃষ্ণা নিবৃত্ত হইবার এক কারণ এই যে ব্রাহ্মণকালে যজ্ঞভিন্ন মুক্তি ও ভূতি-লাভের উপায় ছিল না। বিপ্লবের সময় জ্ঞানই মুক্তির উপায় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ক্রমে আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য মুক্তিপ্রদায়ক বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং যাগযজ্ঞের আর শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই।

(বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি।)

সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় যজ্ঞের অসংখ্য পশুবধ দেখিয়া শুদ্ধোদন রাজার পুত্র মহামতি বুদ্ধদেব দয়াপরবশ হইয়া অহিংসাপরমোধর্ম্মঃ এবং জ্ঞানই মুক্তির উপায় এই দুইটী মতের প্রচার করেন। উহাই বৌদ্ধধর্ম্মের মূলমন্ত্র। আমরা দেখিতে পাই উপনিষদ্ সমূহেও ঐ দুই মত আছে, সুতরাং বোধ হয় উহারা এই বিপ্লবকালে উদ্ভাবিত বহুসংখ্যক নূতন মতের অন্যতম। পূর্ব্বাঞ্চলে বুদ্ধদেব ঐ মতদ্বয়ের প্রচার করেন। পূর্ব্বাঞ্চলে ব্রাহ্মণবিরোধী সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক ছিল, তাহার মত সেখানে সাদরে গৃহীত হয়। দেখিতে দেখিতে মিথিলা মগধ কোশলা কাশী প্রভৃতি স্থানের রাজারা তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে পরিগণিত হয়েন। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় রাজা যে ধর্ম্ম অবলম্বন করেন সেই ধর্ম্মেরই শ্রীবৃদ্ধি। রাজদরবারের লোক রাজার অনুগমন করে; ছোট লোকের কোন ধর্ম্মই নাই, তাহারা কিছুই বুঝে না, তাহারাও প্রায় রাজারই পশ্চাদ-গামী হয়। এইরূপ নূতন ধর্ম্ম অবলম্বিত হইলে কেবল প্রাচীন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠিত পুরোহিতগণ রাজার বিরোধী হয়েন। সৌভাগ্যক্রমে মগধ মিথিলা প্রভৃতি প্র-দেশে প্রথম হইতেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ভাল রূপে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। তথাকার পুরোহিতগণ যে কিছু বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল তাহা অনায়াসেই উপশমিত হইল। শেষ অনেক ব্রাহ্মণও বুদ্ধদেবের শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে গণ্য হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের জয় জয়কার হইল।*

---

* অনেকে মনে করেন বুদ্ধদেব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ছিলেন না; তিনিও গৌতমাদির ন্যায় কতকগুলি দার্শনিক মত প্রচার করেন মাত্র। তাঁহার মৃত্যুর দুই তিন

(বৌদ্ধ ধর্ম্মসংক্রান্ত একটি কথা।)

অনেকে মনে করেন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইবামাত্র দেশের সকল লোক তদ্ধর্ম্মাবলম্বী হয়। এই একটি সম্পূর্ণ ভ্রম। অশোক রাজার নিজ অধিকারকালেও সমস্ত মগধ বৌদ্ধ হইয়া ছিল কি না সন্দেহ। কোন স্থান হইতেই ব্রাহ্মণ নির্ম্মূল হয় নাই। তবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরোধী রাজারা উক্ত মত অবলম্বন করায় ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতার অনেক খর্ব্বতা হইয়াছিল। বস্তুতঃ যেমন হিন্দু, মুসলমান তেমনি বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষের সকল দেশে সকল নগরেই বাস করিত। ব্রাহ্মণেরা এখন যেমন চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগকে ঘৃণা করেন,বৌদ্ধদিগকেও সেইরূপ করিতেন, বিশেষের মধ্যে এই চৈতন্য সম্প্রদায় কখনও রাজকীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই, বৌদ্ধেরা তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি যে উপরিউক্ত বিপ্লবের একটী সুধাময় ফল তাহার আর সন্দেহ নাই।

(মগধ সাম্রাজ্যের উৎপত্তি।)

বুদ্ধদেবের সময় সমস্ত ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এমন কি এক মিথিলা ও মগধেই দশ পনর জন রাজার নিকট বুদ্ধদেব আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, শুনা যায়। তার পর দুইশত বৎসরের ইতিহাস জানি না। সেকেন্দরের আক্রমণ কালে শুনিতে পাই, মহানন্দ নামে একজন নন্দবংশীয় ভূপাল প্রাচী রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। দুই শত বৎসরের মধ্যে এরূপ সাম্রাজ্যবৃদ্ধির কারণ কি? পশ্চিমে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তেমনই আছে। সেকেন্দর এক জনের সহিত যুদ্ধ করিলেন, একজনকে জুয়াচুরি করিয়া হাত করিলেন, আর এক জন আপনি শরণাগত হইল। অথচ সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চল এক রাজার অধীন হইয়াছে, ইহার কারণ কি? বোধ হয় পূর্ব্বাঞ্চলের সমস্ত রাজারাই ব্রাহ্মণের বিরোধী ছিলেন। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহাদের সন্ধি হয়; মিল হয়; শেষ দিলসের রাষ্ট্র সমবায়ের* ন্যায় ঐ সন্ধিতে মগধসাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় রাজারা শূদ্র ছিলেন। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের উপর তাঁহাদের যথেষ্ট অত্যাচার ছিল, পুরাণে লিখিত আছে। অথচ তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন না। ইহাতে কি বোধ হয়? পূর্ব্বাঞ্চলের লোক ব্রাহ্মণদিগের বিরোধী হওয়া হেতুকই পরস্পর একতাপাশে বদ্ধ হইবার চেষ্টা করে। রাজকীয় একতার ফল মগধসাম্রাজ্য, আর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় একতার ফল বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

শত বৎসর পরে বৌদ্ধমত ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। এই মত অনেক পরিমাণে সত্য হইবার সম্ভাবনা। কারণ অশোক রাজার পূর্ব্বে আমরা বৌদ্ধদেব কথা বড় একটা শুনিতে পাই না, তাঁহার সময়েই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ক্রিয়া প্রকৃষ্টরূপে আরম্ভ হয়।

* *Delian Confederation.*

(মগধ সাম্রাজ্য হইতে ভারতবর্ষের কি উপকার হইয়াছে।)

মগধসাম্রাজ্য হইতে ভারতবর্ষের দুইটী প্রধান উপকার হইয়াছে। বিদেশীয় হস্তহইতে ভারতের উদ্ধার ও দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার। এতদ্ভিন্ন আরও একটি আছে। সেইটী আমরা প্রথমে বলি। কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন তাঁহাদের মতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য থাকা প্রজাবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দের একমাত্র উপায়। আবার অনেকে আছেন তাঁহাদের মতে বৃহৎ সাম্রাজ্যই উন্নতির হেতু। দুই মতেই আংশিক সত্য উপলব্ধি হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য অসভ্য অবস্থায় ভাল। উহাতে শীঘ্র শীঘ্র সভ্যতা বিস্তার হয়, সাক্ষী গ্রীস্ ও ইতালী। কিন্তু সভ্যতা, উন্নতি একবার বদ্ধমূল হইলে বৃহৎ সাম্রাজ্যই সুবিধা, রোম ও চীন এই দুই সাম্রাজ্যই প্রাচীন সভ্যতা বজায় রাখিয়া তাহার উন্নতি করিয়া গিয়াছে। মগধসাম্রাজ্যের অদৃষ্টে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভ্যরাজ্য করতলস্থ করিয়া মগধের উৎপত্তি। যতদিন মগধের সাম্রাজ্য ছিল ততদিন প্রজাবর্গের সুখ ছিল। মাগধেরা রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করিত, চিকিৎসালয় বিদ্যালয় স্থাপন করিত, বিদ্যার উৎসাহ দিত। মগধের দ্বারা কি উপকার হইয়াছিল, মগধ ধ্বংসের পর ভারতবর্ষের যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা দেখিলেই জানা যাইবে। একজন ইতিহাসবিৎ লিখিয়াছেন পরাক্রান্ত রাজ্য ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইংরেজ রাজত্বে ভারতবর্ষ সুখী, তাহার কারণ ইংরেজ পরাক্রমশালী। মোগলসাম্রাজ্যে যে ভারতের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার কারণ মোগলেরা পরাক্রমশালী ছিল। মগধের রাজ্যে যে ভারতের এত গৌরব হয় তাহারও কারণ মগধ পরাক্রমশালী। বর্ম্মার মগেরা ও সিন্ধুতীরবর্ত্তী হিন্দুরা মগধের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত মগধের হস্তগত ছিল। ইংরেজ, মুসলমান ও মাগধে প্রভেদ এই ইংরেজ ও মুসলমান বিদেশী, মাগধ এ দেশী, এইজন্য আমাদের চক্ষে মগধের এত মান। হিন্দুদিগের সময় মগধের ন্যায় বৃহৎ সাম্রাজ্য আর স্থাপিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। যদিও হইয়া থাকে মগধের ন্যায় ভারতবর্ষের এত উপকার আর কাহার দ্বারাও সাধিত হয় নাই।

(গ্রীক হস্তহইতে ভারত উদ্ধার।)

পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একবার দারা সম্‌তাস্প আর একবার সেকেন্দরের করতলস্থ হইল। সেকেন্দরের ইচ্ছা ছিল সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করেন। পুরুরাজ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও সেকেন্দরের কিছু করিতে পারিলেন না। তখন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে মগধ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সেকেন্দর তাহাতে ভীত হইলেন; তাঁহার সৈন্যদলে প্রভুদ্রোহ ঘটিল, কাজেই সেকেন্দরকে ভারত ছাড়িয়া যাইতে হইল। মগধ গর্জ্জন

করিয়াই ক্ষান্ত রহিল। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই সিলিউকস আবার অসংখ্য গ্রীক্ সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। এবার মগধহইতেই ভারতের উদ্ধার হইল। ইহার পর চারি পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া আর বিদেশীয় আক্রমণ শুনিতে পাওয়া যায় না। যতদিন মগধের এতটুকু বিক্রম ছিল ততদিন কেহ ভারতবর্ষে দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই। সলিমান পর্ব্বতের ও পারে ভীমবলী পারদ রাজ্য ছিল। কই পার দীয়ানরা ত একবারও ভারতবর্ষ আক্রমণ করে নাই, অতএব ভারতবর্ষ যে সিরিয়া ও মিসরের ন্যায় গ্রীকের অধীন হয় নাই এবং প্রায় পনর শত বৎসর ধরিয়া স্বাধীন ছিল,তাহার কারণ পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি বিপ্লব বৌদ্ধধর্ম্ম ও মগধসাম্রাজ্য।

(দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার।)

অশোক রাজা দক্ষিণদেশীয় লোক দিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রথম ধর্ম্মপ্রচারক পাঠান এবং অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হয়েন। তাহার দেখাদেখি ব্রাহ্মণেরাও দাক্ষিণাত্যে স্বধর্ম্ম-বিস্তারের চেষ্টা পান। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতাই অধিক হয়, তাহার কারণ বৌদ্ধেরা ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইত,সেই সঙ্গে২ সাম্রাজ্য স্থাপনেরও চেষ্টা পাইত। শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মচর্য্যাশ্রম ফুরাইতে না ফুরাইতে যতি হইলেন। এইরূপ ধর্ম্মভাবের আধিক্য দেশের মঙ্গলকর হয় না।

(মঠের সৃষ্টি।)

মঠের সৃষ্টি বিপ্লবের একটী কুফল। বৌদ্ধেরা সর্ব্ব প্রথমে মঠের সৃষ্টি করেন। বুদ্ধের সখা পাটলীপুত্ররাজ স্বীয় রাজধানীতে প্রথম মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মঠের ইতিহাস পরে বর্ণনীয়।

(উপরি উল্লিখিত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তার্থ।)

আমরা বিপ্লবের ফলাফল বর্ণনা করিতে করিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি। বুদ্ধিবিপ্লবের শেষদশায় দেশের কি ভাব হইয়াছিল, এক্ষণে সেই বিষয়ের কয়েকটী কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইব। বুদ্ধিবিপ্লবের শেষদশায় দেখা গেল সমাজ পূর্ব্ব অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া দুইটী পরিষ্কৃত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বদিক্ ব্রাহ্মণবিরোধী অনার্য্যপ্রধান। পশ্চিমদিক্ আর্য্যপ্রধান, ব্রাহ্মণশাসিত। ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রাচীন অত্যাচার ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের বেদ আজিও গুপ্ত পুস্তক আছে, সাধারণের জন্য এক সেট্ নূতন স্মৃতি-পুস্তক হইয়াছে। স্মৃতি প্রায় বেদের তরজমা মাত্র, ভাষা নূতন। স্মৃতির ভাষা আর বুদ্ধগ্রন্থের ভাষা প্রায়ই এক, কেবল স্মৃতিতে বৈদিক প্রয়োগ অধিক, বৌদ্ধ-গ্রন্থে অবৈয়াকরণ প্রয়োগ অধিক; দেশীয় চলিতভাষার উদ্ধৃত কথা অধিক। ব্রাহ্মণ-বিরোধিগণের মধ্যে একজন দলপতি পাইলেন,তাঁহার নামে তাঁহাদের নাম হইল; ব্রাহ্মণেরা আপন ধর্ম্ম কাহাকেও দিতেন না, উহারা সকলকেই সমানরূপে স্বধর্ম্ম দান করিত। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেকে একারণ পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিল; ব্রাহ্মণ-

বিরোধিগণ আবালবৃদ্ধবণিতা একদল হইল, ইহাদের রাজ্যশাসন ক্ষমতা অধিক হইল, ইহারা ব্রাহ্মণদিগের দেশেও আধিপত্য বিস্তার করিল। ব্রাহ্মণেরা অনেকে পলাইয়া দক্ষিণাপথে জঙ্গল আশ্রয় করিলেন, অনেকে কথঞ্চিৎ স্বধর্ম্ম লইয়া দেশে বসিলেন। বন্য জাতীয়দিগকে ক্ষত্রিয়ত্ব দিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মের সহিত আপনার ধর্ম্ম মিশাইয়া আর এক নূতন আধিপত্যের, নূতন সভ্যতার, এবং নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। মালব গুজরাটের পূর্ব্বাংশে, রাজবারার দক্ষিণাংশে পুরাণাদির উৎপত্তি, নাগকুল অগ্নিকুলের উৎপত্তি, ও পৌরাণিকতা ও বর্ত্তমান সভ্যতার উৎপত্তি। ব্রাহ্মণদিগের দীক্ষিত করিবার প্রণালী অতি চমৎকার। আমরা জানি হিন্দুধর্ম্মে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু কাম্বেল সাহেব বলেন হিন্দুরা সাঁওতাল পরগণায় গ্রামকে গ্রাম হিন্দু করিয়া লইতেছে। একজন ব্রাহ্মণ একটি গ্রামে গেল; সেখানে পূজা অর্চ্চনা আরম্ভ করিল; সাঁওতালেরা তাহার কাছে পীড়ার ঔষধ প্রভৃতি লইতে আসিল, ক্রমে কালী পূজা করিতে শিখিল; রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শুনিল; তাহারা হিন্দু হইল। পাদরীরা তাহাদের আর কিছুই করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ সাঁওতালের ব্রাহ্মণ বলিয়া নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত হইল। দাক্ষিণাত্যে প্রায় এইরূপই ঘটিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে শূদ্র ও অন্ত্যজ লোকই অধিক। এইরূপে ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে দক্ষিণাত্যে আর্য্য আধিপত্য বিস্তার হইল।

(বিপ্লবের কুফল।)

বিপ্লবের কুফল হিন্দুচরিত্রে বৈরাগ্যের আধিক্য। ঐহিক বিষয়ে ইঁহাদের তাদৃশ মনোযোগ নাই। এ জগত ত মায়া, ভ্রম; যাহা উৎকৃষ্ট তাহা এজন্মের পর; সুতরাং এজন্মের কাজে তত মনোযোগ দেওয়া উচিত নহে। সকলেই পরকালের জন্য অধিক চিন্তিত। কেহ প্রমাণ প্রমেয়াদির তত্ত্বজ্ঞানে নিঃশ্রেয়সাধিগমের চেষ্টা করিতেছেন, কেহ প্রকৃতি পুরুষের সূক্ষ্মতম বিবেকখ্যাতি নামক ভেদ নিরূপণ করিয়া দুঃখত্রয়াভিঘাতের চেষ্টায় ফিরিতেছেন, কেহ জড়জগৎকে অবিদ্যাবিরচিত মনে করিয়া ব্রহ্ম ও আমি এক এই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতেছেন, কেহ বীরাসনে উপবেশন করিয়া প্রাণবায়ুতে অপান বায়ু রোধ করত আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। ঐহিকের উপর বিষয়ী লোকেরও বাসনা অল্প। বৌদ্ধদিগের ত ভিক্ষুনামে একদল লোক শুদ্ধ পারত্রিক চিন্তার জন্য স্বতন্ত্র থাকিত। বিপ্লবের পূর্ব্বে ঐহিক পারত্রিক প্রায় সমান ছিল, ব্রাহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমের পর লোকে পারত্রিক চিন্তায় ব্যস্ত হইত। বিপ্লবের পর সকলেই যতি। যিনি ব্রহ্মচারী তিনিও যতি, যিনি গৃহস্থ তিনিও যতি। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল তিন আশ্রম না কাটাইয়া যতি হইতে পারিবেন না। শেষ দেখি বৌদ্ধেরা বঙ্গসাগরতীরবর্ত্তী

উড়িষ্যা, কলিঙ্গ, কর্ণাট, সিংহলের অনার্য্যদিগকে বৌদ্ধ করিলেন, ব্রাহ্মণেরা মালবকেন্দ্র হইতে দক্ষিণে মহারাষ্ট্র দ্রাবিড় কেবল, পৌরাণিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।* এই ভাবে ভারতবর্ষ রহিল। ইহার পর হইতে দ্বিতীয় বিপ্লবের সূত্রপাত পরে বর্ণনীয়। পঞ্জাবের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নূতন আর্য্যগণ আসিয়া মিলিতে লাগিল; হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণেরা উহাদিগকে বড় ঘৃণা করিত। অনার্য্যগণ একেবারে বৌদ্ধ হইল না। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাংশে আজিও অনার্য্যধর্ম্ম প্রচলিত আছে। যে সকল জাতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নহে অথচ ব্রাহ্মণ পুরোহিত মানে না, তাহারাই অনার্য্যধর্ম্মাবলম্বী। যেমন আমাদের দেশে ডোম, পোদ ইত্যাদি। ত্রিপুরায় ব্রাহ্মণপুরোহিত আছে, তথাপি ত্রিপুরা-পুরোহিতদিগের প্রভুত্ব আজিও কমে নাই। প্রতি বৎসর কয়েকদিন ধরিয়া উহাদের প্রতাপে কাহারও বাহির হইবার যো থাকে না। একবার রাজা বাহির হইয়াছিলেন। বিচারে তিনি দণ্ডনীয় হন। এইরূপে বুদ্ধিবিপ্লবের শেষ অবস্থায় তিন ধর্ম্মাবলম্বী লোক দৃষ্ট হইল, অনার্য্য, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ। বৌদ্ধদিগের নূতন ধর্ম্ম, তাহাদের ঐক্য অধিক, তাহাদিগের ক্ষমতা অধিক। ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম। অনার্য্য প্রায়ই পর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছে।

শৈশবসহচরী।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ধনেই কি সুখ?

ইহার পর, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিল। রজনীর কাছে, কুমুদিনীর কথা বেদবাক্য। শরতের বিষয়, শরৎকে দিয়া, রজনীকান্তের সেই জীবনের আশ্রয়স্থল, মনোরম অট্টালিকাও শরৎকে দিলেন। আপনি গ্রামপ্রান্তে এক ক্ষুদ্র মৃণ্ময়গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কাহারও সঙ্গে দেখা করেন না। তাঁহাকে সর্ব্বদা অপ্রসন্ন দেখিয়া, কেহও তাঁহার সঙ্গে দেখা করে না। রজনীর ইচ্ছা নাই দেশে আর বাস করেন। একটি উদ্দেশ্য ছিল—শরৎকুমারের সঙ্গে কুমুদিনীর বিবাহ দেখিবেন। দেখিয়া, দেশ পরিত্যাগ করিবেন। যথাসাধ্য মাতৃকৃত্য সমাপন করিয়াছিলেন।

এদিকে শরৎকুমারের সঙ্গে কুমুদিনীর

* দক্ষিণেও ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সকল দেশেই ছিল। যে মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণক্ষমতা অধিক সেই স্থানেই ইলোরের মন্দির আছে।

বিবাহের দিনস্থির করিবার জন্য শরৎকুমার কুমুদিনীর পিতার কাছে উপস্থিত হইয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। হরিনাথ বাবু বলিলেন, "আমার কন্যা বয়ঃস্থা। তাহার অনভিমতে আমি তাহার বিবাহ দিব না। তুমি তাহার মন জানিয়াছ?"

শ। এক প্রকার।

হ। সম্মত?

শ। বোধ হয়।

হ। তবে তুমি গিয়া আবার তাহার সম্মতি লইয়া আইস। বলিয়া আইস, যে এই মাসে বিবাহ হয়, তোমার এমন ইচ্ছা। কি বলে আমাকে বলিয়া যাইও।

শরৎকুমার অন্তঃপুরে কুমুদিনীর কাছে গেলেন—আত্মীয় স্থলে শরৎকুমারের অবারিত দ্বার—বিশেষ হরিনাথ বাবুর সাহেবি মেজাজ। হরিনাথ বাবুও সেই কথা মনে২ ভাবিতেছিলেন—মনে২ বলিতেছিলেন, "বড় ভাল লক্ষণ দেখিতেছি। দেখ, আমার বাড়ীতে বিলেতি কোর্টসিপ। আমরা সাহেব হইয়া উঠিতেছি। আমাদের দেশের জন্য ভরসা আছে।"

শরৎকুমার গিয়া দেখিলেন, কুমুদিনী একটা নেঙটা ছেলের ঘাড় ধরিয়া ভাত গিলাইয়া দিতেছে। ঠিক বিলাতি মিসের চরমোৎকর্ষ বলিয়া তাঁহার বোধ হইল না। যাহাই হউক, সকল সময়ে কুমুদিনী তাঁহার কাছে সুন্দরী,সকল সময়েই তাঁহার আরাধনীয়া। তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমে কুমুদিনীর অধরপ্রান্তে—অধরপ্রান্তে কি কোথায় তাহা ঠিক বলিতে পারি না হাসির একটু লক্ষণ দেখা দিল। তখনই তাহা মিলাইয়া গেল। তখনই আবার তাহার মুখ গম্ভীরকান্তি ধারণ করিল। শরৎকে দেখিয়া কুমুদিনী হাত ধুইয়া উঠিলেন। বলিলেন,

"আমায় কি খুঁজিতেছ?"

শ। হাঁ, তোমাকেই।

কুমুদিনী তখন অন্তরালে দাঁড়াইলেন। শরৎকুমার সেইখানে আসিলেন। কুমুদিনী বলিলেন,

"কেন?"

শ। আমার সুখের দিন কবে হইবে?

কু। সে আবার কি?

শ। আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।

কুমুদিনী মুখ একটু অবনত করিলেন। একটু ব্রীড়াবিকম্পিত স্বরে বলিলেন,

"কাহাকে?"

শ। কাহাকে আবার? যে আমাকে কামিনী কুঞ্জবনে বাঁচিতে হুকুম দিয়াছিল, তাহাকেই।

কুমুদিনীর মুখকান্তি, অতিশয় গম্ভীর, স্থির,চিন্তাযুক্ত হইল। কুমুদিনী বলিলেন,

"তুমি বোধ হয়, আমারই কথা বলিতেছ। তোমায় বাঁচিতে না বলিবে, এমন পামরী পামর জগতে কি আছে? যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে—সেই কি—"

কুমুদিনীর মুখে আর কথা সরিল না।

মুখ অবনত করিয়া রহিলেন। হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে কোর্টসিপ কি চলে গা ?

শ। কি, সেই কি, কুমুদিনি ?

কুমুদিনী ঢোক গিলিয়া, ঘামিয়া, মুখ লাল করিয়া, হাঁপাইয়া, বলিলেন,

"তাকেই কি বিবাহ করিতে চাহিবে ?"

শরৎকুমারের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শরৎকুমার বলিলেন,

"এ কি তামাসা কুমুদিনি ?"

"তামাসা কি ?"

শ। আমায় রক্ষা কর।

কু। কি প্রকারে ?

শ। আমায় বিবাহ কর।

কুমুদিনী আবার ঢোক গিলিতে আরম্ভ করিলেন—আবার ঘামিতে আরম্ভ করিলেন। অতিকষ্টে, ঘাড় হেঁট করিয়া বলিলেন, "বিধবার কি আর বিয়ে হয় ?"

তখন শরৎকুমার বহুবিধ তর্কবিতর্ক করিয়া কুমুদিনীকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন, যে বিধবার বিবাহ অশাস্ত্রীয় বা ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে। কুমুদিনী বলিলেন,

"আমি মেয়ে মানুষ অত বুঝি না। আমাকে অত বুঝাইও না।"

শরৎকুমার হতাশ হইয়া বলিলেন, "কুমুদিনি! তুমি ত তোমার পিতার কাছে স্বীকার করিয়াছ যে আবার বিবাহ করিবে।"

কুমুদিনীর রাগ হইল। সে বাবার কাছে যাই স্বীকার করুক না, সে জোরে জোর করিবার শরৎকুমার কে ? সে ত আজও স্বামী হয় নাই। রাগের সময় লজ্জা একটু খাট হয়—কুমুদিনী লজ্জা একটু খাট করিয়া কষ্টভাবে বলিলেন,

"আমি বাপের কাছে এমন স্বীকার করি নাই, যে তোমাকে বিবাহ করিব।"

শরৎকুমার অপ্রতিভ এবং ব্যথিত হইলেন। বলিলেন,

"কুমুদিনি, তুমি আমাকে একদিন আশা দিয়াছিলে ?"

কু। যদিই দিয়া থাকি ?

যদিই দিয়া থাকি ? কি নিষ্ঠুর কথা। শরৎকুমার বলিলেন, "এ কি কুমুদিনি! তুমি থাক বলিয়াছিলে বলিয়াই আমি সংসারে আছি।"

কুমুদিনী ভাবিলেন, "শরৎকুমারের কি অন্যায়। আমি কি ইহাকে ইতিমধ্যে জীবনসর্ব্বস্ব লেখা পড়া করিয়া দিয়াছি। যাহা হোক ইহাকে অনর্থক মানসিক কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। লজ্জা ত্যাগ করিয়া স্পষ্ট কথা বলাই আমার ধর্ম্ম।" তখন কুমুদিনী বলিলেন,

"আমি কি বলিয়াছি না বলিয়াছি, তাহা ঠিক স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। যদি তোমার কাছে আমি আত্ম-সমর্পণে স্বীকৃত হইয়া থাকি—তবে সে অঙ্গীকার বিস্মৃত হও।"

শ। কেন, কুমুদিনি ? কেন, আমাকে প্রাণে মারিবে ?

কু। যখন তুমি নির্দ্ধন ছিলে, তখন তোমাকে বিবাহ করিতে পারিতাম। এখন তুমি ধনী—এখন তোমায় আমায় বিবাহ হইলে লোকে বলিবে কি জান ?

লোকে বলিবে হবিনাথ বাবু কেবল ধনেব গৌরবে অন্ধ হইযা, জাতিত্যাগ করিয়া বিধবা কন্যাব বিবাহ দিল। আমি যদি পিতার অনুবোধে কখন বিবাহ কবি—তবে দবিদ্রকে। ধনীকে আমি বিবাহ কৰিব না।

শবৎ বালকেব ন্যায কাঁদিয়া বলিলেন, "দবিদ্রকে বিযে করিবে, কুমুদিনি। বুঝিযাছি,তুমি বজনীকে বিবাহ কবিবে।" শবৎকুমাব ক্রোধে,অভিমানে,এবং দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুতগমনে বাহিরে গমন কবিলেন।

কুমুদিনী কিছু অপ্রতিভ, কিছু দুঃখিত কিছু কষ্ট হইয়া,অন্যমনে ভাবিতে লাগিলেন। কুমুদিনী ভাবিতেছিলেন, "শবৎকুমাবেব অন্য যে গুণ থাকুক,শবৎকুমাব বালকস্বভাব বটে। আমাব মনে বিশ্বাস ছিল, শবৎকুমার আমাব স্বামী হইলে, আমি সুখী হইব। এখন আমাব সন্দেহ সম্পূর্ণ। বজনী?—আব যাহাই হউক, বজনীকান্ত বালকস্বভাব নহে। হৌক বা না হৌক—বজনীকান্ত দরিদ্র। আমার স্বর্গের স্বামী, আজি আমাব কথাব উপর নির্ভর কবিয়াই এ দারিদ্র্য স্বীকার কবিয়াছে। আমি,তাহাব ঐশ্বর্য্য শরৎকে দিয়া, যদি এখন শবৎকে বিবাহ কবি—সেই ঐশ্বর্য্যের আপনি অধিকারিণী হইয়া বসি—তবে রজনী কি মনে করিবে? ছি! ছি! শরৎকুমারকে কখনই বিবাহ করা হইবে না।"

কে যেন কুমুদিনীর মনকে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কাহাকে বিবাহ করিবে? তুমি যে বাপেব কাছে স্বীকার করিয়াছ বিবাহ করিবে।" কুমুদিনীর মন উত্তর কবিল, "কাহাকে বিবাহ করিব? কি জানি কাহাকে?"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

কিছুতেই সুখ নাই।

ফাল্গুন মাস প্রায অবসান হইয়াছে। অদ্য দোলপূর্ণিমাব রাত্রি, নীল নভোমণ্ডলে অসংখ্য তারাগণবেষ্টিত নব বসন্তেব পূর্ণচন্দ্র বিবাজ কবিতেছে। তন্নিম্নে পাপিয়াব আকাশব্যাপী ঝঙ্কার পৃথিবীতে বসন্তসমাগম প্রচার করিতেছে। তন্নিম্নে অর্থাৎ সুবর্ণপুবের রাজপথে, ঘাটে, নদীকূলে, দেবমন্দিরে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকবালিকাদিগের আনন্দসূচক ধ্বনিতে বুঝা যাইতেছে যে, অদ্য রাত্রে সুবর্ণপুবে কোন আনন্দজনক কার্য্য আছে। নবপ্রস্ফুটিত মাধবীলতা সঞ্চালিত কবিয়া, নব বসন্তপবন গৃহস্থ কুলকামিনীদিগেব অল্প অল্প স্বেদবিজড়িত অলকদাম চঞ্চল করিতেছিল। যুবতীদিগেৰ এত দিন দুরন্ত শীতের দৌরাত্ম্যে দিবারাত্র কুঞ্চিত হইয়া থাকিতে হইত, বাত্রে গৃহের বাহিবে আসিতে হইলে, কুণ্ঠিত,কুঞ্চিত ভাবে এবং শীতবসনে আবণ্য আবৃত করিয়া আসিতে হইত, কিন্তু আজ এই মধুমাসের মধুর জ্যোৎস্নালোকে প্রাসাদোপরি পদপ্রসারণ করিয়া বসিয়া

ঈষৎ অলসাবেশে মস্তকের এবং শরীরের কিয়দংশ স্খলিতবসন করিয়া কতিপয় সুন্দরী লাবণ্য বিকীর্ণ করিতেছিল। দুশ্চরিত্র পাপিয়ার আর স্থান নাই; এই প্রাসাদ বেড়িয়া বেড়িয়া তাহার সেই আকাশভেদী কখন কখন হৃদয়ভেদী চীৎকার করিতে ছিল। প্রাসাদ হইতে জ্যোৎস্নাময়ী জাহ্নবী দূরে ধূমপ্রান্তে মিশাইতেছে, তাহা লক্ষ্য হইতে ছিল, এবং সন্নিকটে একটি বৃহৎ শ্বেত অট্টালিকার শ্রেণী চন্দ্রালোকে চিত্রপটে চিত্রিতবৎ দেখাইতে ছিল। তাহার বাঁতায়ন পথ দিয়া শত শত দীপমালা দেখা যাইতে ছিল, এবং ঐ অট্টালিকাশ্রেণী হইতে কখন কখন মধুর সঙ্গীত এবং কখন কখন উচ্চ হাসি শুনা যাইতে ছিল। যুবতীগণ প্রাসাদোপরি বসিয়া সেই বৃহৎ অট্টালিকাশ্রেণীর প্রতি চাহিয়া সেই মধুর সঙ্গীত শুনিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণের জন্য সঙ্গীত বন্ধ হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই নির্লজ্জ পাপিয়া আবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। যুবতীদিগের মধ্যে একটি পঞ্চদশ বর্ষীয়া সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল,"দিদি পাখীটে অমন করে একশবার ডাক্‌চে কেন্?" যুবতীগণ সকলেই হাসিয়া উঠিল। সকলের বয়োজ্যেষ্ঠা চন্দ্রমুখী নাম্নী এক জন বলিল, "বিনোদিনি, তোমাকে দেখে ও চাঁদকে দেখে,'পাখীর বড় আমোদ হয়েছে, তাই এত ডাকছে।"

বিনোদিনী লজ্জায় মস্তক নত করিয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না। অট্টালিকাশ্রেণি হইতে পুনবায় সঙ্গীতধ্বনি হইতে লাগিল। যুবতীগণ নিস্তব্ধে শুনিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর চন্দ্রমুখী বলিল " কি অদৃষ্ট।"

বামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল "কার?"

চন্দ্র। শরৎ কুমার কাল কি ছিল আর আজ কি হলো!

বামা। অদৃষ্ট বুঝা যাইত, যদি রজনী কাঁচা ছেলে না হত—এক কথায় বিষয় ছেড়ে দিলে, বল কি!

চন্দ্র। দেবে না কেন, যার বিষয় তাকে দিয়াছে।

বামা। কে বলিল শরতের বিষয়?

চন্দ্র। রজনীর মা মৃত্যুশয্যায় বলিয়া গিয়াছে।

বামা। আমি নিশ্চয় জানি রজনীর মার সহিত রজনীর সাক্ষাৎ হয় নাই। যে ব্যক্তি তাহার মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত ছিল তাহারই নিকট তাহার মা এ কথা বলিয়াছিল। রজনী তাহারি নিকট শুনিয়া বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছে।

চন্দ্র। তা কি মানুষে পারে? যে ব্যক্তির নিকট শুনিয়া রজনী বিষয় ছাড়িয়াছে, সে যদি দেবতা হয় তা হলেই ইহা সম্ভব।

বামা। কে জানে ভাই, সে মানুষ কি দেবতা, আমাদের সে কথায় কাজ নাই। কিন্তু রজনী কি অদৃষ্ট করিয়াছে—আজ আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য পরকে দিয়া আপনার একখানি বাতাসার সঙ্গতি রাখে নাই।

যেমন তারাগণবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করে, সেইরূপ রমণীদিগের মধ্যে একটি যুবতী বসিয়া অনন্যমনে এই কথোপকথন শুনিতেছিল। সে কুমুদিনী। কুমুদিনী বামাসুন্দরীব এই শেষ উক্তি শুনিয়া অতি মৃদু অথচ ব্যগ্রতাব্যঞ্জক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"রজনীকান্তের কি জ্বর হইয়াছে?"

বামা। আজ তিন দিন জ্বর হইয়াছে।

কুমু। খুব জ্বর হইয়াছে কি?

বামা। তা জানি না। রামের মা বলিতেছিল আজ তিন দিন আপন হাতে বেঁধে বড় জ্বর হইয়াছে। অঘোর হইয়া রহিয়াছে; একটু জল দিবার লোক নাই, একখানি বাতাসাব সঙ্গতি নাই।

বয়ঃকনিষ্ঠা সরল হৃদয়া—বিনোদিনী কাঁদিয়া উঠিল। কুমুদিনীকে বলিল, "বড় দিদি রজনী আমাদের ভগিনীপতি—আমাদের বাড়ীতে আনাও না কেন? আমরা সেবা করিব।" কুমুদিনী বলিল "আমাদের বাড়ী আসিবেন না—আমার সেবা লইবেন না।"

বিনোদিনী। কেন?

কুমুদিনী। কেন তা জানি না। বলিয়া কুমুদিনী অন্যমনস্কা হইয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিল; তাহার পিতৃব্যকন্যা সবলা বিনোদিনী সেইস্থান হইতে দ্রুতপদে উঠিয়া গিয়া তাহার পিতৃব্যের নিকট কি বলিতে লাগিল। এবং তৎক্ষণাৎ একটি পরিচারিকা সমভিব্যাহারে খড়কির দ্বার খুলিয়া কোথায় গমন করিল।

বাহুবল ও বাক্যবল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সামাজিক দুঃখ।

সামাজিক দুঃখ নিবারণের জন্য দুইটি উপায় মাত্র ইতিহাসে পরিকীর্ত্তিত—বাহুবল ও বাক্যবল। এই দুই বল সম্বন্ধে, আমার যাহা বলিবার আছে—তাহা বলিবার পূর্ব্বে সামাজিক দুঃখের উৎপত্তিসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

মনুষ্যের দুঃখের কারণ তিনটি। (১) কতকগুলি দুঃখ, জড়পদার্থের দোষগুণঘটিত। বাহ্য জগৎ কতকগুলি নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছে; কতকগুলি শক্তিকর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে। মনুষ্যও বাহ্য জগতের অংশ; সুতরাং মনুষ্যও সেই সকল নিয়মাধীন, মনুষ্যও সেই সকল শক্তিকর্ত্তৃক শাসিত। নৈসর্গিক নিয়ম সকল উল্লঙ্ঘন করিলে, রোগাদিতে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইতে হয়, এবং নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক দুঃখভোগ করিতে হয়।

(২) বাহ্য জগতের ন্যায়, অন্তর্জগৎও আরও একটি মনুষ্যদুঃখের কারণ। কেহ পরশ্রী দেখিয়া সুখী, কেহ পরশ্রীতে দুঃখী। কেহ ইন্দ্রিয়সংযমে সুখী, কাহারও পক্ষে ইন্দ্রিয়সংযম ঘোরতর দুঃখ। পৃথিবীর কাব্যগ্রন্থ সকলের, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দুঃখই আধার।

(৩) মনুষ্যদুঃখের তৃতীয় মূল, সমাজ। মনুষ্য সুখী হইবার জন্য, সমাজবদ্ধ হয়; পরস্পরের সহায়তায়, পরস্পরে অধিকতর সুখী হইবে বলিয়া, সকলে মিলিত হইয়া বাস করে। ইহাতে বিশেষ উন্নতি-সাধন হয় বটে, কিন্তু অনেক অমঙ্গলও ঘটে। সামাজিক দুঃখ আছে। দারিদ্র-দুঃখ, সামাজিক দুঃখ। যেখানে সমাজ নাই, সেখানে দারিদ্র নাই। হিন্দুবিধবার যে দুঃখ, সে সামাজিক দুঃখ।

কতকগুলি সামাজিক দুঃখ, সমাজ সংস্থাপনেরই ফল— যথা দারিদ্র। যেমন আলো হইলে, ছায়া তাহার আনুষঙ্গিক ফল আছেই আছে—তেমনি সমাজবদ্ধ হইলেই, দারিদ্রাদি কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছেই আছে।* এসকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ কখন সম্ভবে না। কিন্তু আর কতকগুলি, সামাজিক দুঃখ আছে, তাহা সমাজের নিত্য ফল নহে; তাহা নিবার্য্য এবং তাহার উচ্ছেদ সামাজিক উন্নতির প্রধান অংশ। সামাজিক মনুষ্য সেই সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদজন্য, বহুকালহইতে চেষ্টিত। সেই চেষ্টার ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান অংশ, এবং সমাজনীতি ও রাজনীতি এই দুইটি শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই দ্বিবিধ সামাজিক দুঃখ, আমি কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। স্বাধীনতার হানি, একটী দুঃখ সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজে বাস করিলে অবশ্যই স্বাধীনতার ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। যতগুলি মনুষ্য সমাজসম্ভুক্ত, আমি, সমাজে বাস করিয়া, ততগুলি মনুষ্যেরই কিয়দংশে অধীন—এবং সমাজের কর্ত্তৃগণের বিশেষ প্রকারে অধীন। অতএব স্বাধীনতার হানি একটী সামাজিক নিত্য দুঃখ।

স্বানুবর্ত্তিতা, একটী পরম সুখ। স্বানুবর্ত্তিতার ক্ষতি পরম দুঃখ। জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার স্ফূর্ত্তিতেই আমাদের মানসিক ও শারীরিক সুখ। যদি আমাকে চক্ষু দিয়া থাকেন, তবে যাহা কিছু দেখিবার আছে, তাহা দেখিয়াই আমার চাক্ষুষ সুখ। চক্ষু পাইয়া যদি আমি চক্ষু চিরমুদিত রাখি-

---

* আলোকছায়ার উপমাটি সম্পূর্ণ ও শুদ্ধ। ইহা সত্য যে এমত জগৎ আমরা মনোমধ্যে কল্পনা করিতে পারি, যে সে জগতে আলোকদায়ী সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নাই—সুতরাং আলোক আছে, ছায়া নাই। তেমনি আমরা এমন সমাজ মনে মনে কল্পনা করিতে পারি, যে তাহাতে সুখ আছে দুঃখ নাই। কিন্তু এই জগৎ আর এই সমাজ কেবল মনঃকল্পিত, অস্তিত্ব শূন্য।

লাম—তবে চক্ষু সম্বন্ধে আমি চিরদুঃখী। যদি আমি কখন কখন বা কোন কোন বস্তু সম্বন্ধে চক্ষু মুদিত করিতে বাধ্য হইলাম—দৃশ্য বস্তু দেখিতে পাইলাম না—তবে আমি কিয়দংশে চক্ষুসম্বন্ধে দুঃখী। আমি বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়াছি—বুদ্ধির স্ফূর্ত্তিই আমার সুখ। যদি আমি বুদ্ধির মার্জ্জনে ও স্বেচ্ছামত পরিচালনে চিরনিষিদ্ধ হই, তবে বুদ্ধিসম্বন্ধে আমি চিরদুঃখী। যদি বুদ্ধির পরিচালনে আমি কোন দিকে নিষিদ্ধ হই, তবে আমি সেই পরিমাণে বুদ্ধিসম্বন্ধে দুঃখী। সমাজে থাকিলে আমি সকল দৃশ্য বস্তু দেখিতে পাই না—সকল দিকে বুদ্ধি পরিচালনা করিতে পাই না। মনুষ্য কাটিয়া বিজ্ঞান শিখিতে পাই না—অথবা রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দিদৃক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে পারি না। এ গুলি সমাজের মঙ্গলকর হইলেও, স্বানুবর্ত্তিতার নিষেধক বটে। অতএব এ গুলি সামাজিক নিত্য দুঃখ।

দারিদ্রের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অসামাজিক অবস্থায় কেহই দরিদ্র নহে—বনের ফল মূল, বনের পশু, সকলেরই প্রাপ্য, নদীর জল, বৃক্ষের ছায়া সকলেরই ভোগ্য। আহার্য্য, পেয়, আশ্রয় শরীরধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার অধিক কেহ কামনা করে না, কেহ আবশ্যকীয় বিবেচনা করে না; কেহ সংগ্রহ করে না। অতএব একের অপেক্ষা অন্যে ধনী নহে, একের অপেক্ষা অন্যে কাজে কাজেই দরিদ্র নহে। কাজে কাজেই অসামাজিক অবস্থা দারিদ্রশূন্য। দারিদ্র তারতম্যঘটিত কথা; সে তারতম্য সামাজিকতার নিত্য ফল। দারিদ্র সামাজিকতার নিত্য কুফল।

সামাজিকতার এই এক জাতীয় ফল। যত দিন মনুষ্য সমাজবদ্ধ থাকিবে, তত দিন এ সকল ফল নিবার্য্য নহে। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, তাহা অনিত্য এবং নিবার্য্য। হিন্দুবিধবাগণ যে বিবাহ করিতে পারে না, ইহা সামাজিক কুপ্রথা, সামাজিক দুঃখ—নৈসর্গিক নহে। সমাজের গতি ফিরিলেই এ দুঃখ নিবারিত হইতে পারে। হিন্দুসমাজ ভিন্ন অন্য সমাজে এ দুঃখ নাই। স্ত্রীগণ যে সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না, ইহা বিলাতী সমাজের একটি সামাজিক দুঃখ; ব্যবস্থাপক সমাজের লেখনীনির্গত এক ছত্রে ইহা নিবার্য্য, অনেক সমাজে এ দুঃখ নাই। ভারতবর্ষীয়েরা যে স্বদেশে উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে না, ইহা আর একটি নিবার্য্য সামাজিক দুঃখের উদাহরণ।

যে সকল সামাজিক দুঃখ নিত্য ও অনিবার্য্য, তাহারও উচ্ছেদের জন্য মনুষ্য যত্নবান্ হইয়া থাকে। সামাজিক দরিদ্রতা নিবারণ জন্য, যাহারা চেষ্টিত, ইউরোপে সশিয়ালিষ্ট কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি নামে তাহারা খ্যাত। স্বানুবর্ত্তিতার সঙ্গে সমাজের যে বিরোধ, তাহার লাঘব জন্য, মিল "Liberty" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ

প্রচার করিয়াছেন—অনেকের কাছে এই গ্রন্থ দৈবপ্রসাদ বাক্যস্বরূপ গণ্য। যাহা অনিবার্য্য, তাহার নিবারণ সম্ভবে না; কিন্তু অনিবার্য্য দুঃখও মাত্রায় কমান যাইতে পারে। যে রোগ সাংঘাতিক, তাহারও চিকিৎসা আছে—যন্ত্রণা কমান যাইতে পারে। সুতরাং যাঁহারা সামাজিক নিত্য দুঃখ নিবারণের চেষ্টায় ব্যস্ত, তাঁহাদিগকে বৃথা পরিশ্রমে রত মনে করা যাইতে পারে না।

নিত্য এবং অপরিহার্য্য সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ সম্ভবে না, কিন্তু অপর সামাজিক দুঃখগুলির উচ্ছেদ সম্ভব, এবং মনুষ্যসাধ্য। সেই সকল দুঃখ নিবারণ জন্য মনুষ্যসমাজ সর্ব্বদাই ব্যস্ত। মনুষ্যের ইতিহাস সেই ব্যস্ততার ইতিহাস।

বলা হইয়াছে, সামাজিক নিত্য দুঃখ সকল, সমাজ সংস্থাপনেরই অপরিহার্য্য ফল—সমাজ হইয়াছে বলিয়াই সে গুলি হইয়াছে। কিন্তু অপর সামাজিক দুঃখ গুলি কোথা হইতে আইসে? সে গুলি সমাজের অপরিহার্য্য ফল না হইয়াও কেন ঘটে? তাহার নিবারণ পক্ষে, এই প্রশ্নের মীমাংসা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এ গুলি সামাজিক অত্যাচারজনিত।

বোধ হয়, প্রথমে অত্যাচার কথাটি বুঝাইতে হইবে—নহিলে অনেকে বলিতে পারিবেন সমাজের আবার অত্যাচার কি। শক্তির অবিহিত প্রয়োগকে অত্যাচার বলি। দেখ মাধ্যাকর্ষণাদি যে সকল নৈসর্গিক শক্তি, তাহা এক নিয়মে চলিতেছে: তাহার কখন আধিক্য নাই, কখন অল্পতা নাই, বিধিবদ্ধ অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মে তাহা চলিতেছে। কিন্তু যে সকল শক্তি মনুষ্যের হস্তে, তাহার এরূপ স্থিরতা নাই। মনুষ্যের হস্তে শক্তি থাকিলেই, তাহার প্রয়োগ বিহিত হইতে পারে, এবং অবিহিতও হইতে পারে। যে পরিমাণে শক্তির প্রয়োগ হইলে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হইবে, অথচ কাহারও কোন অনিষ্ট হইবে না, তাহাই বিহিত প্রয়োগ। তাহার অতিরিক্ত প্রয়োগ অবিহিত প্রয়োগ। বারুদের যে শক্তি, তাহার বিহিত প্রয়োগে শত্রুবধ হয়, অবিহিত প্রয়োগে কামান ফাটিয়া যায়। শক্তির এই অতিরিক্ত প্রয়োগই অত্যাচার।

মনুষ্য শক্তির আধার। সমাজ মনুষ্যের সমবায়, সুতরাং সমাজও শক্তির আধার। সে শক্তির বিহিত প্রয়োগে মনুষ্যের মঙ্গল—দৈনন্দিন সামাজিক উন্নতি। অবিহিত প্রয়োগে, সামাজিক দুঃখ। সামাজিক শক্তির সেই অবিহিত প্রয়োগ, সামাজিক অত্যাচার।

কথাটি এখনও পরিষ্কার হয় নাই। সামাজিক অত্যাচার ত বুঝা গেল, কিন্তু কে অত্যাচার করে? কাহার উপর অত্যাচার হয়? সমাজ মনুষ্যের সমবায়। এই সমবেত মনুষ্যগণ কি আপনাদিগেরই উপর অত্যাচার করে? অথবা পরস্পরের রক্ষার্থ যাহারা সমাজসম্বদ্ধ হইয়াছে, তাহারাই কি পরস্পরে উৎপীড়ন করে?

তাই বটে, অথচ ঠিক তাই নহে।

মনে রাখিতে হইবে যে শক্তিবহ অত্যাচার, যাহার হাতে সামাজিক শক্তি সেই অত্যাচার করে। যেমন গ্রহাদি জড়পিণ্ড মাত্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কেন্দ্রনিহিত, তেমনি সমাজেরও একটি প্রধান শক্তি কেন্দ্রনিহিত। সেই শক্তি শাসনশক্তি—সামাজিক কেন্দ্র রাজা বা সামাজিক শাসনকর্তৃগণ। সমাজ রক্ষার জন্য, সমাজের শাসন আবশ্যক। সকলেই শাসনকর্ত্তা হইলে, অনিয়ম এবং মতভেদ হেতু শাসন অসম্ভব। অতএব শাসনের ভার, সকল সমাজেই এক বা ততোধিক ব্যক্তির উপর নিহিত হইয়াছে। তাঁহারাই সমাজের শাসনশক্তিধর—সামাজিক কেন্দ্র। তাঁহারাই অত্যাচারী। তাঁহারা মনুষ্য, মনুষ্যমাত্রেরই ভ্রান্তি এবং আত্মাদর আছে। ভ্রান্ত হইয়া তাঁহারা সেই সমাজপ্রদত্ত শাসনশক্তি, শাসিতব্যের উপরে অবিহিত প্রয়োগ করেন। আত্মাদরের বশীভূত হইয়াও তাঁহারা উহার অবিহিত প্রয়োগ করেন।

তবে এক সম্প্রদায় সামাজিক অত্যাচারীকে পাইলাম। তাঁহারা রাজপুরুষ—অত্যাচারের পাত্র সমাজের অবশিষ্টাংশ। কিন্তু বাস্তবিক এই সম্প্রদায়ের অত্যাচারী কেবল রাজা বা রাজপুরুষ নহে। যিনিই সমাজের শাসনকর্ত্তা, তিনিই এই সম্প্রদায়ের অত্যাচারী। প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ, রাজপুরুষ বলিয়া গণ্য হয়েন না, অথচ তাঁহারা সমাজের প্রধান শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আর্য্যসমাজকে, তাঁহারা যে দিকে ফিরাইতেন ঘুরাইতেন আর্য্যসমাজ সেই দিকে ফিরিত ঘুরিত। আর্য্যসমাজকে তাঁহারা যে শিকল পরাইতেন, অলঙ্কার বলিয়া আর্য্যসমাজ সেই শিকল পরিত। তাঁহারা ঘোরতর সামাজিক অত্যাচারী ছিলেন। মধ্যকালিক ইউরোপের ধর্ম্মযাজকগণ সেইরূপ ছিলেন—রাজপুরুষ নহেন, অথচ ইউরোপীয় সমাজের শাসনকর্ত্তা, এবং ঘোরতর অত্যাচারী। পোপগণ, ইউরোপের রাজা ছিলেন না, এক বিন্দু ভূমির রাজা মাত্র, কিন্তু তাঁহারা সমগ্র ইউরোপের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন। গ্রেগরি বা ইনোসেণ্ট, লিও বা আদ্রিয়ান, ইউরোপে যতটা অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় ফিলিপ বা চতুর্দ্দশ লুই, অষ্টম হেনরি বা প্রথম চার্লস্ ততদূর করিতে পারেন নাই।

কেবল রাজপুরুষ বা ধর্ম্মযাজকের দোষ দিয়া ক্ষান্ত হইব কেন? ইংলণ্ডে এক্ষণে রাজা (রাজ্ঞী) কোন প্রকার অত্যাচারে ক্ষমতাশালী নহেন—শাসনশক্তি তাঁহার হস্তে নহে। এক্ষণে প্রকৃত শাসন শক্তি ইংলণ্ডে, সম্বাদপত্রলেখকদিগের হস্তে। সুতরাং ইংলণ্ডের সম্বাদপত্র লেখকগণ অত্যাচারী। যে খানে সামাজিক শক্তি, সেই খানেই সামাজিক অত্যাচার।

কিন্তু সমাজের কেবল শাসনকর্ত্তা এবং বিধাতৃগণ অত্যাচারী এমত নহে। অন্য প্রকার সামাজিক অত্যাচারী আছে।

যে সকল বিষয়ে রাজশাসন নাই, ধর্ম্ম-শাসন নাই, কোন প্রকার শাসনকর্ত্তার শাসন নাই—সে সকল বিষয়ে সমাজ কাহার মতে চলে? অধিকাংশের মতে। যে খানে সমাজের এক মত, সে খানে কোন গোলই নাই—কোন অত্যাচার নাই। কিন্তু এরূপ ঐকমত্য অতি বিরল। সচরাচরই মতভেদ ঘটে। মতভেদ ঘটিলে, অধিকাংশের যে মত, অল্পাংশকে সেই মতে চলিতে হয়। অল্পাংশ ভিন্নমতাবলম্বী হইলেও, অধিকাংশের মতানুসারে কার্য্যকে ঘোরতর দুঃখ বিবেচনা করিলেও, তাহাদিগকে অধিকাংশের মতে চলিতে হইবে। নহিলে অধিকাংশ অল্পাংশকে সমাজবহিষ্কৃত করিবা দিবে—বা অন্য সামাজিক দণ্ডে পীড়িত করিবে। ইহা ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার। ইহা অল্পাংশের উপর অধিকাংশের অত্যাচার বলিয়া কথিত হইয়াছে।

এদেশে অধিকাংশের মত যে, কেহ হিন্দুবংশজ হইয়া বিধবার বিবাহ দিতে পারিবে না, বা কেহ হিন্দুবংশজ হইয়া সমুদ্র পার হইবে না। অল্পাংশের মত বিধবার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইংলণ্ডদর্শন পরম ইষ্টসাধক। কিন্তু যদি এই অল্পাংশ আপনা দিগের মতানুসারে কার্য্য করে,—বিধবা কন্যার বিবাহ দেয় বা ইংলণ্ডে যায়, তবে তাহারা অধিকাংশকর্ত্তৃক সমাজবহিষ্কৃত হয়। ইহা অধিকাংশকর্ত্তৃক অল্পাংশের উপর সামাজিক অত্যাচার।

ইংলণ্ডে অধিকাংশ লোক খ্রীষ্টভক্ত, এবং ঈশ্বরবাদী। যে অনীশ্বরবাদী, বা খ্রীষ্টধর্ম্মে ভক্তিশূন্য, সে সাহস করিয়া আপনার অবিশ্বাস ব্যক্ত করিতে পারে না। ব্যক্ত করিলে নানা প্রকার সামাজিক পীড়ায় পীড়িত হয়। মিল জন্মাবচ্ছিন্নে আপনার অভক্তি ব্যক্ত করিতে পারিলেন না; ব্যক্ত না করিয়াও, কেবল সন্দেহের পাত্র হইয়াও, পার্লিমেণ্টে অভিষেক কালে অনেক বিঘ্নবিব্রত হইয়াছিলেন। এবং মৃত্যুর পর অনেক গালি খাইয়াছিলেন। ইহা ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার।

অতএব সামাজিক অত্যাচারী দুই শ্রেণীভুক্ত, এক সমাজের শাস্তা এবং বিধাতৃগণ, দ্বিতীয় সমাজের অধিকাংশ লোক। ইহাদিগের অত্যাচারে সামাজিক দুঃখের উৎপত্তি। সেই সকল সামাজিক দুঃখ, সমাজের অবনতির কারণ। তাহার নিবারকরণ মনুষ্যের সাধ্য, এবং অবশ্য কর্ত্তব্য। কি কি উপায়ে, সেই সকল অত্যাচারের নিবারকরণ হইতে পারে?

দুই উপায়; বাহুবল এবং বাক্যবল।

বাহুবল কাহাকে বলি, এবং বাক্যবল কাহাকে বলি, তাহা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বুঝাইব। তৎপরে এই বলের প্রয়োগ বুঝাইব। এবং এই দুই বলের প্রভেদ ও তারতম্য দেখাইব।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

খদ্যোত।

খদ্যোত যে কেন আমাদিগের উপহাসের স্থল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। বোধ হয় চন্দ্র সূর্য্যাদি বৃহৎ আলোকাধার সংসারে আছে বলিয়াই জোনাকির এত অপমান। যেখানেই অল্পগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপহাস করিতে হইবে, সেই খানেই বক্তা বা লেখক জোনাকির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আমি দেখিতে পাই যে জোনাকির অল্প হউক অধিক হউক কিছু আলো আছে—কই আমাদের ত কিছুই নাই। এই অন্ধকারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহার পথ আলো করিলাম? কে আমাকে দেখিয়া, অন্ধকারে, দুস্তরে, প্রান্তরে, দুর্দ্দিনে, বিপদে, বিপাকে, বলিয়াছে, এসো ভাই, চল চল, ঐ দেখ আলো জ্বলিতেছে, চল ঐ আলো দেখিয়া পথ চল? অন্ধকার। এ পৃথিবী ভাই বড় অন্ধকার। পথ চলিতে পারি না। যখন চন্দ্র সূর্য্য থাকে, তখন পথ চলি—নহিলে পারি না। তারাগণ আকাশে উঠিয়া, কিছু আলো করে বটে, কিন্তু দুর্দ্দিনে ত তাহাদের দেখিতে পাই না। চন্দ্র সূর্য্যও সুদিনে—দুর্দ্দিনে, দুঃসময়ে, যখন মেঘের ঘটা, বিদ্যুতের ছটা, একে রাত্রি, তাতে ঘোরবর্ষা, তখন কেহ না। মনুষ্যনির্ম্মিত যন্ত্রের ন্যায় তাহারাও বলে—"*Hora non numero nisi serenas!*" কেবল তুমি খদ্যোত,—ক্ষুদ্র, হীনভাস, ঘৃণিত, সহজে হন্য, সর্ব্বদা হত—তুমিই সেই অন্ধকার দুর্দ্দিনে বর্ষাবৃষ্টিতে দেখা দাও। তুমিই অন্ধকারে আলো। আমি তোমাকে ভাল বাসি।

আমি তোমায় ভাল বাসি, কেন না, তোমার অল্প, অতি অল্প, আলো আছে—আমিও মনে জানি আমারও অল্প, অতি অল্প, আলো আছে—তুমিও অন্ধকারে, আমিও তাই, ঘোর অন্ধকারে। অন্ধকারে সুখ নাই কি? তুমিও অনেক অন্ধকারে বেড়াইয়াছ—তুমি বল দেখি? যখন নিশীথমেঘে জগৎ আচ্ছন্ন, বর্ষা হইতেছে, ছাড়িতেছে, ছাড়িতেছে হইতেছে—চন্দ্র নাই, তারা নাই, আকাশের নীলিমা নাই, পৃথিবীর দীপ নাই—প্রস্ফুটিত কুসুমের শোভা পর্য্যন্ত নাই—কেবল অন্ধকার, অন্ধকার। কেবল অন্ধকার আছে—আর তুমি আছ—তখন, বল দেখি, অন্ধকারে কি সুখ নাই? সেই তপ্ত রৌদ্রপ্রদীপ্ত কর্কশ স্পর্শপীড়িত, কঠোর শব্দে শব্দায়মান অসহ্য সংসারের পরিবর্ত্তে, সংসার আর তুমি! জগতে অন্ধকার, আর মুদিত কামিনীকুসুম জলনিষেকতরুণায়িত বৃক্ষের পাতায় পাতায় তুমি! বল দেখি, ভাই, সুখ আছে কি না?

আমি ত বলি আছে। নহিলে কি

সাহসে, তুমি ঐ বন্যান্ধকারে, আমি এই সামাজিক অন্ধকারে, এই ঘোর দুর্দ্দিনে ক্ষুদ্র আলোকে আলোকিত করিতে চেষ্টা করিতাম? আছে—অন্ধকারে মাতিয়া আমোদ আছে। কেহ দেখিবে না—অন্ধকারে তুমি জ্বলিবে—আর অন্ধকারে আমি জ্বলিব; অনেক জ্বালায় জ্বলিব। জীবনের তাৎপর্য্য বুঝিতে অতি কঠিন—অতি গূঢ়, অতি ভয়ঙ্কর—ক্ষুদ্র হইয়া তুমি কেন জ্বল, ক্ষুদ্র হইয়া আমি কেন জ্বলি? তুমি তা ভাব কি? আমি ভাবি। তুমি যদি না ভাব, তুমি সুখী। আমি ভাবি—আমি অসুখী। তুমিও কীট—আমিও কীট, ক্ষুদ্রাধিক ক্ষুদ্র কীট—তুমি সুখী,—কোন পাপে আমি অসুখী? তুমি ভাব কি? তুমি কেন জগৎসবিতা সূর্য্য হইলে না, এককালীন আকাশ ও সমুদ্রের শোভা যে সুধাকর, কেন তাই হইলে না—কেন গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু নীহারিকা,—কিছু না হইয়া কেবল জোনাকি হইলে, ভাব কি? যিনি, এ সকলকে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই তোমায় সৃজন করিয়াছেন, যিনিই উহাদিগকে আলোক দিয়াছেন, তিনিই তোমাকে আলোক দিয়াছেন—তিনি একের বেলা বড় ছাঁদে—অন্যের বেলা ছোট ছাঁদে, গড়িলেন কেন? অন্ধকারে, এত বেড়াইলে, ভাবিয়া কিছু পাইয়াছ কি?

তুমি ভাব না ভাব, আমি ভাবি। আমি ভাবিয়া স্থির করিয়াছি, যে বিধাতা তোমায় আমায় কেবল অন্ধকার রাত্রের জন্য পাঠাইয়াছেন। আলো একই—তোমার আলো ও সূর্য্যের—উভয়ই জগদীশ্বর প্রেরিত—তবে তুমি কেবল বর্ষার রাত্রের জন্য, আমি কেবল বর্ষার রাত্রের জন্য। এসো কাঁদি।

এসো কাঁদি, বর্ষার সঙ্গে, তোমার আমার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ কেন? আলোকময়, নক্ষত্রপ্রোজ্জ্বল বসন্তগগনে তোমার আমার স্থান নাই কেন? বসন্ত চন্দ্রের জন্য, সুখীর জন্য, নিশ্চিন্তের জন্য,—বর্ষা তোমার জন্য, দুঃখীর জন্য, আমার জন্য। সেই জন্য কাঁদিতে চাহিতেছিলাম—কিন্তু কাঁদিব না। যিনি তোমার, আমার জন্য এই সংসার অন্ধকারময় করিয়াছেন, কাঁদিয়া তাঁহাকে দোষ দিব না। যদি অন্ধকারের সঙ্গে তোমার আমার নিত্য সম্বন্ধই তাঁহার ইচ্ছা, আইস অন্ধকারই ভাল বাসি। আইস, নবীন নীল কাদম্বিনী দেখিয়া, এই অনন্ত অসংখ্য জগন্ময় ভীষণ বিশ্বমণ্ডলের করাল ছায়া, অনুভূত করি; মেঘগর্জ্জন শুনিয়া, সর্ব্বধ্বংসকারী কালের অবিশ্রান্ত গর্জ্জন স্মরণ করি;—বিদ্যুদ্দাম দেখিয়া, কালের কটাক্ষ মনে করি। মনে কর, এই সংসার ভয়ঙ্কর, ক্ষণিক,—তুমি আমি ক্ষণিক, বর্ষার জন্যই প্রেরিত হইয়াছিলাম, কাঁদিবার কথা নাই। আইস নীরবে, জ্বলিতে জ্বলিতে, অনেক জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে, সকল সহ্য করি।

নহিলে, আইস, মরি। তুমি দীপা

লোক বেড়িয়া বেড়িয়া পুড়িয়া মর, আমি আশারূপ প্রবল প্রোজ্জল মহাদীপ বেড়িয়া বেড়িয়া পুড়িয়া মরি। দীপালোকে তোমার কি মোহিনী আছে জানি না—আশার আলোকে আমার যে মোহিনী আছে, তাহা জানি। এ আলোকে কতবার ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম, কতবার পুড়িলাম, কিন্তু মরিলাম না। এ মোহিনী কি আমি জানি। জ্যোতিষ্মান্ হইয়া এ সংসারে আলো বিতরণ করিব—বড় সাধ; কিন্তু হায়! আমরা খদ্যোত! এ আলোকে কিছুই আলোকিত হইবে না! কাজ নাই। তুমি ঐ বকুলকুঞ্জ কিসলয়-কৃত অন্ধকার মধ্যে, তোমার ক্ষুদ্র আলোক নিবাও, আমিও জলে হউক, স্থলে হউক, রোগে হউক, দুঃখে হউক, এ ক্ষুদ্র দীপ নিবাই।

মনুষ্য-খদ্যোত।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পূর্ব্বকালে অগ্নি মহাপরীক্ষক ছিলেন। মনুষ্যের চরিত্র পর্য্যন্ত অগ্নিদ্বারা পরীক্ষিত হইত। যাহার স্বভাবে অণুমাত্র মলা থাকিত অগ্নির নিকট তাহা ধরা পড়িত। বানরপতি শ্রীরামচন্দ্র অগ্নিদ্বারা সীতার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও অনেক অরণ্যপতি সাধুত্বের পরীক্ষা সেইরূপে লইয়া থাকেন। অগ্নিদ্বারা স্বর্ণ-পরীক্ষা অতি সুন্দর হয়, সকলেই তাহা নিত্য দেখিতেছেন। অতএব অগ্নিদ্বারা আমাদের কতকগুলি বাঙ্গালাগ্রন্থ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। অন্ততঃ নাটক প্রহসন উপহসন প্রভৃতি আধুনিক রসিক-রঞ্জন গ্রন্থগুলিকে এই পরীক্ষাধীন করিলে ভাল হয়। গ্রন্থের পক্ষে এ পরীক্ষা নূতনও নহে। কথিত আছে রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে এই পরীক্ষা প্রবল ছিল, গ্রন্থ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিলে যদি পুড়িয়া যাইত রাজসভাসদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করিতেন যে গ্রন্থখানি অবশ্য অসার ছিল নতুবা পুড়িবে কেন। আমরাও সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া একখানি প্রহসন পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম গ্রন্থ পুড়িয়া গেল। কি করিব গ্রন্থকার কিছু মনে করিবেন না। গ্রন্থকারের নাম হরিহর নন্দী।

মাধবিকা। এই নাটকেরও ঐ রূপ পরীক্ষা করিতে আমাদের বড় ইচ্ছা হইয়াছিল; কোন বিশেষ বন্ধুর অনুরোধে আপাততঃ তাহাতে বিরত হওয়া গেল। এক্ষণকার নাটকমাত্রেরই যদি ঐরূপ পরীক্ষা হয় তাহা হইলে নিতান্ত ক্ষতি হইবে না। যতই নাটক দেখিতে পাওয়া যায়

প্রায় সকল গুলিতেই এক জাতীয় কারিগরের হস্ত লক্ষিত হয়, সকল রচয়িতার সংস্কার যে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের কথা-বার্ত্তা লিখিতে পারিলেই নাটক রচনা হইল। আবার পাঠকেরও সংস্কার যে উত্তর প্রত্যুত্তর পাঠ করিতে পাইলেই নাটক পাঠ করা হইল। সে যাহাই হউক এবার অবধি আমরা গ্রন্থবিশেষের নিমিত্ত অগ্নিপরীক্ষা প্রচলিত করিলাম।

বাঙ্গালা শিক্ষা। বাবু সিদ্ধেশ্বর রায় অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার কৃত বাঙ্গালা শিক্ষা প্রথম ভাগ আমাদের দিয়াছেন। প্রথম পত্রে দেখিলাম ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত সকল বর্ণ গুলি ডবল গ্রেট টাইপে মুদ্রিত হইয়াছে। কোন বর্ণ ভুল হয় নাই। দ্বিতীয় পত্রে য ফলা, তৃতীয় পত্রে র ফলা প্রভৃতি সকল ফলা আছে। কোনটিই ভুলেন নাই, আশ্চর্য্য ক্ষমতা। বিজ্ঞাপনে বাবু লিখিয়াছেন যে "এরূপ পুস্তকের অভাব অনুভব করিয়া আমাকে এই অভাব পূরণ করিতে অনেকে অনুরোধ করেন।" আবার জানাইয়াছেন যে এই অভাব মোচনের নিমিত্ত একা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, "শ্রীযুক্ত মিয়াজান রহমান মহাশয় সমুদয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।" হিন্দু মুসলমান একত্র হইলে যে ভারতের কতদূর উন্নতি হয় তাহার এই এক অদ্ভুত উদাহরণ।

অপরিচিত গ্রন্থ। কোন গ্রন্থকার একখানি অনুরোধ পত্র পাঠাইয়াছেন কিন্তু তাঁহার গ্রন্থখানি পাঠান নাই। অনুরোধ পত্রে গ্রন্থকারের উল্লেখ আছে কিন্তু গ্রন্থের নাম নাই; তাহা নাই থাকুক আমরা সমালোচনার ত্রুটি করিব না। বিশেষতঃ ভাল বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি অতএব আমরা এক্ষণকার বাজারচলিত সমালোচনা অনুকরণ করিয়া বলিলাম গ্রন্থখানি সুন্দর হইয়াছে "এরূপ পুস্তক যতই হয় ততই দেশের মঙ্গল।" কোন পাঠক যদি গ্রন্থখানির নাম জানিতে চাহেন তবে অনুরোধ করি গ্রন্থখানি ক্রয় করিয়া তাহার নাম অবগত হইবেন।

পুরাতন গ্রন্থ। ছয় বৎসর গত হইল দেশহিতৈষী কোন গ্রন্থকার জ্ঞানদীপে বাঙ্গালা জ্বালাইবার জন্য একখানি চারিআনা মূল্যের গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার দুরদৃষ্ট বশতঃ কেহই গ্রন্থখানি ক্রয় করে নাই। এক্ষণে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হইয়াছে কিন্তু বোধ হয় তাহার ব্যয় বাঁচাইবার উদ্দেশে গ্রন্থখানি সমালোচনার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। অনেকে জানেন সমালোচিত হইলে বিজ্ঞাপনের ফল পাওয়া যায়। অতএব গ্রন্থকারকে সে ফল দেওয়া গেল না।

সভ্যতার ইতিহাস। প্রথম খণ্ড শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাসপ্রণীত, শ্রীদৈবকীনন্দন সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা ভবানীচরণ দাসের লেন দাস এণ্ড কোম্পানির বিজ্ঞান যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে। গ্রন্থখানি কোন সনে মুদ্রিত বা প্রকাশিত হইয়াছে

তাহা প্রকাশ নাই বোধ হয় সম্প্রতির মুদ্রাঙ্কন নহে। গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট অক্ষরে উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং অপরিচিত নহেন, শ্রীকৃষ্ণ বাবু জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এবং স্মরণ হইতেছে এই ইতিহাস জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় তিনি সময়ে সময়ে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তৎকালে অনেকেই ইহা পাঠ করিয়াছেন, এই জন্য আমরা ইহার প্রকৃত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না। কিন্তু তথাপি ইহার মর্ম্মবোধার্থ প্রথম অধ্যায়ের সূচী পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১। মনুষ্য কি? শরীর সহ কি সম্বন্ধ যুক্ত?

২। স্বকীয় ও সামাজিক সভ্যতা।

৩। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সভ্যতা।

৪। প্রকৃত সভ্যতা।

৫। উন্নতি ও অবনতিশীল সমাজের সভ্যতা।

৬। বক্লের মত।

৭। বক্ল সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক প্রমাণ।

৮। মানসিক ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির একত্র উন্নতি।

৯। এতৎসম্বন্ধীয় আপত্তি।

১০। গ্রীক ও রোমেয়।

সুধীরঞ্জন। ৺দ্বারকানাথ অধিকারী প্রণীত তৎপুত্র শ্রীনীলরতন অধিকারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দ্বারকানাথ বাবু যখন কালেজে অধ্যয়ন করিতেন সেই সময় বালকদিগের নিমিত্ত এই পদ্য গুলি প্রকাশ করেন এবং বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন যে "পাঠক মহাশয়েরা গ্রন্থকারের নাম দেখিয়াই ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক পুস্তক খানি পরিত্যাগ করিবেন না অনুগ্রহ করিয়া একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিবেন।" কিন্তু তাঁহার এই অনুরোধ কতদূর রক্ষা হইয়াছিল তাহা আমরা জানি না। বহুকালের পর আবার সুধীরঞ্জন প্রকাশ হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তার পুত্র লিখিয়াছেন যে "আমার স্বর্গীয় পিতার এক অতুলকীর্ত্তি বিলুপ্ত হয় দেখিয়া উহা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" এখানে পিতৃভক্তি অতি প্রবল, সমালোচনার আর স্থান নাই। ঈশ্বর গুপ্তের সময় দ্বারকানাথ বাবু সরল কবি বলিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন, বালকেরা তাঁহার কবিতা পড়িতে ভাল বাসিত। এখন ভাল বাসিবে কি না, আমরা নিশ্চয় অনুভব করিতে পারিতেছি না।

বিজ্ঞাপন।

বেনারসে বাটি বিক্রয়।

বারাণসী, দশাশ্বমেধ, বড় রাস্তার ধারে গঙ্গার অতি নিকটে, মানমন্দির মহল্লার দুই খণ্ড (অন্য ব্যক্তির) নূতন পাকা চৌতালা বাড়ী ইঞ্জিনিয়ার দ্বারায় ভদ্র পরিবারের বাসোপযোগী রূপে প্রস্তুত হইয়াছে। ছোট বড় ২৩টী কামরা। রন্ধনশালা ব্যতীত সমস্ত ঘরেই শাশী, পাল্লা ও ঝিল্‌মিলি দ্বার। বাড়ীর দলীলাদি সম্বন্ধে কোন গোলযোগ নাই। মূল্য ১০,০০০। গ্রহণেচ্ছুব্যক্তি আমার নিকটে লিখিলেই সমস্ত জানিবেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চৌধূরী।
মানমন্দির, বারানসী।

রায় দিনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী।

গ্রন্থকারের জীবনীসম্বলিত। তৎপুত্রগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং প্রকাশিত। কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত ১৮৭৭ সাল। মূল্য ৭, সাত টাকা মাত্র।

সভ্যতার ইতিহাস।

শ্রী শ্রীকৃষ্ণ দাস প্রণীত।

মূল্য ৸০ ডাকমাশুল ৵০।

কলিকাতা ৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরি ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরিতে প্রাপ্য।

মন্মথ-মনোরমা।

পণ্ডিতবর 'ফিল্ডিং' কৃত 'এমেলিয়ার' কল্পনামাত্র অবলম্বন।

প্রথম ভাগ। মূল্য ॥০ ডাকমাশুল /০।

১৮ নং অক্রূর দত্তের গলি বহুবাজার কলিকাতা প্রকাশক শ্রীকিশোরীলাল দত্তের নিকট ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

ঐতিহাসিকরহস্য।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রণীত।

"ঐতিহাসিকরহস্য দ্বারা রামদাস বাবু অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।" অমৃত বাজার পত্রিকা ১৯শে ফাল্গুন।

এই পুস্তক কলিকাতা বহুবাজার ২৪৯ নং ষ্টানহোপ যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, ও ৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরীতে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য ১৲ এক টাকা ডাকমাশুল ৵০ দুই আনা। ইহার প্রথম ভাগও ঐ সকল স্থানে পাওয়া যায় মূল্য ১৲ একটাকা ডাকমাশুল ৵০ দুই আনা।

বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

পঞ্চম খণ্ড।

সতীদাহ।

এক মবণে দুই জন মবিত, ইহা আমাদেব পক্ষে প্রায় কাহিনী হইযা উঠিযাছে ; কিন্তু আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানেন, যে অতি অল্পকাল পূর্ব্বে এরূপ মৃত্যু সচবাচব সংঘটিত হইত। ইংবেজেব অধিকৃত প্রদেশসমূহ হইতে প্রথাটা বহিত হইয়া গিয়াছে বটে,—মুসলমান বাজত্বকালেও অনেক স্থানে সহগমন নিষিদ্ধ ছিল, আবে দুবোয়া দাক্ষিণাত্যেব রীতিনীতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, মুসলমান শাসনকর্ত্তাবা আপন আপন শাসনাধীন প্রদেশে সতী যাইতে দিতেন না, এবং আর্য্যাবর্ত্তে এ ব্যবহাবেব বহুলপ্রচাব হইলেও দাক্ষিণাত্যে বিবলপ্রচাব ছিল ;—ইংরেজের অধিকারমধ্যে বহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় স্বাধীন রাজ্য সকল হইতে এখনও একেবারে লুপ্ত হয নাই। সে দিনও মৃত জং বাহাদুবেব ভার্য্যাবা সহগমন কবিযাছেন।

প্রথাটা কত কালেব, তাহা স্থিব কবা দুষ্কব। অনেকেব মতে, ঋগ্বেদেব দশম মণ্ডলে সতীগমনেব অনুমতি আছে ; কিন্তু উইল্‌সন, মক্ষমূলব, কাউযেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উক্ত বিধিব পাঠেব সত্যতায় সন্দেহ কবেন। তাঁহাবা বলেন, যেখানে ‘ অগ্নে ’ আছে, সেখানে ‘ অগ্রে ’ পডিতে হইবে। সে যাহাই হউক, অনুগমনেব অনুকূল বিধি বেদে থাকুক বা নাই থাকুক, প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে যে আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অঙ্গিরা, ব্যাস, পরাশব, পত্যনুগমনই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ কবিয়াছেন। কিন্তু ইহাঁদিগেরই যখন কালনির্ণয় হয় না, তখন ইহাঁদেব

বচনের উপর নির্ভর করিয়া প্রথাবিশেষের মূলানুসন্ধান কি রূপে হইতে পারে? তবে, ভিন্নদেশীয় সাহিত্যেও ইহার উল্লেখ আছে। দিওদোরস্ এই প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে, খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে ইউমিনিসের সৈন্যমধ্যে সতীদাহ হইয়াছিল। অতএব ইহা এক রূপ সিদ্ধ, যে সতীদাহ প্রথাটা সার্দ্ধদ্বিসহস্র বর্ষ বা ততোধিক কালের।

প্রথাটির মূল নির্ণয় করা আরও কঠিন। এ সম্বন্ধে লিখিত কিছু নাই, সুতরাং ইহার উপর অনুমান ব্যতীত আর কিছু চলিতে পারে না। অনেকে অনেক অনুমান করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে দুই চারিটার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

দিওদোরস্ বলেন, পত্যনুগমনের মূল কারণ, হিন্দুসমাজে বিধবার দুর্গতি এবং দুরবস্থা। এ অনুমানটি সঙ্গত বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। সামাজিক নিয়মানুসারে বিধবার যে দুর্গতি, তাহা বিধবামাত্রেরই—দুই চারি জনের নহে। বৈধব্য দুঃখই যদি সহমরণের কারণ হইত তাহা হইলে অধিকাংশ অথবা বহুসংখ্যক বিধবা পতিবর্ত্মগা হইত। তাহা হয় নাই। সতী যাওয়া যখন অত্যন্ত প্রচলিত, তখনও অনুগামিনী বিধবার সংখ্যা শতকরা এক জনেরও ন্যূন—ঊর্দ্ধসংখ্যা, হাজারে পাঁচ জন। এতও বটে কি না, সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ, বৈধব্যনিবন্ধন যে দুঃখ, তাহা নীচজাতীয়ার অপেক্ষা উচ্চজাতীয়ার অধিক—প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য কেবল ব্রাহ্মণের বিধবার কপালে। সুতরাং ভারতবর্ষের যে সকল স্থলে সতীদাহ হইত, সে সকল স্থানেই নীচজাতীয় সতীসংখ্যা অপেক্ষা উচ্চ জাতীয় সতীসংখ্যা অবশ্য অধিক হওয়া উচিত ছিল, কেন না উচ্চ জাতীয় বিধবার দুর্গতি অধিক। কিন্তু তাহা হয় নাই। সর্ তামস্ ষ্ট্রেঞ্জ বলেন, আর্য্যাবর্ত্তে না হউক, অন্ততঃ দাক্ষিণাত্যে সতীর সংখ্যা নীচ জাতির মধ্যেই অধিক। দিওদোরসের অনুমানের সঙ্গে এ কথার সামঞ্জস্য হয় না। অতএব ইহা এককরূপ নিশ্চিত যে বৈধব্যদুঃখ সহমরণের একমাত্র কারণ ত নহেই, প্রধান কারণও নহে।

তবে কি স্বর্গলাভের জন্য? তাহাও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না, কেননা চিতারোহণ অপেক্ষা এমন অনেক সহজ কার্য্য আছে, যাহা করিলে শাস্ত্রানুসারে স্বর্গ হয়। কিন্তু স্বর্গের জন্য সে সকল অপেক্ষাকৃত সহজ কাজও লোকে করে না। যদি স্বর্গের জন্য সুকরতর কার্য্য না করে, তবে সেই স্বর্গের জন্যই যে এমন দুষ্কর কার্য্য করিবে—জ্বলন্ত বহ্নিতে জীবন্তে পুড়িয়া মরিবে—এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। অতএব ইহাও বুঝা গেল যে কেবল স্বর্গের জন্য সতীরা পুড়িত না।

বুঝি ভালবাসার জন্য। তাহাও বোধ হয় না। স্বামীকে ভালবাসে বলিয়া, স্বামি-বিরহ-দুঃখ অসহ্য বলিয়া যে প্রাণত্যাগ করিতে চায়, তাহারি চিতারোহণ

করিয়া পুড়িয়া মরিবার আবশ্যকতা রাখে না—সে অন্য উপায়েও মরিতে পারে। সত্য সত্যই মরিবার ইচ্ছা থাকিলে কেহ কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না। যমালয়ের পথ অসংখ্য। রাজবিধি একটা প্রকাশ্য পথ বন্ধ করিতে পারে, কিন্তু সকল পথ বন্ধ করা রাজবিধির সাধ্যাতীত। প্রকাশ্য রূপে, ধূমধাম করিয়া, ধূপধূনা জ্বালিয়া, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া চিতারোহণ করা যেন রহিত হইল, কিন্তু তেমন ইচ্ছা থাকিলে, অন্য পথও আছে—গলায় দড়ি দেওয়া যাইতে পারে, বিষ খাওয়া যাইতে পারে, জলে ঝাঁপ দেওয়া যাইতে পারে—ধ্বংস-পুরের শত সহস্র দ্বার। তবে, যে দিন হইতে ১৮২৯ শালের ১৭ আইন জারি হইয়াছে, সেই দিন হইতে আর কেহ পতি বিরহে প্রাণত্যাগ করে না কেন? আরও একটা কথা আছে। যে কেহ হিন্দুসমাজের প্রকৃতি এবং গতি একটু পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে স্বামীকে ভাল বাসিতে হইবে, ইহা কোন কালেই হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক নারীধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। হিন্দুললনার ধর্ম্ম, পতিভক্তি—পতিপ্রেম নহে। হিন্দুসমাজ হিন্দুললনাকে ইহাই শিখায় যে, স্বামী দেবতা, তাঁহাকে ভক্তি করিতে হইবে, তাঁহার প্রসাদ খাইতে হইবে, তাঁহার পাদোদক সেবন করিতে হইবে,—তাঁহাকে ভাল বাসিতে হইবে, এ শিক্ষা হিন্দুসমাজের নহে। এই অপরিবর্ত্তনীয় জাতিভেদপ্রপীড়িত বৈষম্যপূর্ণ দেশে সাম্য নীতি নাই, সুতরাং প্রেম শিক্ষাও নাই। যদি কিঞ্চিৎ প্রেম শিক্ষা আমাদের হইয়া থাকে, তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল। দাম্পত্য প্রণয়ের ভাবটা কেবল নব্য দলে। অতএব, কেবল ভালবাসার জন্যও সতীরা পুড়িত না। আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে, পূর্ব্বতন হিন্দুললনাদের হৃদয়ে পতি প্রেম আদৌ ছিল না। আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, যাহা ছিল তাহা এত প্রবল নহে যে আগ্নেয় পথ দিয়া মৃত্যুর দ্বারে লইয়া যাইতে পারিত।

তবে কেন? কারণাভাবে কার্য্য হয় না। আমরা দেখিলাম যে পূর্ব্বলিখিত কারণনিচয়ের মধ্যে বিশেষ কোনটিই প্রকৃত কারণ নহে। আমাদের বিশ্বাস এই যে, সতীদাহের নিন্দাপ্রশংসায় সকলগুলিরই দাবি আছে। প্রথমতঃ, এই চিতায় পুড়িতে পারিলে স্বর্গ নিশ্চিত। কিন্তু স্বর্গ হইলেই যথেষ্ট হইল না,

যার সেথা ভালবাসা, তার সেথা চির আশা
সুখ দুঃখ মনের খনিতে।

অতএব বাঞ্ছিতকে চাই, নতুবা বিমল খাঁটি সুখ হইল না। সতী যাইলে সে সুখও পাওয়া যাইবে। স্বামীর যদি পাপ থাকে—এ সংসারে কাহার নাই? তাহাও এই আত্মবিসর্জ্জনে ধুইয়া যাইবে। হিন্দুললনার এ সংসারে সুখ স্বামী লইয়া। স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে যাইতে পারিলে স্বর্গের সুখ, সংসারের সুখ, উভয় সুখই পাওয়া

গেল। অতএব দ্বিতীয়তঃ, স্বামি-লাভ। তৃতীয়তঃ, দুঃখনিবৃত্তি; বৈধব্য এবং দুঃখ আমাদের দেশে একই কথা। চতুর্থতঃ, গৌরবলাভ, যে সাধ্বী পত্যনুগমন করিল, সে ইহলোকেও ধন্য পরলোকেও ধন্য। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। আমরা যে মত প্রকাশ করিলাম, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেবেরও সেই মত।

এই স্থলে সহমরণপ্রথার দোষ গুণ বিচার করা আবশ্যক হইতেছে। এতদুদ্দেশে আমরা প্রথমে সতীদাহের প্রতিকূল তর্ক সকলের সমালোচনা করিব তৎপরে অনুকূল তর্কের অবতারণা করা যাইবে।

সহমরণের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি এই যে আত্মহত্যা মহাপাপ এবং যাহারা আত্মহত্যার সহায়তা বা অনুমোদন করে তাহারাও মহাপাতকী। যতদূর সাধ্য, এ পাপপ্রবাহ রোধ করা উচিত।

আত্মহত্যা পাপ কিসে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। ফল-নিরপেক্ষ পাপপুণ্যে আমাদের বিশ্বাস নাই। যাহা পাপ, তাহা সকল সময়ে, সকল স্থানে, সকল অবস্থাতেই পাপ, যাহা পুণ্য, তাহাও তেমনি সকল অবস্থায় পুণ্য. এ মতে আমাদের আস্থা নাই। আমাদের বিশ্বাস যাহা স্থানবিশেষে এবং অবস্থাবিশেষে দুষ্কর্ম্ম, স্থানান্তরে এবং অবস্থান্তরে তাহা সৎকর্ম্ম হইতে পারে। সুতরাং বিষয় বিশেষকে সাধু বা অসাধু বলিতে হইলে তাহার সুফল কুফল দেখান চাই। নতুবা কেবল সাধু বা অসাধু বলিলে বিচার্য্য কথাটা স্বীকার করিয়াই লওয়া হইল। ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ এবং অযৌক্তিক। অতএব দেখা যাউক, সহগমনে সমাজে কোন অমঙ্গল আছে কি না।

দুই চারি দশ জন মনুষ্যের মৃত্যুতে যে সমাজের বিশেষ কোন অনিষ্ট আছে, ইহা আমরা বোধ করি না। পুরুষের মৃত্যু, সমাজকর্ত্তৃক অনুভূত না হইলেও, তাহাতে পরিবারবিশেষের গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ সংঘটিত হইতে পারে। এ দেশীয় স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে সে অসুবিধাটুকুও নাই। কেবল সাংসারিক অসুবিধার কথা বলিতেছি, মানসিক সুখ দুঃখের কথা পরে বলিব।

যাঁহারা পৃথিবীর প্রভূত উপকার করিয়াছেন, মহান্ সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, চিন্তার জন্য নূতন পথ খোদিত করিয়াছেন, মনুষ্যজাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছেন, তাঁহাদের অপগমেও সংসারের তাদৃশ ক্ষতি নাই। নিউটন না থাকিলেই যে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কৃত হইত না, এমন নহে। সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পৃথিবী ঘুরিতেছে, এ সত্য গালিলীয় না জন্মিলেই যে চিরকাল অজ্ঞাত থাকিত, এরূপ নহে। হর্বি না জন্মিলেও রক্তসঞ্চরণ আবিষ্কৃত হইত, টরিচেলি বাল্যে মৃত্যুকবলিত হইলেও বায়ুর ভার স্থিরীকৃত হইত; তবে কি না, দশ দিন পূর্ব্বে হইল, না হয় দশ দিন পরে হইত। নিউটন অথবা কেপ্লর,

গালিলীয় অথবা বেকন, বিস্তৃত ক্ষেত্র-পার্শ্বস্থ উচ্চশিব গিবিশৃঙ্গ মাত্র ;—সূর্য্যালোক ক্ষেত্রে আসিবাব পূর্ব্বে অবশ্য তাঁহাদেব মস্তকে পডিবে, কিন্তু তাঁহারা না থাকিলেও সূর্য্যালোক ক্ষেত্রে আসিত।

সকলই সময়ে কবে। নিউটনেব পূর্ব্বে কি ইউবোপে বুদ্ধিমান্ লোক ছিল না—তত্ত্বানুসন্ধাবী লোক ছিল না, তবে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হয নাই কেন? ইহাব এক মাত্র সদুত্তব, তখন সময হয় নাই। মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হইবাব পূর্ব্বে যে সকল সত্যেব আবিষ্কাব এবং প্রচাব নিতান্ত প্রয়োজনীয, সে সকল আবিষ্কৃত এবং প্রচাবিত হয নাই। যে সময়ে এবং সমাজেব যে অবস্থাব তিনি পৃথিবীতে আসিযাছিলেন, সে সময়ে, সে অবস্থায তদাবিষ্কৃত সত্য আবিষ্কৃত হইতই হইত।* নিউটন না কবিতেন, আব কেহ কবিত; কেবল—বলিয়াছি ত, দশ দিন অগ্র পশ্চাৎ। তাহাতেই বলি কাহারও সমাগমাপগমে সংসাবেব বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যে ক্ষতি, তাহা অপূরণীয নহে। যে বৃদ্ধি, তাহা অবশ্যম্ভাবী।

নিউটন অথবা কেপ্লবেব, কোমৎ অথবা বিষার অভাবে যদি জগতেব বিশেষ এবং অপূবণীয় ক্ষতি না থাকে, তবে মুগ্ধা, প্রণয়বিহ্বলা, বিবহকাতরা, সন্তাপদগ্ধা, অন্তঃপুববদ্ধা হিন্দুবিধবাব মৃত্যুতে কি ক্ষতি? বিদ্যায় যে বর্ণজ্ঞানশূন্যা, ভূয়োদর্শন যাব স্বামিমুখ পর্য্যন্ত, সংসাবজ্ঞান যাব শয়নমন্দিরের চতুঃসীমাবদ্ধ, ঘব হইতে আঙ্গিনা যাব বিদেশ—হিন্দুবিধবাব মৃত্যুতে সমাজেব কি ক্ষতি?

এরূপ তর্ক উঠিতে পাবে যে, হিন্দুব স্ত্রীলোক মাত্রেরই ত এই দুর্দ্দশা—সকলেই নিবক্ষব, অজ্ঞান, অন্তঃপুববদ্ধ—তবে, সধবা, বিধবা, অধবা সকলেই মবিবে কি?

ইহাব উত্তবে প্রথমতঃ ইহা বলা যাইতে পাবে যে, হিন্দুবিধবাব যে অবস্থা, সেই অবস্থা যাহাবই হইবে তাহাকেই মবিতে হইবে, এমন কথা আমবা বলি নাই। আমবা এই মাত্র বলিয়াছি যে তাহাব মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষতি নাই। দ্বিতীযতঃ কুমাবী এবং সধবা যে সমাজেব কোন উপকাবে লাগে না, তাহা কে বলিল? সমাজেব অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাহাদেব উপর নির্ভব কবে। তাহাবা মবিলে গর্ভধারণ করিবে কে? নূতন জীবেব সমাবেশ না হইলে, যেমন২ প্রাচীনেরা ইহলোক ত্যাগ কবিবেন, সঙ্গে সঙ্গে সমাজও লুপ্ত হইবে। কিন্তু এ কার্য্যকারিতা বিধবার নাই। বিধবার বিবাহই যখন নিষিদ্ধ তখন গর্ভধারণেব ত কথাই নাই। যদি কোন হতভাগিনী অবৈধ উপায়ে গর্ভধারণ করে, সেও গর্ভ বিনষ্ট করিতে বাধ্য হয়, নতুবা তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়।

---

* নিউটন যে সময়ে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কাব কবেন ফ্রান্সে অন্য এক ব্যক্তি সেই সময়ে উক্ত নিয়ম আবিষ্কাব করিয়াছিলেন।

আরও একটা তর্ক আছে। ইহা এক রূপ নিশ্চিত যে, অন্যান্য জীবের ন্যায় মনুষ্যও, জিবিতচেষ্টানিবন্ধন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন নিয়মে, উপস্থিত উন্নত পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। ভবিষ্যতে আরও উন্নত হইতে হইলে, এই কঠোর জীবিতচেষ্টা দ্বারাই হইতে হইবে। জীবিতচেষ্টা যত কঠোর হইবে, উন্নতিও তত অধিক হইবে। আবার জীবিত চেষ্টার মূলভিত্তি, জনসংখ্যার আধিক্য এবং বৃদ্ধি। যে কোন প্রথা জীবসংখ্যা হ্রাস করে, সুতরাং জীবনসংগ্রামের বেগ হ্রস্ব করিয়া দিয়া উন্নতির ব্যাঘাত জন্মায়, তাহাকেই অবশ্যই দোষাবহ বলিতে হইবে। অতএব সহমরণ প্রথা মন্দ।

ইউরোপে এবং আমেরিকায় এ তর্কের উত্তর নাই। ভারতবর্ষে আছে। স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎসম্বন্ধে জীবিতচেষ্টা অতি অল্প। যাহা কিছু আছে আমেরিকায়। ইউরোপে তদপেক্ষা অল্প। ভারতবর্ষে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কেন না ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগকে স্ব স্ব অভাব পূরণের ভার লইতে হয় না। পিতা বা ভ্রাতা, তৎপরে স্বামী, তৎপরে পুত্র, এ সকলের অভাবে আত্মীয়,—ইহারাই তাহাদের অভাবপূরণের ভার লইয়া থাকেন। যাহাকে নিজের অভাব নিজে পূরণ করিতে হয় না, তাহার আবার জীবিতচেষ্টা কি?

স্ত্রীলোকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জীবিতচেষ্টা না করিলেও পরম্পরা সম্বন্ধে যে জীবিত চেষ্টার সাহায্য করে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য—তাহারা গর্ভধারণ করে বলিয়াই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু এদেশীয় বিধবায় গর্ভধারণ করে না, কেন না বিধবাবিবাহই নিষিদ্ধ। সুতরাং এদেশীয় বিধবা জীবিতচেষ্টার সাহায্যও করে না। অতএব উপরি উক্ত তর্ক ভারতবর্ষে খাটিল না।

সতীদাহের বিরুদ্ধে আর একটা আপত্তি এই যে, সতীদিগের ইচ্ছা না থাকিলেও আত্মীয় স্বজন অনেক সময়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিত। সহজে সিদ্ধকাম না হইলে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ভয়প্রদর্শন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, তিরস্কার, ছল, বল, কৌশল,—এ সকলও অবলম্বিত হইত। সে অবস্থায় এ সকলের দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধও হইত। একেই স্ত্রীলোকেরা কুসংস্কারান্ধা এবং সংসারজ্ঞানশূন্যা, তাহাতে আবার তখন নববিয়োগবিধুরা, সুতরাং বীতসংসারানুরাগিণী, এ অবস্থায় কৌশলে প্রতারিত করা অতি সহজ।

কদাচিৎ কোথাও এরূপ ঘটিলেও ঘটিয়া থাকিতে পারে। হইতে পারে, কোন স্থলে কোন অর্থলোলুপ আত্মীয় বিষয়াধিকারিণী বিধবাকে পোড়াইয়া মারিবার যত্ন করিয়াছে। হইতে পারে, কোথাও কোন অনুদারপ্রকৃতি আত্মীয় ভবিষ্যৎ কলঙ্কের আশঙ্কা করিয়া নববিরহিণীকে জলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু

ব্যক্তিবিশেষের দোষ প্রথার উপর দেওয়া উচিত নহে। আমি যদি কুবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কোন সদনুষ্ঠানকে আমার স্বার্থসাধনে প্রয়োগ করি, সে পাপ আমার —প্রথার দোষ কি? ধর্ম্মভাবের দোহাই দিয়া অনুষ্ঠিত না হইয়াছে, জগতে এমন দুষ্কর্ম্ম নাই, কিন্তু তাই বলিয়া কি ধর্ম্মভাবকে মন্দ বলিতে হইবে? পশুপ্রকৃতি গোস্বামীদিগের চরিত্র দেখিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের বিচার হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ক্লাইব এবং হেষ্টিংসের চরিত্রের জন্য খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মকে দায়ী করা বিহিত নহে। ইহা মনুষ্যচরিত্রের দোষ, এই রক্তমাংসের দোষ; এ দোষ ব্যক্তিবিশেষের, এ দোষ স্বভাবের—সহমরণপ্রথা তাহার দায়ী নহে।

যাঁহারা মনে করেন, যে অধিকাংশ স্থলেই বলপ্রয়োগ অথবা প্রতারণার দ্বারা অবলাগণ চিতানলে নিক্ষিপ্ত হইত, তাঁহারা বড় ভ্রান্ত। ইংরেজে এরূপ মনে করিতে পারেন,—চীনাবাজারের ফিরিওয়ালাদিগের চরিত্র দেখিয়া লর্ড মেকলে সমস্ত বাঙ্গালির মস্তকে গালি-বর্ষণ করিয়াছেন—কিন্তু এ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমরা অধিক অভিজ্ঞ। আমরা ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যে অধিকাংশ স্থলেই পতিবিয়োগ-বিধুরা সতী আপন ইচ্ছায় পতির অনুগমন করিতেন। ইংরেজদিগের মধ্যেও যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহারাও এইরূপ বিশ্বাস করেন। এলফিন্ ষ্টোন লিখিয়াছেন,—সকল স্থলেই না হউক, অধিকাংশ স্থলেই আত্মীয়েরা অকপট হৃদয়ে মরণোদ্যতা সাধ্বীকে নিবারিত করিতে চেষ্টা করিতেন। আপনারা অনুরোধ করিতেন, পুত্র কন্যায় অনুরোধ করিত, বন্ধুবান্ধব এবং পদস্থ ব্যক্তিদিগের দ্বারা অনুরোধ করাইতেন, উচ্চ পরিবার হইলে স্বয়ং রাজা আসিয়া অনুরোধ করিতেন। হেন্‌রি জেফ্রিস্ বুশি সাহেব, তাঁহার 'সতীদাহ' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে প্রায়ই বিধবারা ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্নিপ্রবেশ করিয়া থাকে,—কচিৎ ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। 'সতীদাহের' এই স্থলটি এত সুন্দর যে আমরা লোভসম্বরণ করিতে না পারিয়া কতকটা উদ্ধৃত করিলাম।*

---

* With rare exceptions, the suttee is a voluntary victim. Resolute, undismayed, confident in her own inspiration, but betraying by the tone of her prophecies, which are almost always auspicious, that her tender woman's heart is the true source whence that inspiration flows. Her veil is put off, her hair unbound; and so adorned, and so exposed, she goes forth to gaze on the world for the first time, face to face, as she leaves it She does not blush or quail. She scarcely regards the busied crowd who press so eagerly towards her. Her lips move in momentary prayer. Paradise is in her view. She sees her husband awaiting with approbation the sacrifice which shall restore her to him, dowered with the expiation of their sins, and ennobled with a martyr's crown. Exultingly

সতীদাহের প্রতিকূল কথা আমরা আন্দোলন করিলাম। এক্ষণে তদনুকূল কথার বিচার করা যাউক।

হিন্দুবিধবার মৃত্যুতে সমাজের দুঃখ কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হয়। সে নিজে দুঃখিনী এবং তাহার দুঃখ দেখিয়া আত্মীয় স্বজন দুঃখী। যাহার গৃহে বিধবা কন্যা, তাহার দুঃখের পার নাই। নৈদাঘ একাদশীতে প্রাণের অধিক ধন আঞ্চান করিয়া বেড়ায়, তাহা স্বচক্ষে দেখিতে হয়—আপনার হাতের গ্রাস চক্ষের জলে সিক্ত করিয়া মুখে তুলিয়া দিতে হয়। পাপ সমাজের এমনই নিদারুণ রীতি, যে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিলেও একবিন্দু জল দিবার যো নাই—পিতার প্রাণ ইহাতে কাঁদে না কি? যাহাকে দশমাস দশদিন দেহাভ্যন্তরে করিয়া বহিয়াছেন, বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিয়াছেন, সেই সাগরসিঞ্চিত ধন প্রতিনিয়ত বজ্রদগ্ধ স্মৃতিতরুমূলে নয়নবারি সিঞ্চন করিতেছে, বুকে করিয়া রাবণের চিতা বহিতেছে, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষতবিক্ষত হইতেছে—মায়ের বুক ইহা দেখিয়া ফাটে না কি? তার উপর আশঙ্কা,—কোন্ দিন এই হতভাগিনী প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইবে, মনের আবেগ চাপিয়া রাখিতে অসমর্থ হইবে, আর অমনি আত্মীয়স্বজনের মাথা হেঁট হইবে। এরূপ আশঙ্কা যে হয় না, তাহা কে সাহস করিয়া বলিবে? পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পিণ্ডান্তপিণ্ডশেষ প্রদত্ত হইতে না হইতে গ্রামে গ্রামে মেয়ের অনুসন্ধানে ঘটক বাহির হয়—ভয়, পাছে ছেলেটির দুর্ব্বুদ্ধি ঘটে। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে যে এ আশঙ্কা হয় না, ইহা কেমন করিয়া বলা যায়? স্ত্রীলোক কি মানুষ নহে? তাহাদের রক্তমাংস কি অন্য উপকরণে নির্ম্মিত? অবশ্য আশঙ্কা হয়, এবং আশঙ্কা দুঃখের ভার। বিধবার মরাই ভাল। কেবল অন্যের দুঃখ নিবারিত হয় বলিয়া বলিতেছি না, কিন্তু বিধবার মরাই ভাল। তাহার মৃত্যুতেও আত্মীয় স্বজনের দুঃখ আছে, কিন্তু সে বাঁচিয়া থাকিলে যত দুঃখ, মরিলে কি তত? মৃত্যুনিবন্ধন যে দুঃখ, তাহা কালে মন্দীভূত হইয়া যায়, কিন্তু বিধবার দুঃখ নিত্য নূতন, সুতরাং যাহারা তাহার দুঃখে দুঃখী তাহাদের দুঃখও নিত্য নূতন।

আবার তাহার নিজের দুঃখ। হিন্দু বিধবার জীবন দুঃখের জীবন। আহারে বল, ব্যবহারে বল, ধর্ম্মানুষ্ঠানে বল, হিন্দুবিধবার জীবন দুঃখের জীবন। আবার, সুন্দর যায়, সৌন্দর্য্যোন্মাদ ত যায় না; প্রণয়পাত্র চক্ষের বাহির হয়, প্রণয়তৃষ্ণা ত হৃদয়ের বাহির হয় না; সুতরাং হৃদ-

she mounts that last earthly couch which she shall share with her lord. His head she places fondly on her lap. The priests set up their chaunt; it is a strnge hymeneal, and her first-born son, walking thrice round the pile, lights the flame.
H. I. Bushby's Widow-burning
London 1855.

যের জ্বালা চিরদিন হৃদয়ের ভিতর ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে। আবার দুঃখের উপর দুঃখ, স্ত্রীলোকের জন্য লজ্জার শাসন এতই কঠোর, যে বুক ফাটিয়া গেলেও মনের বেদনা মুখ ফুটিয়া বলিবার যো নাই। হৃদয়ের তাপ হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে হয়, মনের দুঃখ কেবল মন জানে, অন্তরের শ্বাস অন্তরে মিলায়, চক্ষের জল চক্ষে শুকায়,—আবার বলি, হিন্দুবিধবার জীবন বড় দুঃখের জীবন। এ দারুণ দুঃখ অপ্রতিকার্য্য, কেন না হিন্দুবালার বৈধব্য অনপনেয়। না মরিলে আর বিধবার যন্ত্রণা ফুরায় না। যে রোগের যে ঔষধ, সে রোগে তাহাই ব্যবস্থা। বিধবার মরাই ভাল।

দেখান গিয়াছে, বিধবার মৃত্যুতে সংসারের ক্ষতি নাই। দেখান গেল, বিধবার মৃত্যুতে দুঃখের হ্রাস আছে। যদি কেবল ইহাই হইত, তাহা হইলেও বিধবার মৃত্যুকে অমঙ্গল বলিতাম না। কিন্তু আরও দেখান যাইতেছে, যে সহমরণে সমাজের লাভ আছে।

স্মাইল বলিয়াছেন এবং আমরাও বলি, দৃষ্টান্তের ন্যায় উপদেষ্টা নাই। যাঁহারা বলেন,—আমি যাহা করি তাহা করিও না, আমি যাহা বলি তাহাই কর,—তাঁহারা মতিভ্রান্ত; তাঁহারা মনুষ্য চরিত্র বুঝেন না। এই পথে যাও,—এ কথায় কেহ যাইবে, কেহ যাইবে না। তুমি এই পথে যাও, আমি অন্য পথে যাইব,—এ কথায় হয় ত কেহই যাইবে না। কিন্তু, আমি পথপ্রদর্শক হইতেছি, তোমরা আমার সঙ্গে আইস, ইহা বলিলে অনেকে যাইবে। তোমার সঙ্গে সমস্ত পথ না যাইতে পারে, অনেক দূর যাইবে। অন্ততঃ কিয়দ্দূরও যাইবে। দৃষ্টান্তের ন্যায় উপদেষ্টা নাই।

আর স্বামীর জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করা, কেমন দৃষ্টান্ত। পতিবিয়োগবিধুরা সতী, পবিত্রতার, সতীত্বের, ভালবাসার, আত্মবিসর্জ্জনের, সংসারে যাহা কিছু ভাল তাহারই বীরধ্বজা স্বর্গে উড়াইয়া, গভীর অনুরাগের, উৎকট মহত্ত্বের, অপার সহিষ্ণুতার দুন্দুভিনিনাদে জগৎ ভরিয়া, জ্বলন্ত চিতারোহণ করিলেন,—এ জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত চক্ষের উপর দেখিয়া কার হৃদয় গলিবে না?—ধর্ম্মে কার মতি হইবে না?—আত্মবিসর্জ্জনের মহত্ত্ব কার হৃদয়ঙ্গম হইবে না? ধর্ম্মের পথে পাদস্খলন হইবার উপক্রম হইতেছিল, এমন অনেক রমণী ভাব ঠিক করিয়া লইয়া সেই পথে চলিবে। যাহাদের সতীত্বের গ্রন্থি শিথিল হইয়া আসিতেছিল, তাহাদের অনেকে সতীত্বের মাহাত্ম্য বুঝিবে,—পাপ পিশাচকে দূরে হইতে নমস্কার করিয়া পতিপদারবিন্দে মনস্থির করিবে। রমণীর, ধর্ম্মে আস্থা হইবে। পুরুষের, রমণীর প্রতি ভক্তি হইবে। সহমরণে সংসারের লাভ বই ক্ষতি নাই।

আর একটি কথা আছে। এ কথাটি আমরা তুলিতাম না, কিন্তু অনেক কৃত

বিদ্য লোকের মুখেও এরূপ আপত্তি শুনিয়াছি বলিয়াই এ কথার প্রসঙ্গ করা যাইতেছে। তাঁহারা বলেন যে, যাহার প্রণয় এত গভীর, যাহার সহিষ্ণুতা এমন অপার, তিনি যদি না মরিয়া আবার অভিনব বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হয়েন, তাহা হইলে জগতের আরও মঙ্গল।

ইহার উত্তরে আমরা বলি, যে আরও মঙ্গল হউক বা না হউক, তাহা দেখিবার আবশ্যক হইতেছে না, কেননা তিনি বাঁচিয়া থাকিলেই বা আর বিবাহ করিতে পাইতেন কই? বিধবার বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ।* কেবল শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও ক্ষতি ছিল না,—অশাস্ত্র অনেক প্রথা সমাজ মধ্যে প্রচলিত আছে,—কিন্তু ইহা দেশাচারবিরুদ্ধ, এবং আমরা হিন্দুসমাজের কথা বলিতেছি।

দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন অবলা, আমাদের এই এঙ্গ্লোবের্ঙ্গলের সমাজের মতানুসারে, প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর পত্যন্তর পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। যে স্থলে পুরুষের দুই বার বিবাহ হইতে পারে, সে স্থলে স্ত্রীলোকেরও হওয়া উচিত। আপনারা যে নিয়মের বাধ্য হইতে পারি না, সে নিয়মে অন্যকে বাধ্য করা অন্যায়। জানি, বুঝি, মানি; কিন্তু যখন আদৌ বিবাহই হইতে পারে না, তখন অনর্থক ধরিয়া রাখিবার ফল কি? দুঃখভোগের জন্য তাহাকে ধরিয়া রাখিবার তুমি কে? তবে যে সহমরণ প্রথার জন্য হিন্দুসমাজের এত দুর্নাম, শাস্ত্রকারদিগের এত অখ্যাতি, ইহার অর্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠা যায় না স্বীকার করি, ভারতে স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের অনেক অত্যাচার ছিল এবং আছে—কোথায় নাই?—কিন্তু সতীদাহ তাহার অন্তর্গত নহে। দুগ্ধপোষ্য বালকের সঙ্গে দুগ্ধপোষ্যা বালিকার পরিণয়, অবশ্য অত্যাচার। কুলীন কন্যার চিরকৌমার্য্য, অবশ্য অত্যাচার। মৃতভর্ত্তৃকার চিরবৈধব্য অবশ্য অত্যাচার। কিন্তু সহমরণ অত্যাচার নহে। মৃত্যুতেই যার যাতনার অবসান, মৃত্যুতেই যার শান্তি, মৃত্যু তাহার পক্ষে অমঙ্গল নহে। যে স্থলে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ, সে স্থলে সহগমনের স্বাধীনতা থাকা উচিত।

শাস্ত্র এমন নহে যে বিধবামাত্রকেই বলপূর্ব্বক পোড়াইতে হইবে। শাস্ত্র এমহ নহে যে বিধবামাত্রকেই স্বামীর মৃত দেহের সঙ্গে চিতারোহণ করিতে হইবে। যার ইচ্ছা হয়, সে মরুক;—ইহাতে অত্যাচার কি?

তবে শাস্ত্রকারদিগের কলঙ্ক এই যে, বিধিটা একতরফা করিয়াছিলেন। পরাশর যেমন লিখিয়াছিলেন, যে সহমৃতা বিধবা সাড়ে তিন কোটী বৎসর স্বর্গভোগ

* নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ ইত্যাদি—পরাশর সংহিতার এ বচন বাগদত্তা কন্যার পক্ষে, মৃতভর্ত্তৃকার পক্ষে নহে।

"ভুলো না ও কুহুস্বর,—ভুলো না আমায়।"

১

অই কুহরিল পিক ললিত উচ্ছ্বাসে।
হিম ঋতু অবসান, আকুল পাখীর প্রাণ,
হৃদয়ের বেগ তার হৃদি-তটে রয় না!—
হায়। বঙ্গহৃদি কেন অইরূপে বয় না?

২

কি কুহু ডাকিল পাখী বলিতে না পারি।
প্রকৃতি কুন্তল মাজি, নব কিসলয়ে সাজি,
হাসির তরঙ্গ তোলে, অধরেতে ধরে না!—
অমনি হাসিতে বঙ্গবাসী কেন হাসে না?

৩

শুনিতে সে মধুময় কোকিল-কাকলি
অচেত মলয় বায়, সেও রে ছুটিল হায়,
ছুটিল কুসুম রেণু, সেও ধৈর্য্য মানে না!—
অমনি আবেগ-স্রোত বঙ্গে কেন ছোটে না?

৪

তুমিও কি সরোবর অই কুহু-স্বরে
চলেছ লহরি তুলে　মুঞ্জরিত তরুমূলে,
উতলা প্রাণের কথা জানাতে তাহায়?—
বঙ্গের নাহি কি আশা জানাতে কাহায়?

৫

কল কল কল স্বরে তুমি, প্রবাহিণি,
ছুটেছ সাগর পাশে, মাতিয়া কি অই ভাষে?
বলো না লো কি আশ্বাসে, বল সে কাহিনি?-
শুনায়ে অচল বঙ্গে কর চির ঋণী?

৬

জড়ে চেতনের ভাষা বুঝিয়া চেতিল।
কি বলিছে কুহুস্বরে, কে বুঝায়ে দিবে নরে
ধরণী চঞ্চল করে' কি কথা এমন?—
বনের পাখীর স্বরে চকিত ভুবন।

৭

নাহি কি এ বঙ্গে হেন কোন প্রাণী হায়,
সঞ্চারি আশার লতা, শুনায় অমনি কথা,
অমনি নিগূঢ় ভাবে?—নাহি কি অমন
হৃদয়-ক্ষেপানো কথা কাহার(ও) গোপন?

৮

হাসি, কান্না, কি উল্লাস নাহি কিহে আর
কাহার(ও) হৃদয়মাঝে? অমনি ধ্বনিতে বাজে
বঙ্গের অন্তর ভেদি উচ্ছ্বাস তুলিয়া?—
হাসে, কাঁদে, ভাসে বঙ্গ উৎসাহে মাতিয়া।

৯

কে আছ হে কবিকুলে গভীরহৃদয়।
গাও একবার শুনি, জীবন সার্থক গুণি,
অমনি মধুর স্বরে গভীর উচ্ছ্বাস,
ঘুচায়ে এ গউড়ের প্রাণের হুতাস।

১০

উচ্চ নাদে বঙ্গপ্রাণে মিশাইয়া প্রাণ,
প্রাচীন যুবকজনে লও হে আশার বনে;
উন্মত্ত করিয়া প্রাণে কুহুক দেখাও,—
প্রভাতের জ্যোতি বঙ্গ-নিশিতে মিশাও!

১১

বধির বঙ্গের শ্রুতি শুনাও বিদারি
পরস্পরে বাধি ভর　পাষাণে পাষাণস্তর,
কিরূপে "মিশরস্তম্ভ" মিলনের জোরে
বিরাজে অনন্ত-কোলে বিনা অন্য ডোরে।

১২

ভূধর করিছে চূর্ণ সিন্ধু সলিল।
বেলাতে কিসের খেলা খেলে ঊর্মি মালা চলে
দিনে দিন, পলে পলে,— না হয়ে শিথিল,
জলে স্থলে তথা বাদে, কি গভীর মিল।

১৩

যার হৃদে বঙ্গে হেন তরঙ্গ খেলায়।
দেখাও হৃদয় খুলে   গউড় যাউক ভুলে
সে তরঙ্গ-স্রোতে মিলে ভাসুক তেমতি,
শুনে ও কোকিলধ্বনি প্রকৃতি যেমতি।

১৪

না যদি ভাসাতে পারো উৎসাহে তেমন,
হাসাও হে বঙ্গে তবে নিগূঢ় রহস্য-রবে,
বঙ্গের হৃদয়-শিরা করি উন্মোচন।—
হাসিলে পাসরে বাধা গোলামের(ও) মন।

১৫

সে রসে হাসাতে পারো হাসাও উচ্চেতে,
যেন সে হাসির সনে হাসে সবে ফুল্লাননে,
হাসে যথা কুহুস্বরে মহী পাগলিনী।—
কে জানো হে, বঙ্গকবি, গাও সে কাহিনি।

১৬

যে হাসি—মধুতে নাই রাশির আঘ্রাণ।
সৌরভে পরাণ ভরি ছোটে জীবনের তরী
যে হাসি তরঙ্গে ভাসি, কালের পাথারে;—
যে হাসি ভাসিত "রোমে" "হরেসের" তারে!

১৭

যে হাসিতে প্রভাকর উজলি গগন
প্রাবৃটের কাল ঘন   করে প্রিয় দরশন,
করে চারু গুল্ম, তরু, গহ্বর, কানন!—
তেমতি হাসিতে ফুল্ল কর বঙ্গজন।

১৮

না যদি হাসাতে পারো সে গভীর বেগে,
শুনারে করুণ রব   পরাণে কাঁদাও সব—
বঙ্গবালা, বৃদ্ধ, যুবা শিশুক কাঁদিতে।
প্রাণভরে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তুলিতে।

১৯

ভেবো না হে বঙ্গনারি নিবারি তোমায়
পাতিতে সে চারুফাঁদ-নেত্রকোলে অর্দ্ধচাঁদ
অন্য অর্দ্ধ ওষ্ঠাধরে মধুর মেশানি।—
সে হাসির অমিয়তা ভেবো না না জানি।

২০

ভেবো না তরুণ যুবা কিবা হে প্রাচীন
নিবারি তোমায় তাহা নিত্য তুমি হাসো যাহা,
যে হাসি হাসিয়া তব পরাণ যুড়াও,—
যুবতী, প্রবীণা কিম্বা কিশোরে ভুলাও।

২১

ভেবো না জানি না আমি কিবা সে মধুর
শিশুর অধরতলে   হাসির অমিয়া ছলে
চলে যাহা ধরাতলে জীবন জীয়াতে!--
ঢেলেছি সে সুধারাশি তাপিত হিয়াতে।

২২

ভেবোনা জানি না বঙ্গ কাঁদে নিরন্তর
আপন আপন তরে ক্ষুদ্র শোক তাপ ভরে
ঘরে ঘরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কত নীরহার!--
প্রচুর বঙ্গের মাঝে সে শোক সঞ্চার!

২৩

না চাহি সে কান্না, হাসি, সে উৎসব রোল!
মাদকতা নাহি তায়! বসুধায় না ঢলায়!
হৃদয়পাথার তায় উথলিত হয় না!
দেবখাতে বিনা গ্রীষ্মে স্নিগ্ধ নীর বয় না!

২৪

আমার নিঃস্রোত এই বঙ্গের হৃদয়।
হাসিতে কাঁদিতে প্রাণে গভীরতা নাহি জানে
না জানে উৎসাহ বানে প্রাণের প্রলয়।—
জগৎ ভাসানে বেগ বঙ্গেতে কোথায়?

২৫

বহে যদি সে তরঙ্গ কাহার হৃদয়ে।
গাও হে তবে সে গীত, শুনায়ে করো জীবিত
নিঃস্রোত বঙ্গের হৃদি স্রোতেতে ডুবায়ে।
রহস্য, রোদন, কিম্বা উৎসাহে ভাসায়ে।

২৬

এসো ভ্রাতঃ, কবিকুলে আছ কোন জন,
শুন হে গভীর স্বর কি ঝরিছে মনোহর
কোকিলের কুহুরবে।—অমনি কীর্ত্তন
না শিখিবে যত দিন, ছেড়োনা বাদন।

২৭

হে কামিনীকুল, মৃত বঙ্গের পীযূষ।
কর পণ শিখাবারে পতি, পুত্র, তনয়ারে
সফল করিতে এই কবির স্বপন।—
রেখো মনে দ্রৌপদীর বেণী বাঁধা পণ।

২৮

ভুলো না ও কুহুস্বর—ভুল না আমায়।
হৃদয়ে গাঁথিয়ে মালা দিলাম বৈশাখী ডালা
বাসি বলে অনাঘ্রাত ফেলো না ইহায়।—
হায় রে নবীন দাম বঙ্গেতে কোথায়?

২৯

হে বঙ্গদর্শনপ্রিয় ভামিনী সতের।
কারে সম্বোধিব আর লইতে এ উপহার?
বাঁকা চাঁদ আঁকা যার হৃদয় বাকায়,
সমর্পি তাঁহার(ই) করে তুলিয়া মাথায়।—
ভুলো না ও কুহুস্বর— ভুলো না আমায়।

সভ্যতা।

আজি কালি যেখানে সেখানে সভ্যতা শব্দটী লইয়া বিলক্ষণ টানাটানি পড়ে। চলিত কথাবার্ত্তায়, সাময়িক পত্রিকায়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশে, রাজনৈতিক বক্তৃতায়, ঐতিহাসিক বা দার্শনিক প্রবন্ধে, ও বহুবিধ মুদ্রিত গ্রন্থে সভ্যতা শব্দের ছড়াছড়ি। ইহাতে মনে হইতে পারে যে সভ্যতা কাহাকে বলে আমরা বেশ বুঝি। কিন্তু সভ্যতার লক্ষণ কি জিজ্ঞাসা করিলে দেখিবে অনেকেই সদুত্তর দিতে পারেন না, আর ভিন্ন ভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ কেহ ভাবেন যে প্রাচীন ভারতবাসীরা সভ্যতার চরমসোপানে উঠিয়াছিলেন, কেহ কেহ বলেন ইংরেজেরাই সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। কেহ আমাদিগের আচার ব্যবহার সভ্যসমাজের উপযোগী জ্ঞান করেন, কেহ ইংরেজদিগের রীতি নীতির পক্ষপাতী। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে ইংরেজদিগের অনুকরণে

আমাদিগের অবনতি হইবে, কেহ কেহ বা ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হন যে আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বুঝিতে শিখিয়াছি, অথচ মাদুরে বসি, হাত দিয়া আহার করি, সর্ব্বদা গায়ে বস্ত্র রাখি না, ও মৃণ্ময় দীপের আলোকে লেখা পড়া করি।* শেষোক্ত ব্যক্তিবর্গের কথা শুনিয়া বোধ হয়, তাঁহারা কলিকাতার লালবাজারের মদোন্মত্ত বর্ণজ্ঞানশূন্য গোরাকেও সভ্য বলিতে প্রস্তুত; কিন্তু ধুতীচাদরপরা নিরামিষভোজী নির্ম্মল জলপায়ী সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকেও অসভ্য শ্রেণীতে স্থান দিতে চাহেন।

সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদিগের মধ্যে এরূপ মত ভেদ হইবার প্রথম কারণ এই যে আমরা এক্ষণে দুইটী প্রতিকূল স্রোতের মাঝে পড়িয়াছি, (১) দেশীয় শিক্ষা এবং (২) বিলাতী শিক্ষা। দেশীয় শিক্ষা আমাদিগকে একদিকে লইয়া যাইতেছে, বিলাতী শিক্ষা আর এক দিকে। দেশীয় শিক্ষা আমাদিগকে বলিতেছে যে এতদ্দেশীয় প্রাচীন রীতিনীতি, চিরাগত আচার ব্যবহার ও কর্ম্মকাণ্ড উত্তম। বিলাতী শিক্ষা পদে পদে তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করিতেছে এবং তাহাদিগের অপেক্ষা ভাল বলিয়া পাশ্চাত্য রীতি নীতি, আচার ব্যবহার ও কর্ম্মকাণ্ড আমাদিগের সম্মুখে আদর্শস্বরূপ ধরিতেছে। দেশীয় শিক্ষা বলিতেছে যে ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন মহিমা পুরাতন প্রণালী-সম্ভূত। বিলাতী শিক্ষা বলিতেছে যে পুরাতন পথ পরিত্যাগ না করিয়াই ভারতবর্ষ অধঃপাতে গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ইহা আশ্চর্য্য নহে যে কেহ দেশীয় স্রোতে, কেহ বা বিলাতী স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, এবং কেহ দোটানায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন।

সভ্যতা সম্বন্ধে মতভেদ হইবার দ্বিতীয় কারণ এই যে গূঢ়ভাবব্যঞ্জক বা বহুগুণ বাচক কথা শুনিয়া প্রায়ই মানসপটে তদনুযায়ী একটী স্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি উদিত হয় না; সুতরাং কথাটী সঙ্গতরূপে ব্যবহৃত হইল কি না অনেক সময়ে আমরা বুঝিতে পারি না। এই কারণেই অনেক সময়ে বড় বড় কথায় লোক ভুলাইয়া থাকে। এই কারণেই অনেক সময়ে পবিত্র "ধর্ম্মের" নামে ভূমণ্ডল শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে। এই কারণেই অনেক সময়ে "স্বাধীনতার" পতাকা উড়াইয়া স্বেচ্ছাচারিতা ফ্রান্স প্রভৃতি কতদেশে রাজত্ব করিয়াছে। এই কারণেই অনেক সময়ে অসভ্য জাতিদিগকে "সভ্য" করিবার ছলে তাহাদিগকে নির্ম্মূল বা দাসত্ব-শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছে।

---

* "It is curious to reflect that the most learned works on European literature and science should be studied and appreciated by the student who sits on a mat, eats with his figers, does not think it neccessary to cover his body, and reads under the light of the primitive earthen lamp"—Mr. Manomohun Ghose on English Education.

ন্যায, অন্যায়, সত্য, মিথ্যা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, প্রভৃতি বড় বড় কথার অর্থ যে অধিকাংশ লোকেই ভাল করিয়া বুঝে না, ইহা ইউনানী পণ্ডিতকুলচূড়ামণি সক্রেতিস্ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। যদি তিনি ভূমণ্ডলে পুনরাগমন করিতে পারিতেন, তিনি দেখিতে পাইতেন যে দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে আথেন্স মহানগরীতে লোকে অর্থ না বুঝিযা যেরূপ শব্দ প্রয়োগ করিত, এই উন্নতিগর্ব্বিত ঊনবিংশতি শতাব্দীতেও সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিবর্গও সেই রূপ করিয়া থাকেন।

কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তাহার অর্থের আভাস কিযৎ পরিমাণে পাওয়া যায়। ব্যুৎপত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই জানা যায় যে "পক্ষী" শব্দে পক্ষবিশিষ্ট জীব বুঝায় এবং "উরগ" বলিতে বুকের উপর ভর দিয়া চলে এমন কোন জন্তু বুঝায়। এই প্রণালীতে "সভ্যতা" শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে দেখা যাইতেছে যে সমাজ বাচক "সভা" শব্দ হইতে সভ্যতা শব্দের উৎপত্তি; সুতরাং সভ্যতা শব্দের অর্থ সামাজিকতা হইতেছে, অর্থাৎ সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলে, যাহা কিছু তদবস্থার উপযোগী, তাহাই সভ্যতার অঙ্গ স্বরূপ বলিয়া গণনীয় হইতেছে।

কিন্তু কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া অনেক সময়ে তাহার প্রচলিত অর্থ জানিতে পারা যায় না। ব্যুৎপত্তি দেখিয়া জানা যায় যে "তৈল" বলিতে প্রথমে তিলের নির্য্যাস বুঝাইত; কিন্তু এক্ষণে আমরা সরিষার তৈল, বাদামের তৈল, মাস তৈল, ইত্যাকার অনেক প্রকার কথা ব্যবহার করিয়া থাকি। সুতরাং প্রচলিত প্রয়োগে তৈল বলিতে কেবল তিলের নির্য্যাস না বুঝাইয়া নানা প্রকার নির্য্যাস বুঝাইতেছে। এই রূপ ব্যুৎপত্তি ধরিতে গেলে "অম্লজান" শব্দে যে বায়ুর সংযোগে অম্ল উৎপাদিত হয় সেই বায়ুকে বুঝায়। আদৌ রসায়নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই অর্থেই "অম্লজান" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে যে এমন অনেক অম্ল আছে যাহাতে উক্ত অম্লজান বায়ু নাই। সুতরাং এখন আর ব্যুৎপত্তি দেখিয়া "অম্লজান" শব্দের প্রচলিত অর্থ জানা যায় না। এই প্রকার দোহনবোধক দুহ ধাতু হইতে দুহিতা শব্দের উৎপত্তি; কিন্তু এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, গৃহে গাভীদোহন যাহার কার্য্য সে দুহিতা নহে। ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে পালন করে সেই পিতা। এরূপ হইলে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ বহু সন্তান সত্ত্বেও পিতা নামের অধিকারী নহেন।

এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপ স্থলে সভ্য ও অসভ্য শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়া থাকে। যাহাদিগকে আমরা অসভ্যজাতি বলি তাহাদিগের সহিত যদি আমরা সভ্যনামপ্রাপ্ত জাতিদিগের তুলনা করি, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে অসভ্যজাতি বিচ্ছিন্নভাবে ভ্রমণশীল অল্পসংখ্যক লোকের

সমষ্টি, সভ্যজাতিগণ বহুসংখ্যক লোকে একত্রিত হইয়া গ্রামে ও নগরে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে অবস্থিতি করেন। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসায় প্রায় নাই বলিলেই হয়; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসায়ের বাহুল্য। অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই স্ব স্ব প্রধান, কদাচিৎ যুদ্ধোপলক্ষ ব্যতিরেকে অনেকে সমবেত হইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, এবং অনেকে একত্র হইয়া থাকিতেও ভাল বাসে না; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে আসঙ্গলিপ্সাপ্রবৃত্তি বলবতী, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য অপেক্ষা করে, এবং সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনার্থে অনেকে সমবেত হইয়া থাকে। অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে আত্মরক্ষা জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রায় কেবল স্বীয় ছল বলের উপর নির্ভর রাখিতে হয়, এবং প্রত্যেকের সত্ত্বরক্ষাজন্য আইন, আদালত বা রাজশাসন নাই; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে স্ব স্ব শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার্থে লোকে আপন আপন শক্তি অপেক্ষা সামাজিক শাসনের সহায়তা অবলম্বন করে।

পৃথিবীতে এমন অসভ্যজাতি অল্প, যাহাদিগের মধ্যে সমাজবন্ধনের সূত্রপাত মাত্র হয় নাই; এবং অদ্যাপি ভূমণ্ডলে এমন কোন জাতীয় লোক দৃষ্ট হয় না, যাঁহারা সামাজিক অবস্থার সর্ব্বোচ্চসোপানে আরোহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা এক প্রকার বলা যাইতে পারে যে সামাজিক ভাবের তারতম্যানুসারেই অনেক পরিমাণে সভ্যতার তারতম্য নির্দ্ধারিত হয়। এই সামাজিক ভাব বলিতে কি বুঝায় একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথমতঃ সমাজান্তর্গত ব্যক্তিবর্গকে এক শাসনসূত্রে আবদ্ধ রাখিতে পারে, এমন একটি নিয়ন্ত্রী শক্তি চাই। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যাহাতে একের সুখ, তাহাতে অন্যের দুঃখ। এই রূপ সাংসারিক স্বার্থবিরোধে সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সকলের বিবাদভঞ্জন করিতে পারে, সকলের উপর আদেশ চালাইতে পারে এবং কাহাকে আজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ দেখিলে উপযুক্ত দণ্ড দিতে পারে, কোন স্থলে এরূপ ক্ষমতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সমাজবন্ধনের মূলে রাজার হস্তেই ঈদৃশ ক্ষমতা থাকে। কিন্তু যত সামাজিক উন্নতি হইতে থাকে, তত ধর্ম্ম, রীতি ও নীতি সম্বন্ধীয় শাসনশক্তি লোক সাধারণের হস্তে যায়; এবং পরিশেষে প্রজাতন্ত্রপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া সর্ব্বপ্রকৃতিমণ্ডলী-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের প্রতি সমাজরক্ষার ভার অর্পিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ সমাজমধ্যে কার্য্য-বিভাগ আবশ্যক। অসভ্যাবস্থায় লোকে পরস্পরের মুখাপেক্ষী নহে; প্রত্যেক ব্যক্তিই আপনার প্রয়োজন মত সমুদয় কার্য্য করে। একই ব্যক্তি সূত্রধার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মৎস্যজীবী, শিকারী, গৃহনির্ম্মাতা, ইত্যাদি। ইহাতে কোন

কাজই সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না, কোন দিকেই উন্নতি হয় না। যদি ভিন্ন ভিন্ন লোকের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য পড়ে, প্রত্যেকেই আপন আপন কর্ম্মের প্রতি বিশেষরূপ মনোযোগ দিতে পারে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে দক্ষতা ও কৌশল দেখাইতে এবং উৎকর্ষলাভ করিতে পারে। এইরূপে পরস্পরসাপেক্ষতাগুণে কার্য্যবিভাগদ্বারা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের উপকার সাধিত হয়। অতি প্রাচীন কালেই সামাজিক কার্য্যবিভাগপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ও মিসরে এই রূপে জাতিশ্রেণী সংস্থাপিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়। ব্রাহ্মণ বা যাজকগণ জ্ঞান ও ধর্ম্মের চর্চ্চা করিবেন। ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধা দেশ রক্ষা করিবেন। বৈশ্য বা বণিক্ বাণিজ্য ও কৃষির প্রতি মনোযোগ দিবেন। শূদ্র বা দাস অন্যশ্রেণীর লোকের সেবা শুশ্রূষা করিবেন। কিন্তু এগুলিও কেবল মোটামোটি বিভাগ। ভারতবর্ষে যে সকল বর্ণসঙ্কর জন্মিল, তাহাদিগেরও পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট হইল। বৈদ্য চিকিৎসক, নাপিত ক্ষৌরকর্ম্মকার, তন্তুবায় বস্ত্রবয়নব্যবসায়ী, ইত্যাদি। এ প্রকার নিয়মে প্রথমে বিশেষ উপকার হয়। যে যাহা শিখিত আপন সন্তান সন্ততিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক শিখাইত। ইহাতে এক এক বংশের এক এক বিষয়ে দক্ষতা বাড়িয়া যায়। কিন্তু যখন শ্রেণীবন্ধন এরূপ পাকাপাকি হইয়া গেল যে এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীতে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা থাকিল না, তখন তিনটি অপকার ঘটিল, (১) সাধারণ সমাজ অপেক্ষা আপন শ্রেণীর স্বার্থের দিকে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকতর দৃষ্টি হইল; (২) অন্যশ্রেণীর সহিত বিবাহবন্ধন রহিত হওয়ায় কোন শ্রেণীতে নূতন বল বা প্রতিভা প্রবিষ্ট হইবার পথ রুদ্ধ হইল, (৩) যে ব্যক্তি স্বশ্রেণীর ব্যবসায় ছাড়িয়া অন্য শ্রেণীর ব্যবসায় অবলম্বন করিলে সমাজের উন্নতি করিতে পারিত, তাহার পায়ে শৃঙ্খল পড়িল। এই রূপে যে সামাজিক পরস্পর সাপেক্ষতার গুণে কার্য্য বিভাগ প্রণালীর সৃষ্টি, পরিণামে তাহারই মূলে কুঠারাঘাত হইল। ঈদৃশ গৃহবিচ্ছেদপূর্ণ সমাজ যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। ভারতবর্ষ এবং মিসরই ইহার সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল।

তৃতীয়তঃ সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলে, পরস্পরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থে একটী সাধারণ ভাষা থাকা আবশ্যক। যে ব্যক্তি একাকী বনে বনে ভ্রমণ করে, তরুলতা পশুপক্ষী যাহার সহচর, ভাষায় তাহার প্রয়োজন নাই। কোকিলের কূজন শুনিয়া সে আনন্দে কুহুরব করে, করুক। নিঃশব্দে বাসন্ত-বিহগের গীত শ্রবণ করিলেও তাহার ক্ষতি নাই। সমীরণপ্রভাবে মহীরুহ ব্যূহের স্বনন শুনিয়া তদনুকরণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয়, হউক। নীরব ভা

রুক হইলেও তাহার হানি নাই। কিন্তু মনুষ্যসমাজে বাক্যালাপ না করিলে চলে না। পদে পদে অন্যের সাহায্য লইতে হয়। যাহা মনে আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিলে কিরূপে সাহায্য মিলিবে? যে যে বস্তুতে যাহার প্রয়োজন আছে, সে সে বস্তুর অক্ষয় ভাণ্ডার তাহার থাকা অসম্ভব। সুতরাং অন্যের নিকটে অভাবপূরণার্থে মনের কথা বলিতে হয়। আবার ভাবিয়া দেখ, আমরা অন্যের নিকটে অনেক সময়ে উৎসাহ, প্রণয়, প্রশংসা চাই, বাক্যদ্বারাই এ সকল ভাল করিয়া ব্যক্ত হয়। যদি অন্য লোককে আপন মতে আনিতে চাই, তাহা হইলেও ভাষাই আমাদিগের প্রধান সম্বল। সাঙ্কেতিক অঙ্গসঞ্চালনদ্বারা কিয়ৎপরিমাণে মনের ভাব অপর লোকের নিকটে প্রকাশ করা যায়, সত্য। কিন্তু এরূপ সঙ্কেত অতি অল্প বিষয়েই খাটে। ভাষার সাহায্যে মনের ভাব যে প্রকার পরিস্ফুটরূপে বিজ্ঞাপিত হইতে পারে, সে প্রকার আর কিছুতেই হয় না। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিকাশ হইতে থাকে, এবং ভাষার সাহায্যে আবিষ্কৃত সত্য সকল উত্তরকালবর্ত্তী লোকের জ্ঞানগোচর হইয়া সামাজিক উন্নতি সংসাধন করে।

চতুর্থতঃ সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পরস্পরের প্রতি ক্ষমা ও দয়া প্রকাশ করা অভ্যাস চাই। অন্যের দোষমার্জ্জনা করিতে শিক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম। কিন্তু অনেকে একত্র থাকিতে হইলে অনেক অপরাধ সহ্য করা আবশ্যক হইয়া উঠে। এই প্রকার শিক্ষার অভাবে আফগানস্থান প্রভৃতি দেশে অতি সামান্য কারণে নরহত্যা হয়। দোষীকে ক্ষমা করা যেরূপ একটি সামাজিক গুণ, বিপন্নকে সাহায্য করাও তদ্রূপ আর একটি। ঘটনাসূত্রে কত লোক বিপত্তিজালে নিরন্তর আবদ্ধ হয়, সদয় হইয়া তাহাদিগের মুক্তিসাধনার্থে যত্নশীল হইলেই সামাজিক পরস্পর সাপেক্ষতানুযায়ী কার্য্য করা হয়। এই প্রকার সহায়তা লাভ প্রত্যাশাই সমাজবন্ধনের মূল।

পঞ্চমতঃ সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একতা চাই, একজনের বা এক অঙ্গের দুঃখে অন্য সকলের দুঃখিত হওয়া চাই, এবং সমাজরক্ষাজন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতে সকলেরই প্রস্তুত হওয়া চাই। এরূপ যেখানে নাই, সমাজ বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে না। গ্রীস ও রোমে বহুসংখ্যক দাস ছিল। দাসদিগের দুঃখে রাজপুরুষদিগের দুঃখ হইত না, সুতরাং সমাজরক্ষা করিতেও দাসদিগের প্রবৃত্তি ছিল না। আমাদিগের বিবেচনায় ইহাই গ্রীস ও রোমের পতনের প্রধান কারণ। আর আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভারতবর্ষ ও মিসরে জাতিভেদ সংস্থাপননিবন্ধন একতাহ্রাস তত্তদ্দেশের স্বাতন্ত্র্যবিলোপের মুখ্য হেতু।

কোন জাতিই অদ্যাপি সামাজিক অবস্থার চরমসোপানে উঠিতে পারে

নাই। উক্ত সোপানে উঠিলে, সমাজের নূতন আকার হইবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই পরোপকারার্থ জীবন ধারণ করিবেন, আত্মস্বার্থবিস্মৃত হইয়া অপর মানবগণের মঙ্গলসাধনকার্য্যে দেহ মন সমর্পণ করিবেন। তখন স্বার্থপরতা ও পরশ্রীকাতরতা কোথাও থাকিবে না, সর্ব্বত্র ন্যায়পরতা, সত্যনিষ্ঠা ও উপচিকীর্ষা বিরাজমান দৃষ্ট হইবে। কবিগণ কল্পনাপথে এই স্বর্ণযুগ দর্শন করিয়াছেন। খৃষ্টভক্ত দূরে এই "মিলিনিয়ম" দেখেন, দেখেন যে সমুদয় মনুষ্যজাতি ঈশার প্রেমময় রাজ্যে এক পরিবারভুক্ত হইয়াছে এবং অস্ত্র শস্ত্র ভাঙ্গিয়া হল প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্দেশীয় শাস্ত্রকারগণ দিব্যচক্ষে কলির অবসানে এই প্রকারে সত্যযুগের আবির্ভাব দেখিতে পান। দর্শনবিৎ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া অনুমান করেন যে সমাজের উন্নতিসহকারে সর্ব্বহিতকরী নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তিনিচয় নৈসর্গিকনির্ব্বাচন প্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়া এইরূপ সুখময় সময় উপস্থিত করিবে। কিন্তু এখনও এ সকল বহুদূরের কথা; স্বপ্নবৎ বা আরব্যোপন্যাসবৎ মিথ্যা না হউক, দূরবর্ত্তী নীহারিকাবৎ সামান্য দৃষ্টিপথের অতীত। এখনও সংসার স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ। তথাপি যখন মনে হয় যে এখনকার সুসভ্য ভদ্রলোক হয় ত নরমাংসভোজী রাক্ষসের বংশধর এবং এই মানবকুলে বুদ্ধ ও ঈশা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন চিত্তে আশার সঞ্চার হয়, এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্ববিমোহন বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয়।

কিন্তু মনুষ্যের সভ্যতা বলিতে কেবল সামাজিকতা, অর্থাৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহার ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে উন্নতি মাত্র বুঝায় না. যে জ্ঞানের প্রভাবে মনুষ্য জীবকুলশ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞানের উন্নতিও বুঝায়। জ্ঞানোন্নতির ফল দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, ইত্যাদি, এ সকল কি গ্রীস, কি ইতালী, কি ভারতবর্ষ, কি চীন, কি মীসর, কি কাল্ডিয়া,—কি ফ্রান্স, কি জর্ম্মণী, কি ইংলণ্ড, কি আমেরিকা, যেখানে দৃষ্ট হউক, সেখানেই আমরা সভ্যতার আবির্ভাব স্বীকার করিব। বাল্মীকি, হোমার বা সেক্সপিয়র, —গৌতম, আরিস্ততল্, বা বেকন,—আর্য্যভট্ট, টলেমি, বা নিউটন,—যেখানে সমুদিত, সেখানে সভ্যতা সপ্রমাণ করিতে অন্য সাক্ষী চাই না।

সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত গিজো বুঝিয়াছিলেন যে সভ্যতা বলিতে কেবল "সামাজিক সম্বন্ধ বর্দ্ধনই" বুঝায় না, মনুষ্যের উৎকৃষ্টবৃত্তি সকলের উন্নতিসাধনও বুঝায়। সমাজ অসম্পূর্ণ হইলেও যে সকল দেশ সভ্য বলিয়া পরিগণিত, তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন,

"যদিও সমাজ অন্যস্থানের অপেক্ষা অসম্পূর্ণ, তথাপি মনুষ্যত্ব অধিকতর

মহিমা ও প্রভাব সহকারে বিরাজমান। অনেক সামাজিক অধিকার বিস্তার বাকি আছে, কিন্তু আশ্চর্য্যরূপ নৈতিক ও বৌদ্ধিক অধিকার বিস্তার ঘটিয়াছে; বহুসংখ্যক লোকের অনেক অধিকার ও স্বত্ব নাই, কিন্তু অনেক বড় লোক জগতের নয়নপথে জাজ্বল্যমান বিরাজিত। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও শিল্প তাহাদিগের প্রভাবিকাশ করিতেছে। যেখানে মনুষ্য জাতি মানবপ্রকৃতির ঈদৃশ মহিমাপ্রদ এই সকল মূর্ত্তির সমুজ্জ্বল আবির্ভাব দর্শন করে, যেখানে এই সকল উন্নতিপ্রদ আনন্দের ভাণ্ডার দেখিতে পায়, সেইখানেই সভ্যতার পরিচয় পাইয়া তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করে।"*

মনুষ্য সভ্যতাবর্ত্মে যত অগ্রসর হইতেছে, ততই প্রকৃতিকে স্বীয় করতলস্থ করিতে পারিতেছে। মনুষ্যের যত জ্ঞান ও একতার বৃদ্ধি হইতেছে, ততই জগতের উপর তাহার কর্তৃত্ব বাড়িতেছে। যে সকল নৈসর্গিক শক্তির সম্মুখে মূর্খ অসভ্যজাতি ভীত ও হতবুদ্ধি, বিদ্যালোকসম্পন্ন সভ্যজাতি বিজ্ঞান ও একতার বলে সে সকল শক্তিকে বশীভূত করিতে পারিতেছেন। সকৌশল ও সমবেত মানবচেষ্টায় হলণ্ডের ন্যায় নিম্ন দেশ সমুদ্রগ্রাস হইতে রক্ষিত হইয়া মনুষ্যের আবাসভূমি হইয়াছে, বালুকাময় সুয়েজ যোজক বাণিজ্যসুগমতাসম্পাদক পয়ঃপ্রণালীতে পরিণত হইয়াছে, এবং দুর্ল্লংঘ্য আল্পস্ পর্ব্বত দ্বারবিশিষ্ট প্রাচীররূপ ধারণ করিয়াছে। দুস্তর জলনিধি উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তারিত করিয়া যে সকল জাতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারা জলযাননির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করে। পুরাকালের অগ্নিদেব এখন মনুষ্যের পাচক ও যানবাহক, বায়ুদেব যন্ত্রপেষক ও যানবাহক, সূর্য্যদেব চিত্রকর, এবং দেবরাজ ইন্দ্রের বিদ্যুৎ সংবাদতরঙ্গবাহিনী দাসী। কবি কল্পনা করিয়াছিলেন যে বরুণ, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ রাবণের প্রতাপে তাহার সেবা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মনুষ্যের জ্ঞানপ্রভাবে দিক্‌পালদল সত্য সত্যই তাঁহার সেবা করিতেছে।

প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক বাকল সাহেব বিবেচনা করেন যে ইউরোপখণ্ডের বাহিরে যে সকল প্রদেশ সভ্য হইয়াছে, সে সকল প্রদেশে মনুষ্য বাহ্য জগতের কর্ত্তা না হইয়া তাহার অধীন ছিল। ভারতবর্ষ ও চীনের সামাজিক অবস্থা বহুকাল একরূপ আছে, এবং এসিয়া ও আফ্রিকার অনেকস্থল হইতে সভ্যতা অন্তর্হিত হইয়াছে, সত্য; কিন্তু ইহা হইতে এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ দেখা যায় না যে ইউরোপীয় সভ্যতা ও অন্যস্থলের সভ্যতা এই উভয়ের মধ্যে কোনপ্রকার প্রকৃতিগত বিচ্ছেদ আছে।

* Guizot's Civilization in Europe.

যে হিন্দুরা ইলোরার পর্ব্বত কাটিয়া স্বর্গোপম কৈলাসসমন্বিত গিরিগহ্বরমালা প্রস্তুত করেন, যাঁহারা সঙ্কটসঙ্কুল সমুদ্র পার হইয়া সিংহল, বালি, যবদ্বীপ প্রভৃতি,স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, যাঁহারা জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার অনেক উন্নতিসাধন করেন, যাহারা এই বিশ্বমণ্ডলের সৃষ্টিসম্বন্ধে নানাপ্রকার মত উদ্ভাবন করেন, তাঁহারা যে নৈসর্গিক শক্তি দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া তদনুবর্ত্তী হইতেন, এমন বোধ হয় না; বরং ঋষিদিগের মধ্যে জগদ্বশীকরণের ইচ্ছা প্রবল দেখা যায়। এতদ্দেশে এবং চীনে সামাজিক অবস্থা বহুকাল একরূপ থাকিবার কারণ বোধ হয় এই; যৎকালে ভারতবর্ষের ও চীনের লোকেরা সভ্য হন, তৎকালে পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহের অধিবাসীরা এত অসভ্য ছিল,যে তাহাদিগের সহিত তুলনায় স্বদেশপ্রচলিত মত ও অনুষ্ঠান গুলির প্রতি তাঁহাদিগের অতিশয় ভক্তি জন্মিয়াছিল, এবং এই নিমিত্তই বহুকাল তাঁহারা আপনাদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হন নাই। কোন কোন রাজ্য বা জাতির পতন সংঘটনদ্বারা এসিয়া ও আফ্রিকার অনেক স্থানে সভ্যতার তিরোভাব বা হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু এরূপ বিপ্লব প্রায় সামাজিক কারণের ফল। প্রাচীন রাজ্যমাত্রেই বহুসংখ্যক দাস ছিল। যাঁহাদিগের হাতে আধিপত্য ছিল, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক। এই উভয়ের মধ্যে পীড়িত ও পীড়ক প্রায় সর্ব্বত্রই এই সম্বন্ধ ছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে যেখানে এপ্রকার গৃহবিচ্ছেদ সেখানে সমাজ স্থায়ী হইতে পারে না। ঈদৃশ অবস্থার বিষময় ফল সর্ব্বত্রই ফলিবে, ইউরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকা যেখানেই হউক না কেন। যেমন আফ্রিকায় মিসরের, এসিয়ায় ব্যাবিলন প্রভৃতির, তেমনই ইউরোপে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের পতন ঘটিয়াছে। সত্য বটে, গ্রীস ও রোম পৃথিবীর অনেক উপকার করিয়া গিয়াছে। রোম তাহার আইন,গ্রীস তাহার বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ও সাহিত্য জগতের মঙ্গল সাধনার্থে রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষ তাহাদিগের অপেক্ষা কম নহে। ভারতবর্ষ প্রেমময় বৌদ্ধধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতবর্ষ আরবদিগকে দিয়া স্বীয় পাটীগণিত,বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ও রসায়ন ইউরোপ খণ্ডে পাঠাইয়া তথাকার বৈজ্ঞানিক উন্নতির পথ খুলিয়া দিয়াছে; এবং ভারতবর্ষীয় বৈয়াকরণদিগের গবেষণা অবলম্বন করিয়াই ভাষা তত্ত্ববিদ্যার মূল পত্তন হইয়াছে।

বস্তুতঃ প্রকৃতির শক্তি, আদৌ প্রবল হইলেও সভ্যতাবৃদ্ধি সহকারে ক্রমশঃ কমিয়া যায়, যদিও উহা একেবারে শূন্যবৎ বা অগ্রাহ্য হইবার নহে। আদিম মনুষ্য, নিকৃষ্টজীবগণের ন্যায়, নৈসর্গিক নির্ব্বাচন স্রোতের বশবর্ত্তী ছিলেন। সেই আদিমকালীন পিতৃগণ কিরূপে অগ্নি উৎপাদন করিতে হয় এবং তাহা কি কাজে

লাগে কিছুই জানিতেন না। তাঁহাদিগের দেহ আবরণ করিবার বস্ত্র ছিল না; এবং আশ্রয় লইবার আবাসগৃহ ছিল না। তাঁহারা যখন যেখানে থাকিতেন, তখন তত্রত্য স্বভাবজ ফল মূল আহরণ ও বন্যজীব হনন করিয়া প্রাণধারণ করিতেন। তাঁহাদিগের ধাতুনির্ম্মিত কোন অস্ত্র ছিল না, এবং তাহারা কৃষিকার্য্যের কিছুই বুঝিতেন না। তাঁহাদিগকে সাহায্য করে এমন কোন সামাজিক সহযোগী বা পালিত জন্তু ছিল না। তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন উন্নতভাষার অভাবে ততটুকু অন্যকে দিয়া যাইতে পারিতেন না। ঈদৃশ অসভ্যব্যক্তিগণ যে আপনাদিগের সম্বন্ধে বাহ্যশক্তির কার্য্য পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইতেন, এমন বোধ হয় না। এই নিমিত্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তের সহিত তাঁহাদিগের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইত। পরিণামবাদী উয়ালেস্‌ সাহেব অনুমান করেন যে এই রূপেই বিভিন্নলক্ষণাক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়। যে সময় হইতে মনুষ্যগণ অগ্নি, বস্ত্র, গৃহ, খাদ্য, প্রভৃতির গুণ অবগত হইয়া তৎসাহায্যে বহির্জগতের প্রভাব হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়া যে সে মণ্ডলে বাস করিতে শিখিল, সেই সময় হইতে এই সকল জাতীয় লক্ষণের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এই কারণেই তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিসরের অট্টালিকায় যে সকল জাতির মূর্ত্তি ক্ষোদিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে অদ্যাপি চিনা যায়। আমাদিগের বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টিই প্রকৃতির সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। এতদ্দ্বারাই প্রকৃষ্টরূপে ঐতিহাসিক প্রবাহের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়াছে। যদি সিন্ধুনদতীরে বা গ্রীস দেশে কাফ্রিজাতি বাস করিত, তাহারা যে আর্য্যজাতির ন্যায় সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারিত, এরূপ প্রত্যয় হয় না। উৎকৃষ্ট লক্ষণাক্রান্ত জাতিসৃষ্টিব্যতীত, সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রকৃতি আর এক দিকে অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। লোকে অবসর না পাইলে মানসিক উন্নতি করিতে পারে না, এবং যেখানে স্বভাবতঃ ভূমি এত উর্ব্বরা যে অল্প পরিশ্রমেই পর্য্যাপ্ত আহার্য্য উৎপন্ন হয়, সেখানে সহজেই অবসর মিলে। এই কারণেই অতি প্রাচীনকালে নীল, ইউফ্রেতিস্‌ ও সিন্ধুনদের তীরে সভ্যতার আবির্ভাব। কিন্তু যদিও এইরূপে বাহ্যবস্তুর প্রভাব সভ্যতার উদয়ের সহায় হইয়া থাকে, তথাপি লোকে যে পরিমাণে জগতের ও সমাজের নিয়ম অবগত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিতে শিখে, সেই পরিমাণে আপনাদিগের অবস্থা উন্নত করিয়া সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে।

আমরা দেখিয়াছি যে সভ্যতার ত্রিবিধ মূর্ত্তি, সামাজিক বা নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, ও বাহ্যিক। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সহিত আমাদিগের যে প্রকার সম্বন্ধ, বহির্জগৎ ও

অন্তর্জগতের বিষয়ে আমাদিগের যে প্রকার জ্ঞান, নৈসর্গিক শক্তিনিচয়ের উপর আমাদিগের যে প্রকার কর্ত্তৃত্ব, তদ্দ্বারাই আমাদিগের সভ্যতার পরিমাণ নির্ণীত হয়। ধর্ম্মের মহৎক্রিয়া, বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী, ও শিল্পের অধিকার বিস্তার, এ সকল সভ্যতার উন্নতিনির্ণয়ের ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড স্বরূপ। কিন্তু আমরা যে পরিমাণে প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালী জানিতে পারি, সেই পরিমাণেই আমরা তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন করিতে পারি। আমাদিগের সামাজিক কার্য্যও বিশ্বাসের অনুগত এবং নূতন কিছু না জানিলেও বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হয় না। সুতরাং বাহ্যজগতের উপর কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নতি উভয়ই জ্ঞানোন্নতি সাপেক্ষ। এই নিমিত্ত যাঁহারা কোন দেশে সভ্যতাবৃদ্ধি করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য যে সেই দেশের জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে যত্নবান্ হন।

আদিম মনুষ্য যে ঘোর অসভ্য ছিল, ইহা কেহ কেহ স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক কয়েকখানির আশ্রয় লইয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে মনুষ্যের ক্রমশঃ উন্নতি না হইয়া অবনতি হইয়াছে। তাঁহারা হিন্দুদিগের "সত্যযুগের," গ্রীক্‌দিগের "স্বর্গযুগের," এবং য়ীহুদীদিগের "নন্দনোদ্যানের" উল্লেখ করিয়া আপনাদিগের মত সমর্থন করিতে চাহেন। এ প্রকার তর্ক সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে পূর্ব্বকালীন হিন্দু, গ্রীক ও য়ীহুদীদিগের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সত্য; কিন্তু বোধ হয় আদিমকালের প্রকৃত ইতিবৃত্তের অভাবে অনুমানের সাহায্যে অতীতের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে গিয়া তাঁহারা বৃদ্ধবয়সের বিজ্ঞতা ও তপস্বীভাব প্রাচীনকালের প্রতি আরোপ করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ মনোযোগপূর্ব্বক ইতিহাস পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে যে ভারতবর্ষ, চীন, মিসর, আসিরিয়া, গ্রীস, ইতালী, প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্য জাতিগণ অপেক্ষাকৃত অসভ্যাবস্থা হইতে ক্রমশঃ আপন আপন সভ্যতার সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যজাতিগণের ইতিবৃত্তও এই প্রকার। অদ্যাপি পৃথিবীতে এমন অসভ্য জাতি আছে, যাহারা এখনও প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করে, যাহারা এখনও অগ্নির প্রয়োগ শিখিতে পারে নাই, এবং যাহারা এখনও বিবাহ বন্ধন জানে না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা দেখাইতেছে যে মনুষ্য প্রথমে প্রস্তরাস্ত্র, পরে তাম্র, পিত্তল বা কাংশ্যনির্ম্মিত অস্ত্র, এবং পরিশেষে লৌহ অস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদ্যাও ক্রমোন্নতির সাক্ষ্য প্রদান করে। যে সকল শব্দ এক্ষণে উন্নত মানসিক ভাববোধক, সে সকল আদৌ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থবাচক ছিল। এইরূপে চারিদিকে উন্নতিরই প্রমাণ পাওয়া যায়। যাঁহারা প্রত্যক্ষকে সকল জ্ঞানের মূল বলিয়া

স্বীকার করেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে একটী মঙ্গলকর তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে মানবসমাজের কতকালের পরিশ্রম লাগিয়াছে, এবং কত আস্তে আস্তে মনুষ্যের উন্নতি হইয়াছে। সত্য বটে, সময়বিশেষ বা দেশবিশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কোন কোনস্থলে অবনতি দেখিতে পাই; কিন্তু কিঞ্চিদধিক কাল ব্যবধানে সমগ্র মানব জাতির প্রতি নেত্রনিক্ষেপ করিলে উন্নতিই দৃষ্ট হয়। জাতিবিশেষের উদয়াস্ত আছে, কিন্তু একজাতির হস্ত হইতে অপর জাতি উন্নতিনিশান গ্রহণ করিয়া নেতৃরূপে অগ্রসর হয়। প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রাচীননেতা ভারতবর্ষ, পাশ্চাত্যভূখণ্ডের প্রাচীননেতা মিসর। মিসরের হস্ত হইতে পশ্চিমের নেতৃত্বভার ক্রমে ক্রমে ফিনিসিয়া, গ্রীস ও রোমের হাতে যায়। পরে আরবেরা ইউরোপ ও ভারতবর্ষ উভয় স্থান হইতে জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া পূর্ব্বপশ্চিম উভয়খণ্ডের নেতা হয়। বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতিগণ এক্ষণে আরবদিগের পদে প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান বিষয়ে প্রাচীন সমুদয় জাতি অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। সমাজনীতিসম্বন্ধে তাঁহাদিগের পণ্ডিতগণের মতগুলি প্রাচীন পণ্ডিতগণের মত অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নহে; কিন্তু এই মতগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহাদিগের যে কতকাল লাগিবে বলা যায় না। এই কারণেই বলি যে সভ্যতার চরমসীমা হইতে তাঁহারা অদ্যাপি অনেক দূরে অবস্থিতি করিতেছেন।

বা, কৃ।

বোম্বাই ও বাঙ্গালা।

প্রথম প্রস্তাব।

আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এই এক রোগ আছে যে, তাঁহারা স্বদেশীয় অপেক্ষা বিদেশীয় বিষয়ে অধিকতর আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করেন। সংস্কৃত শিক্ষার অভাব এবং বাল্যকালাবধি ইংরেজী চর্চ্চা এই প্রকার মানসিক অবস্থার প্রধান কারণ। যখন ইংলণ্ডীয় সৈন্যদ্বারা, স্পেন দেশীয় যুদ্ধ জাহাজ বিনষ্ট হইবার সংবাদ আসিল, তখন মহারাণী এলিজেবেথ হংসমাংস ভোজন করিতেছিলেন; এই ঘটনাটিকে অতি গুরুতর জ্ঞান করিয়া যাঁহারা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন, তাঁহারা হয় ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধাধিকারের বিষয়

কিছুই জানেন না; কেন না মার্সম্যান সাহেব তদ্বিষয়ে অধিক কিছু বলেন নাই। জানেন না কেবল তাহা নহে, জানিবার লালসাও অল্প। মনুষ্য আশৈশব যে বিষয়ে শিক্ষালাভ করে, তাহার প্রবৃত্তিও স্বভাবতঃ সেই দিকে অধিক ধাবিত হয়।

পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে যেমন, দেশের অন্যান্য বিবরণ সম্বন্ধেও সেই রূপ। ইংলণ্ডের প্রত্যেক কাউন্টির লোকসংখ্যা পর্য্যন্ত যাঁহারা বলিয়া দিতে পারেন, তাঁহারা হয় ত বোম্বাই, মান্দ্রাজ কিম্বা পঞ্জাবের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়েও অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। একবার দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে এক বাঙ্গালি সংবাদপত্র সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষ এই উৎসব উপলক্ষে আনন্দ সম্ভোগ করিবে। ভারতবর্ষের মানচিত্রে বঙ্গদেশ কতটুকু স্থান তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। সেই ক্ষুদ্র স্থান টুকুর বাহিরে দুর্গোৎসব কোথাও নাই, অথচ সম্পাদক মহাশয় অক্লেশে লিখিলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষ উৎসবে উন্মত্ত হইবে।

বোম্বাই প্রদেশ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটী অদ্য পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে বোম্বাই সম্বন্ধীয় সকল কথা, এমন কি অতি প্রয়োজনীয় কথা সকলেরও স্থান সমাবেশ হওয়া অসম্ভব। বিস্তারিতরূপে লিখিতে হইলে দুই একটি গুরুতর বিষয়ের সমালোচনা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না।

বোম্বাই নগর অতি মনোহর স্থানে সংস্থিত। কলিকাতা হইতে লাহোর পর্য্যন্ত ভ্রমণ কর, বোম্বাইয়ের ন্যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কুত্রাপি দেখিতে পাইবে না। তাহার কারণ এই যে, পর্ব্বত, সমভূমি ও সমুদ্র তথায় এই তিনই বর্ত্তমান, তিন প্রকার সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ হইয়া সাতিশয় রমণীয় ও তৃপ্তিকর হইয়াছে। একদিকে সুপ্রশস্ত প্রান্তরে গণনাতীত নারীকেলাদি তরুকুল অরণ্যাকারে হরিদ্বর্ণে অনুরঞ্জিত হইতেছে, অন্য দিকে মলবার পর্ব্বতশ্রেণী সমুন্নতমস্তকে মূর্ত্তিমান্ গাম্ভীর্য্যরূপে দণ্ডায়মান; আবার তরঙ্গসঙ্কুল সুনীল সমুদ্র, রবিকিরণে সমুজ্জ্বলিত হইয়া, হিরকখচিত অসীম প্রসারিত মখ্‌মলের ন্যায় শোভমান হইতেছে।

কলিকাতার সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে, বোম্বাই ভিন্ন সমগ্র ভারতবর্ষে এমন নগর বোধ হয় আর নাই। কাহার মতে বোম্বাই শ্রেষ্ঠ, কাহার মতে কলিকাতা, আমাদের পক্ষ হইতে ঐ প্রকার কোন মত না দিয়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ে উভয় নগরের তুলনা করা যাউক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রাকৃতিক শোভা সম্বন্ধে বোম্বাই অতি মনোহর স্থান। প্রশস্ত নদীতীরবর্ত্তিতা প্রযুক্ত কলিকাতায় প্রাকৃতিক শোভার অসদ্ভাব নাই। তথাচ সে সম্বন্ধে বোম্বাইয়ের নিকট কলিকাতা দাঁড়াইতেও পারে না। জলবায়ুর স্বাস্থ্যকারিতার বিষয় বিচার করিলেও কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাই অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ-

তর স্থান। এমন কি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সকল স্থান না হউক, অনেক স্থান স্বাস্থ্যকারিতা সম্বন্ধে বোম্বাই অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সুনির্ম্মল সমুদ্র বায়ু,বোধ হয়, এই স্বাস্থ্যকারিতার প্রধান কারণ।

আর একটি বিষয়ে বোম্বাই নগর কলিকাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মিউনিসিপালিটির অনুগ্রহে কলিকাতার পয়ঃপ্রণালী সকলের এমনি ভয়ঙ্কর অবস্থা যে,অনেক স্থানে বিলক্ষণ রূপে নাসারন্ধ্রে বস্ত্র প্রবিষ্ট করিয়া না দিলে, অন্নপ্রাসনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা।* সহরের দক্ষিণাংশে যেখানে আমাদের বিজেতামহাপুরুষেরা বাস করেন, সে স্থান সম্বন্ধে অবশ্য একথা খাটে না। উত্তরাংশের কথা বলা হইতেছে। দক্ষিণ ও উত্তরাংশের তুলনা করিলে "ইহৈব নরকঃ স্বর্গঃ" এই প্রাচীন প্রবাদবাক্যের সার্থকতা অনুভব করা যায়। বোম্বাই কলিকাতা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন নগর। আর একটি বিষয়ে কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাই নগরের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে হয়; কলিকাতার ন্যায় তথায় সঙ্কীর্ণ গলি নাই। বোম্বাই নগরের অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন অবস্থার প্রধান কারণ এই যে, সেখানে কলিকাতার চৌরঙ্গির ন্যায় স্বতন্ত্র ইংরেজপল্লী নাই। দেশীয় ও ইউরোপীয় সকল অধিবাসিগণ নগরের সর্ব্বত্র একত্রে বাস করিতেছেন। সুতরাং মিউনিসিপালিটি সহরের সকল ভাগেই দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হন। ইংরেজেরা যে কলিকাতাকে "প্রাসাদময়ী নগরী" বলেন, সে কথা যথার্থই বটে। বারাণসী বল, দিল্লি বল, আর লাহোর বল, কলিকাতার ন্যায় এমন সুরম্য হর্ম্ম্য শ্রেণী আর কোথায় দেখিতে পাইবে না। বোম্বাই নগরে ভাল ভাল বাড়ী আছে বটে, কিন্তু কলিকাতার সঙ্গে তুলনায় বোম্বাইকে নিশ্চয়ই হারি মানিতে হয়। বোম্বাইয়ের অট্টালিকা সকল বড় বড়; কিন্তু কলিকাতার ন্যায় এত সুন্দর নয়।

বোম্বাই নগরে মহারাষ্ট্রীয় গুজরাটী পার্সি প্রভৃতি অনেক জাতি বাস করে। মহারাষ্ট্রীয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বাস্তবিক বোম্বাই মহারাষ্ট্রীয়েরই দেশ।

বোম্বাই গমন করিলে সর্ব্বপ্রথমেই মনে একটী অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। মনে হয়, যে শৈশবকালে মাতৃক্রোড়ে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে যে বর্গির কথা শুনিয়া ভীত হইতাম আজ সেই বর্গির দেশে আসিয়াছি! "বর্গি এল দেশে"র পরিবর্ত্তে," এলাম বর্গির দেশে" মনে হইতে থাকে। কেবল তাহাদের দেশে আসিয়াছি এমন নয়, তাহাদের বাটীতে নিমন্ত্রণে যাইতেছি, তাহাদের সহিত বন্ধুতা-

* এস্থলে বলা আবশ্যক যে, কলিকাতা এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। তথাচ এখনও নগরের অনেক স্থানে দুর্গন্ধময় পয়ঃপ্রণালী সকল বর্ত্তমান।

সূত্রে বদ্ধ হইতেছি। কেবল তাহাই নহে। যে বর্গির হাঙ্গামায় ভীরু বঙ্গবাসিগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, যাহাদের উপদ্রবে তাহাদিগকে বনে জঙ্গলে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইত, হাঁড়ি মাথায় করিয়া পুষ্করিণীর জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া থাকিতে হইত, যাহাদের অত্যাচার নিবারণে অক্ষম হইয়া বাঙ্গালার নবাব স্বীয় রাজস্বের চতুর্থাংশ করস্বরূপ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আজ সেই বর্গিদিগের দেশে আসিয়া রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির কথা বলিতেছি। কেবল তাহাই নহে,আবার সেই বর্গিদিগের দেশে একজন আমাদের বাঙ্গালি আসিয়া "জজ সাহেব" হইয়াছেন।

উপরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বাটীতে নিমন্ত্রণে যাইবার কথা বলিয়াছি। পাঠকবর্গ তদ্বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কৌতূহলী হইতে পারেন। সুতরাং একটি নিমন্ত্রণের কথা বলিতেছি। যাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তাঁহার দ্বারদেশে পৌঁছিয়া দেখি যে, আমাদের এখানে লক্ষ্মীপূজার সময় যেমন আলিম্পন দেওয়া হইয়া থাকে সেইরূপ আলিপনা রহিয়াছে। কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না। বাহিরের ঘরে বসা হইল। আমাদের এখানকার ন্যায় তথায় অন্তঃপুর ও বহির্বাটী আছে। নিমন্ত্রিতদিগের সন্তোষ সাধন জন্য একজন মহারাষ্ট্রীয় তম্বুরা সহকারে তদ্দেশীয় ভাষায় কতকগুলি গান শুনাইলেন। তাম্বূলচর্ব্বণ ও ধূমপান চলিতে লাগিল। এ সকলই আমাদের ন্যায়। মনে হইতে লাগিল যেন বাঙ্গালির গৃহে নিমন্ত্রণে আসিয়াছি। ক্রমে গাত্রোত্থান করিবার অনুরোধ হইল। আমরা অন্তঃপুরে চলিলাম। গিয়া দেখি যে, আহারের স্থানটি নানাবর্ণের গুঁড়া দ্বারা অতি সুন্দররূপে চিত্র বিচিত্র করা হইয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে শুনিলাম যে,স্ত্রীলোকেরা আমাদের সম্মানের জন্য উহা করিয়াছেন। দ্বারদেশে আলিপনারও সেই অর্থ। ভোজনে বসা হইল। পাঠকবর্গ শুনিলে চমৎকৃত হইবেন যে, এক খানা প্রকাণ্ড, অখণ্ড কদলীপত্র সম্মুখের দিকে লম্বা করিয়া পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহাতে অন্ন ও লুচি এবং প্রায় ২০। ২৫ প্রকার ব্যঞ্জন সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্যঞ্জন এত দূরে দূরে যে আনিতে লোক পাঠাইতে হয়! আমাদের যেমন ভাত, সেইরূপ মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রধান খাদ্য রুটি। সকলেই জানেন যে, আমাদের পূর্ব্বাঞ্চলীয় বাঙ্গালিগণ অতি ভয়ানকরূপ লঙ্কা খাইয়া থাকেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় বঙ্গবাসিগণ সে বিষয়ে তাঁহাদের কাছে চিরকালই পরাভূত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পিতারও পিতা আছেন। বোম্বাই ও মান্দ্রাজবাসিগণের নিকট আমাদের পূর্ব্বাঞ্চলীয় ভ্রাতৃগণকেও হারি মানিতে হয়। পুণার বাজারে ভ্রমণ করিবার সময় সেখানে অতি প্রকাণ্ড স্তূপাকার রাশি রাশি লঙ্কা

দেখিলাম। জনৈক মহারাষ্ট্রীয় বলিলেন যে, সেইরূপ সাতটি স্তূপাকার লঙ্কা হইলে এক গৃহস্থের সম্বৎসর চলে। আমাদের আহারের বিষয়েও লঙ্কার ব্যাপারটা অতি ভয়ানক হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া কয়েকজন মহারাষ্ট্রীয়ও ভোজন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এই একটি রীতি আছে যে, সূতার কাপড় ছাড়িয়া পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক আহার করিতে হয়। আর একটি অতি সুন্দর প্রথা আছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে বাটীর গৃহিণীর অভ্যর্থনা করা আবশ্যক। হস্তধারণ অথবা মিষ্টালাপদ্বারা অভ্যর্থনা করিতে হইবে এরূপ নহে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আহারে বসিলে, গৃহিণী আসিয়া কোন একটি ব্যঞ্জন পরিবেশন করিলেই অভ্যর্থনা হইল। সেরূপ অভ্যর্থনার ত্রুটি হইলে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক আপনাকে যার পর নাই অপমানিত মনে করেন। জনৈক সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল পরিভ্রমণ কালে যে যে ভদ্রলোকের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন তথায় উক্ত প্রকার অভ্যর্থনা বিষয়ে ত্রুটি দেখিয়া, (যত দিন না তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।) আপনাকে অতিশয় অপমানিত মনে করিতেন। আমাদিগকেও উক্ত রীত্যনুসারে গৃহিণী আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

বোম্বাই প্রদেশে যে সকল পদার্থ দেখিয়া চমৎকৃত ও আমোদিত হইতে হয়, তন্মধ্যে শিরস্ত্রাণ একটি প্রধান।

পার্সিরা যে শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা এ দেশীয় অনেকেই দেখিয়াছেন। উহাতে কিয়ৎপরিমাণে বিলাতি হ্যাটের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উহা আদৌ পার্সিদিগের নহে, গুজরাটি বণিক্‌দিগের উষ্ণীষ; পার্সিরা তাঁহাদিগের অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র। কেবল শিরস্ত্রাণ কেন, পার্সিরা গুজরাটি ভাষা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত গুজরাটি ও পার্সি উষ্ণীষে বিশেষ কিছু চমৎকারিত্ব নাই। মহারাষ্ট্রীয়দিগের উষ্ণীষই বাস্তবিক অদ্ভুত পদার্থ। এ প্রকার প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, বোধ হয়, পৃথিবীতলে আর কোথাও নয়নগোচর হয় না। দেড়হস্ত পরিমিত ব্যাসবিশিষ্ট উষ্ণীষ দ্বারা কেহ কেহ উত্তমাঙ্গের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল শোভার জন্যই যে উক্তরূপ অদ্ভুত উষ্ণীষ ধারণ করা হয়, এমত নহে। উহা না করিলে মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। মর্য্যাদা রক্ষার দায়ে পড়িয়া তাঁহাদিগকে ঐ বিষম ভার বহন করিতে হয়। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় উষ্ণীষ কেবল উহার সুবৃহৎ আকারের জন্যই বর্ণনীয় এরূপ নহে। তদপেক্ষা অনেক গুণে উহার অধিকতর মাহাত্ম্য আছে। উহা জ্ঞানরত্নে মণ্ডিত! উহাতে ভূগোল ও পুরাবৃত্ত বর্ত্তমান। পরিহাস করিতেছি না; যথার্থ কথাই বলিতেছি। যাঁহারা উষ্ণীষশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন তাঁহারা যে কোন ব্যক্তির উষ্ণীষ দেখিয়া বলিয়া দিতে পারেন যে তিনি

কোন্ প্রদেশের লোক। ইন্দোর, কি গোয়ালিয়র, কি পুণা কি অন্য যে কোন স্থানের লোক হউক না কেন, উষ্ণীষ দেখিলেই তাহার নিবাসস্থানের বিষয় জানিতে অবশিষ্ট থাকে না। ইহাই উষ্ণীষনিহিত ভূগোলবিদ্যা। আবার উষ্ণীষ দেখিয়া বলা যায় যে কে কোন্ বংশ বা জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উষ্ণীষ পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয় দিয়া দেয়। ইহাই উষ্ণীষের পুরাবৃত্ত। পাঠকবর্গকে ইহা বলা অনাবশ্যক যে, বিভিন্ন বংশগত বা বিভিন্ন স্থানবাসী ব্যক্তিবর্গের উষ্ণীষবন্ধনের প্রণালী স্বতন্ত্র বলিয়াই ঐ প্রকার হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রীয় উষ্ণীষ দেখিয়া যে কোন জাতীয় লোককে অবাক্ হইতে হয়। কোন প্রকার মস্তকাবরণবিহীন বাঙ্গালির পক্ষে অধিকতর চমৎকৃত হইবারই কথা। বাঙ্গালির ন্যায় সম্পূর্ণরূপে মস্তকাবরণশূন্য আর কোন সভ্যজাতি জগতে আছে কি না জানি না। শুনিয়াছি মহারাজা হুলকার একবার পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "ভারতবর্ষীয় জাতি সকলের মধ্যে বাঙ্গালিরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানালোকসম্পন্ন হইল কেন? এই জন্য যে তাহাদের মস্তকে কোন প্রকার আবরণ না থাকাতে আলোক সহজেই মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশাধিকারলাভ করে।" এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, এক্ষণে ইংরেজী শিক্ষিত মহারাষ্ট্রীয় নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই স্বীয় স্বীয় উষ্ণীষের কলেবর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র করিয়া লইয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নতির তরঙ্গ মহারাষ্ট্রীয় উষ্ণীষে গিয়াও লাগিয়াছে।

পূর্ব্বে একস্থলে অন্তঃপুর শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। তাহাতে পাঠকগণ মনে করিতে পারেন যে, বোম্বাই প্রদেশে বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় অবরোধপ্রণালী বর্ত্তমান। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। দাক্ষিণাত্যবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে উক্ত প্রথা প্রচলিত নাই। বিন্ধ্যাচল অবরোধপ্রথার সীমা। বোম্বাই নগরের রাজবর্ত্মে অতি সদ্বংশজাত মহিলাগণও উন্মুক্ত শকটে বা পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যার সময় সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজপথে গিয়া দেখ, ভদ্র মহিলাকুল দলে দলে, পদব্রজে বা শকটে সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিয়া বেড়াইতেছেন। বোম্বাই প্রদেশে প্রত্যেক ভদ্র গৃহস্থের গৃহে স্ত্রীলোকদিগের জন্য অন্তঃপুর আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই বহির্গত হইয়া যথা তথা গমন করিতে পারেন। ভদ্রযুবতীগণ পথ দিয়া চলিয়া যান, অনেকসময় সঙ্গে একজন লোকও থাকে না। অবগুণ্ঠন দিবার নিয়ম নাই। সধবা স্ত্রীলোকেরা মাথায় কাপড় দেন না, বিধবারা দিয়া থাকেন ইহাই প্রচলিত প্রথা।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ইংরেজদিগের মধ্যে যে প্রকার স্ত্রীস্বাধীনতা, বোম্বাই প্রদেশে ঠিক সেইরূপ স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত। বস্তুতঃ তাহা নহে।

ইংলণ্ডীয় রমণীগণের স্বাধীনতা এবং মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি রমণীগণের স্বাধীনতার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা মহারাষ্ট্রীয় নারীগণের ও ইংলণ্ডীয় নারীগণের স্বাধীনতার মধ্যে প্রভেদ বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। বোম্বাই প্রদেশে কুলবধূগণ যদিও বিনা অবগুণ্ঠনে প্রকাশ্য রাজবর্ত্ম দিয়া অসঙ্কুচিত ভাবে গমন করিয়া থাকেন, তথাচ শ্বশুর বা শ্বশ্রূগণের সম্মুখে স্বামীর সহিত আলাপ করেন না। ইংলণ্ডীয় যুবতীগণ যে প্রকার অসঙ্কুচিত ভাবে পুরুষদিগের সহিত আহ্লাদ আমোদ ও নৃত্য গীতাদি করিয়া থাকেন বোম্বাই প্রদেশে সেরূপ কিছুই নাই। অপরিচিত পুরুষের সঙ্গেও তাঁহাদের কথা কহিতে নিষেধ নাই, কিন্তু বিশেষ কোন প্রয়োজন না হইলে তাঁহারা প্রায়ই কথা কহেন না।

পাঠকগণ ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, বোম্বাই প্রদেশের রমণীগণের স্বাধীনতা, ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা ও আমাদের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা এই উভয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। বঙ্গদেশে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের মন্দিরেও প্রায় সকল স্ত্রীলোকে যবনিকার অন্তরালে উপবেশন করেন। কিন্তু বোম্বাই প্রার্থনাসমাজে স্ত্রীলোকদের যবনিকা ও অবগুণ্ঠন কিছুই নাই। তবে তাঁহারা পুরুষদিগের সহিত একত্রে উপবিষ্ট হন না, তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে।

এস্থলে একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, আর্য্যাবর্ত্তে বহুকালাবধি যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে ইহার মূল কারণ কি? প্রাচীন ভারতবর্ষে যে উক্ত প্রথা প্রচলিত ছিল না তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতে পারে। প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্র সকল যাঁহারা অভিনিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একথার যাথার্থ্য পক্ষে সাক্ষ্য দান করিবেন।

গ্রামেষ্বাত্মবিসৃষ্টেষু যূপচিহ্নেষু যজ্বনাম্।
অমোঘাঃ প্রতিগৃহ্নন্তাবর্ঘ্যানুপদমাশিষঃ ॥
হৈয়ঙ্গবীনমাদায় ঘোষবৃদ্ধানুপস্থিতান্।
নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ বন্যানাং মার্গশাখিনাম্ ॥

রঘুবংশ, ১ম সর্গ।

কোন স্থানে যাজ্ঞিকেরা যূপচিহ্নিত তাঁহারই প্রদত্ত গ্রাম সমুদায় হইতে আগমন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলে, তাঁহারা অর্ঘ্য প্রদান করিয়া অমোঘ আশীর্ব্বাদ প্রতিগ্রহ করিলেন। কোন স্থানে তাঁহারা ঘোষবৃদ্ধদিগকে সদ্যোজাতঘৃতহস্তে আসিতে দেখিয়া পথের পার্শ্বস্থ বন্যপাদপ দলের নাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

এস্থলে মহারাজা দিলীপ রাজ্ঞীর সহিত বশিষ্ঠাশ্রমে যাইতেছেন ও তাঁহারা উভয়েই চক্ষুঃপার্শ্বস্থ পদার্থ নিচয় দেখিতেছেন ও সমাগত লোকদিগের সহিত আলাপ করিতেছেন।

কবিগণ সাধারণের রুচিবিরুদ্ধ বর্ণনায় কখন প্রবৃত্ত হন না। রাজ্ঞীর সহিত

উন্মুক্ত রথে বাজার গমন, এবং উভয়ে মিলিয়া রাজপথের লোকদিগের সহিত আলাপ দেশীয় প্রথা ও রুচিবিরুদ্ধ হইলে মহাকবি কালিদাস কখনই সে প্রকার বর্ণনা করিতেন না। কেবল রঘুবংশের ন্যায় কাব্য সকল কেন, বেদ পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রেই সুস্পষ্টরূপে দেখা যায় যে, প্রাচীন কালে হিন্দুমহিলাগণকে অন্তঃপুরবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইত না। তবে এই অবরোধ প্রথা কোথা হইতে আসিল? মুসলমানদিগের অত্যাচার বা দৃষ্টান্ত অথবা উভয়ই যে এই প্রথার মূল কারণ তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু সদ্বিদ্বান্ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে এ-কথা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অধিকাংশেরই এই মত যে, মুসলমানেরাই উক্ত রীতির প্রকৃত কারণ। কিন্তু কেবল সুশিক্ষিত মুসলমান নহেন, সুশিক্ষিত হিন্দু সন্তানগণের মধ্যেও এমন লোক আছেন যাঁহারা উক্ত কথায় সন্দেহ করিয়া থাকেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল কি না? যদি থাকে কি পরিমাণে ছিল? বর্ত্তমান অবরোধ প্রথা কোথা হইতে আসিল? যাঁহাদের মনে এই সকল ঐতিহাসিক প্রশ্নের আন্দোলন হইয়া থাকে, বোম্বাই প্রদেশ দর্শন করিলে, সম্পূর্ণরূপে না হউক, অনেক পরিমাণে সংশয় মোচন হইতে পারে। মুসলমানেরা যে বাস্তবিকই অবরোধ প্রথার কারণ, দাক্ষিণাত্যে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত থাকাতে তদ্বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। আর্য্যাবর্ত্তে মুসলমানদিগের প্রতাপ ও আধিপত্য যতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল, দাক্ষিণাত্যে কখনই সে প্রকার হয় নাই। সুতরাং দাক্ষিণাত্যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত হইতে পারে নাই। আর একটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে এবিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা নাই, কিন্তু তত্রত্য মুসলমান দিগের মধ্যে উহা বিলক্ষণ আছে। ইহার কারণ কি? হিন্দুদিগের মধ্যে আদৌ উক্ত প্রথা প্রচলিত ছিল না, মুসলমানেরা উহা সঙ্গে করিয়া আনিয়া ছিলেন ইহাই কি প্রতিপন্ন হইতেছে না?

স্ত্রীস্বাধীনতার বিষয় বলিতে গেলে, স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদের কথা সহজেই আসে। আমাদের বঙ্গবাসিনী মহিলাগণ যেরূপ সূক্ষ্ম ও অসম্পূর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের ভদ্রসমাজে বাহির না হওয়াই ভাল। হিন্দুস্থানী ঘাঘ্‌রা ও ওড়না এ দেশের সূক্ষ্ম শাড়ী অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্টতর ও ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ। বোম্বাই প্রদেশের স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ কিরূপ তাহা পাঠকবর্গ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। সেখানকার স্ত্রীলোকেরা ঘাঘ্‌রা বা ওড়না ব্যবহার করেন না, শাড়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে, তাঁহাদের পরিচ্ছদ আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায়, এমন নহে। আমাদের

স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদে শোভাসম্পাদন হয় সত্য, কিন্তু বস্ত্রপরিধানের প্রধান উদ্দেশ্য যে লজ্জানিবারণ তদ্বিষয়েই ত্রুটি হইয়া থাকে। বোম্বাই প্রদেশের স্ত্রী লোকেরা যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন তাহাতে পরিচ্ছদধারণের প্রধান উদ্দেশ্য যে লজ্জানিবারণ এবং আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য যে শোভাসম্পাদন এ উভয়ই সম্পাদিত হয়। বোম্বাই শাড়ী আমাদের "শান্তিপুরে" ও "ঢাকাই" অপেক্ষা শত গুণে উৎকৃষ্টতর পদার্থ। বোম্বাই শাড়ী রেসমে নির্ম্মিত ও দেখিতে অতি সুন্দর। সেখানকার ভদ্রপরিবারের স্ত্রীলোকেরা তুলার কাপড় পরিধান করিয়া কখনই বাটীর বাহির হন না। হয় উক্ত রূপ বোম্বাই শাড়ী নতুবা অন্য কোন প্রকার পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। বস্ত্র পরিধান করিবার নিয়মও আমাদের স্ত্রীলোকদিগের হইতে স্বতন্ত্র প্রকার। ১৫।১৬ হস্ত দীর্ঘ শাড়ী কুঞ্চিত করিয়া বেড় দিয়া পরিধান করেন ও কাছা দিয়া থাকেন। কাছা দিবার কথা শুনিয়া আমাদের পাঠিকা ভগিনীগণ, বোধ হয়, কিঞ্চিৎ ওষ্ঠ সঙ্কুচিত করিয়া একটু ঘৃণা প্রকাশ করিবেন। কিন্তু আমাদের দেশের রীতি অপেক্ষা কাছা দেওয়া যে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠতর প্রণালী তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বস্ত্রপরিধানপ্রণালীর একটি বিশেষ দোষ এই যে, উহার বন্ধন অত্যন্ত শিথিল। কাছা দিলে বস্ত্র শরীরের উপর অপেক্ষাকৃত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। অনেকেই বলেন যে, স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে বোম্বাই, বঙ্গদেশকে পরাস্ত করিয়াছে। বোম্বাই গিয়া সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা যাহা জানিলাম, তাহাতে উক্ত বাক্যে সম্পূর্ণরূপে সায় দিতে সঙ্কুচিত হইতে হয়। কোন স্থানের সাধারণ শিক্ষার অবস্থা কি প্রকার, স্থির করিতে হইলে, দুটি বিষয় অনুসন্ধান করিতে হয়:—শিক্ষার বিস্তৃতি ও গভীরতা। বিস্তৃতিসম্বন্ধে, বোম্বাই শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। তথায় কোন কোন বালিকাবিদ্যালয়ে ২৫০।৩০০ বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে। আমাদের এখানে অন্যান্য বালিকাবিদ্যালয়ের ত কথাই নাই, বিটন বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা বোধ হয় ৮০।৯০ জনের অধিক হইবে না। অল্পবয়স্কা বালিকাগণের বিদ্যালয়ের অবস্থা দেখিয়া বিচার করিলে, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতিসম্বন্ধে নিশ্চয়ই বোম্বাইকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। কিন্তু বঙ্গদেশে অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীশিক্ষা যে কতদূর প্রবেশ করিয়াছে তাহা নিশ্চয় রূপে স্থির করিবার উপায় নাই। এমন দেখা যায় যে, অতি সামান্য পল্লীগ্রামের ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকেরাও লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছেন। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতিসম্বন্ধে বোম্বাই ও বাঙ্গালার অবস্থা তুলনা করিয়া অসংশয়িতচিত্তে

নিশ্চয়রূপে কোন কথা বলা যায় না। নিশ্চয়রূপে বলা যায় না সত্য, কিন্তু অনুমানে বোম্বাইকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

শিক্ষার গভীরতার বিষয়ে কোন ক্রমেই বোম্বাইয়ের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা যায় না। বয়ঃস্থা স্ত্রীলোকদিগের জন্য বোম্বাইনগরে যে বিদ্যালয় আছে, তাহার নাম "আলেকজান্দ্রা স্কুল।" উক্ত বিদ্যালয়ে বালিকা ও যুবতী উভয় লইয়া প্রায় পঞ্চাশৎ জন ছাত্রী শিক্ষালাভ করিতেছে। প্রথম শ্রেণীতে যে পুস্তক পাঠ হইতেছে তাহা চতুর্থ ভাগ ইংরেজী রিডারের সমান হইবে। সুতরাং শিক্ষার পরিমাণসম্বন্ধে "আলেকজান্দ্রা স্কুল" যে আমাদের কলিকাতাস্থ বয়ঃস্থা স্ত্রীলোকদিগের জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থায় রহিয়াছে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কলিকাতার "বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়" ও "দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের নর্ম্মাল স্কুল" (Native ladies, Normal School) এই উভয় বিদ্যালয়েই প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীগণ প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় সকল পাঠ করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। কোন কোন বুদ্ধিমতী রমনী কোন স্ত্রীবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ না করিয়াও, এতদূর উন্নতি করিয়া থাকেন যে, দেখিলে যার পর নাই আনন্দ হয়। দিবাভাগে সাংসারিক কার্য্যকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়া রাত্রি দশ ঘটিকার পর স্বামীর নিকট গোপনে অতি মৃদুস্বরে কিছু কিছু শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এমন সুন্দর গদ্য ও পদ্য রচনা করিতে পারেন যে দেখিলে যথার্থই অত্যন্ত প্রীত ও আশ্চর্য্য হইতে হয়। "ভুবনমোহিনী" প্রতিভার কথা এখন কিছু বলিব না। উক্ত পুস্তক ছাড়া স্ত্রীলোকের লিখিত এমন পুস্তকও দুই একখানি প্রকাশিত হইয়াছে যাহা কোন ইউরোপীয় মহিলা লিখিলেও তাঁহার পক্ষে প্রশংসার বিষয় হয়। "দীপনির্ব্বাণ" এক খানি সেইরূপ গ্রন্থ। দুই একজন শিক্ষিতা রমণী যেরূপ সুন্দর বাঙ্গালা কবিতা লিখিয়াছেন, এবং জনৈক বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ান্ মহিলা যে প্রকার ইংরেজীভাষায় মধ্যে মধ্যে কবিতা প্রণয়ন করিয়া থাকেন, আমি যতদূর জানি বোম্বাই প্রদেশে এ পর্য্যন্ত সে প্রকার কিছুই হয় নাই। সুতরাং শিক্ষার গভীরতা সম্বন্ধে বোম্বাই প্রদেশ যে, বঙ্গদেশকে পরাস্ত করিয়াছে এ বাক্যে কোন ক্রমেই সায় দিতে পারিতেছি না। বোম্বাই নগরের "আলেকজান্দ্রা স্কুলে" একটি বিষয় দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। উক্ত বিদ্যালয়ে একজনও হিন্দুছাত্রী নাই; সকল গুলিই পার্সি।

ন, না।

কৃষ্ণকান্তের উইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

রোহিণীর নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিলে, গোবিন্দলাল তাহাকে ঔষধ পান করাইলেন। ঔষধ বলকারক—ক্রমে রোহিণীর বলসঞ্চার হইতে লাগিল। রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সজ্জিত রম্য গৃহমধ্যে মন্দ২ শীতল পবন বাতায়ন-পথে পরিভ্রমণ করিতেছে—একদিকে স্ফাটিকাধারে স্নিগ্ধ প্রদীপ জ্বলিতেছে—আর একদিকে হৃদয়াধারের জীবনপ্রদীপ জ্বলিতেছে। এ দিকে রোহিণী, গোবিন্দ-লাল হস্তপ্রদত্ত মৃতসঞ্জীবনী সুরা পান করিয়া, মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল—আর একদিকে তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী কথা শ্রবণপথে পান করিয়া মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল। প্রথমে নিশ্বাস, পরে চৈতন্য, পরে দৃষ্টি, পরে স্মৃতি, শেষে বাক্য স্ফুরিত হইতে লাগিল। রোহিণী বলিল,

"আমি মরিয়াছিলাম, আমাকে কে বাঁচাইল?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "যেই বাঁচাক, তুমি যে রক্ষা পাইয়াছ এই যথেষ্ট।"

রোহিণী বলিল, "আমাকে কেন বাঁচাইলেন? আপনার সঙ্গে আমার এমন কি শত্রুতা যে মরণেও আপনি প্রতিবাদী?"

গো। তুমি মরিবে কেন?

রো। মরিবারও কি আমার অধিকার নাই?

গো। পাপে কাহারও অধিকার নাই। আত্মহত্যা পাপ।

রো। আমি পাপ পুণ্য জানি না—আমাকে কেহ শিখায় নাই। আমি পাপ পুণ্য মানি না—কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড? পাপ না করিয়াও যদি এই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহার বেশী কি হইবে? আমি মরিব। এবার না হয়, তোমার চক্ষে পড়িয়াছিলাম বলিয়া তুমি রক্ষা করিয়াছ। ফিরেবার, যাহাতে তোমার চক্ষে না পড়ি সে যত্ন করিব।

গোবিন্দলাল বড় কাতর হইলেন; বলিলেন, "তুমি কেন মরিবে?"

"চিরকাল ধরিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা, এক বারে মরা ভাল।"

গো। কিসের এত যন্ত্রণা?

রো। রাত্রিদিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।

গোবিন্দলাল তখন বলিলেন, যে "আর এ সব কথায় কাজ নাই—চল তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসি।"

রোহিণী বলিল, "না আমি একাই যাইব।"

গোবিন্দলাল বুঝিলেন, আপত্তিটা কি।

গোবিন্দলাল আর কিছু বলিলেন না। রোহিণী একাই গেল।

তখন গোবিন্দলাল, সেই বিজন কক্ষ-মধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটীতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন, "হা নাথ! নাথ! তুমি আমার এ বিপদে রক্ষা কর। আমার হৃদয় অবশ হইয়াছে—আমার প্রাণ গেল। রোহিণীর পাপরূপে আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে—তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব? আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দলাল গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল,

"আজি এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাগানে ছিলে কেন?"

গো। কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আর কখন কি থাকি না?"

ভ্র। থাক—কিন্তু আজি তোমার মুখ দেখিয়া, তোমার কথার আওয়াজে বোধ হইতেছে, আজি কিছু হইয়াছে?

গো। কি হইয়াছে?

ভ্র। কি হইয়াছে, তাহা তুমি না বলিলে আমি কি প্রকারে বলিব? আমি কি সেখানে ছিলাম?

গো। কেন সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পার না?

ভ্র। তামাসা রাখ। কথাটা ভাল কথা নহে, সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পারিতেছি।—আমায় বল, আমার প্রাণ বড় কাতর হইতেছে।

বলিতে বলিতে ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গোবিন্দলাল, ভ্রমরের চক্ষের জল মুছাইয়া, আদর করিয়া বলিলেন, আর একদিন বলিব ভ্রমর—আজ নহে।

ভ্র। আজ নহে কেন?

গো। তুমি এখন বালিকা সে কথা বালিকার শুনিয়া কাজ নাই।

ভ্র। কাল কি আমি বুড়া হইব?

গো। কালও বলিব না—দুই বৎসর পরে বলিব। এখন আর জিজ্ঞাসা করিও না ভ্রমর।

ভ্রমর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল "তবে তাই—দুই বৎসর পরেই বলিও। আমার শুনিবার বড় সাধ ছিল—কিন্তু তুমি যদি বলিলে না—তবে আমি শুনিব কি প্রকারে? আমার বড় মন কেমন কেমন করিতেছে।"

কেমন একটা বড় ভারি দুঃখ ভোমরার মনের ভিতর অন্ধকার করিয়া উঠিতে লাগিল। যেমন বসন্তের আকাশ—বড় সুন্দর, বড় নীল, বড় উজ্জ্বল,—কোথাও কিছু নাই—অকস্মাৎ একখানা মেঘ উঠিয়া চারিদিক্ আঁধার করিয়া ফেলে—ভোমরার বোধ হইল, যেন, তার

বুকের ভিতর তেমনি একখানা মেঘ উঠিয়া, সহসা চারিদিক্ আঁধার করিয়া ফেলিল। ভ্রমরের চক্ষে জল আসিতে লাগিল। ভ্রমর মনে করিল, আমি অকারণে কাঁদিতেছি— আমি বড় দুষ্ট হইয়াছি —আমার স্বামী রাগ করিবেন। অতএব ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গিয়া, কোণে বসিয়া পা ছড়াইয়া অন্নদামঙ্গল পড়িতে বসিল। কি মাথা মুণ্ড পড়িল তাহা বলিতে পারি না কিন্তু বুকের ভিতর হইতে সে কালো মেঘখানা কিছুতেই নামিল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দলাল বাবু জ্যেঠা মহাশয়ের সঙ্গে বৈষয়িক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। কথোপকথনচ্ছলে কোন্ জমিদারীর কিরূপ অবস্থা তাহা সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের বিষয়ানুরাগ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমরা যদি একটু একটু দেখ শুন, তবে বড় ভাল হয়। দেখ, আমি আর কয় দিন। তোমরা এখন হইতে সব দেখিয়া শুনিয়া না রাখিলে, আমি মরিলে, কিছু বুঝিতে পারিবে না। দেখ, আমি বুড়া হইয়াছি, আর কোথাও যাইতে পারি না। কিন্তু বিনা তদারকে মহাল সব খারাব হইয়া উঠিল।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আপনি পাঠাইলে আমি যাইতে পারি। আমারও ইচ্ছা সকল মহালগুলি এক একবার দেখিয়া আসি।"

কৃষ্ণকান্ত আহ্লাদিত হইলেন। বলিলেন, "আমার তাহাতে বড় আহ্লাদ। আপাততঃ বন্দরখালিতে কিছু গোলযোগ উপস্থিত। নায়েব বলিতেছে যে, প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়াছে, টাকা দেয় না, প্রজারা বলে, আমরা খাজনা দিতেছি, নায়েব উসুল দেয় না। তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, তবে বল, আমি তোমাকে সেখানে পাঠাইবার উদ্যোগ করি।"

গোবিন্দলাল সম্মত হইলেন। তিনি এই জন্যই কৃষ্ণকান্তের কাছে আসিয়াছিলেন। তাঁহার এই পূর্ণ যৌবন, মনোবৃত্তি সকল উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গতুল্য প্রবল, রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্রা। ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ, এই চাতকের লোচনপথে উদিত হইল—প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চল ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন, রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল। গোবিন্দলাল, তাহা বুঝিয়া মনে মনে শপথ করিয়া, স্থির করিলেন, মরিতে হয় মরিব কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, যে বিষয়কর্ম্মে মনোভিনিবেশ করিয়া রোহিণীকে ভুলিব—স্থানান্তরে গেলে, নিশ্চিত ভুলিতে পারিব। এই রূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া তিনি পিতৃ-

য়ের কাছে গিয়া বিষয় আলোচনা করিতে বসিয়াছিলেন। বন্দরখালির কথা শুনিয়া, আগ্রহসহকারে তথায় গমনে সম্মত হইলেন।

ভ্রমর শুনিল, মেজ বাবু দেহাত যাইবেন। ভ্রমর ধরিল, আমিও যাইব। কাঁদাকাটি, হাঁটাহাঁটি পড়িয়া গেল। কিন্তু ভ্রমরের শাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন না। তরণী সজ্জিত করিয়া, ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, ভ্রমরের মুখচুম্বন করিয়া, গোবিন্দলাল দশদিনের পথ বন্দরখালি যাত্রা করিলেন।

ভ্রমর আগে মাটীতে পড়িয়া কাঁদিল। তার পর উঠিয়া, অন্নদামঙ্গল ছিঁড়িয়া ফেলিল, খাঁচার পাখী উড়াইয়া দিল, পুতুল সকল জলে ফেলিয়া দিল, টবের ফুলগাছ সকল কাটিয়া ফেলিল, আহারের অন্ন পাচিকার গায়ে ছড়াইয়া দিল, চাকরাণীর খোঁপা ধরিয়া ঘুরাইয়া ফেলিয়া দিল—ননদের সঙ্গে কোন্দল করিল—এই রূপ নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া, শয়ন করিল। শুইয়া চাদর মুড়ি দিয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল এদিকে অনুকূল পবনে চালিত হইয়া, গোবিন্দলালের তরণী তরঙ্গিণী-তরঙ্গ বিভিন্ন করিয়া চলিল

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

কিছু ভাল লাগে না—ভ্রমর একা। ভ্রমর শয্যা তুলিয়া ফেলিল—বড় নরম,—খাটের পাখা খুলিয়া ফেলিল—বাতাস বড় গরম, চাকরাণীদিগকে ফুল আনিতে বারণ করিল—ফুলে বড় পোকা। তাস খেলা বন্ধ করিল—সহচরীগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত—তাস খেলিলে শাশুড়ী রাগ করেন। সূচ, সূতা, উল, পেটার্ণ,—সব একে একে পাড়ার মেয়েদের বিলাইয়া দিল—জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, যে বড় চোখ জ্বালা করে। বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, ধোপাকে গালি পাড়ে, অথচ ধৌত বস্ত্রে গৃহ পরিপূর্ণ। মাথার চুলের সঙ্গে চিরুণীর সম্পর্ক রহিত হইয়া আসিয়াছিল—উলুবনের খড়ের মত চুল বাতাসে দুলিত, জিজ্ঞাসা করিলে, ভ্রমর হাসিয়া, চুলগুলি হাত দিয়া টানিয়া খোঁপার গুঁজিত—ঐ পর্য্যন্ত। আহারাদির সময়ে ভ্রমর নিত্য বাহানা করিতে আরম্ভ করিল—আমি খাইব না, আমার জ্বর হইয়াছে। শাশুড়ী কবিরাজ দেখাইয়া, পাঁচন ও বড়ির ব্যবস্থা করিয়া, ক্ষীরোদার প্রতি ভার দিলেন, যে বৌমাকে ঔষধ গুলি খাওয়াইবি। বৌ মা ক্ষীরির হাত হইতে বড়ি পাঁচন কাড়িয়া লইয়া, জানেলা গলাইয়া ফেলিয়া দিল।

ক্রমে ক্রমে এতটা বাড়াবাড়ি ক্ষীরি চাকরাণীর চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্ষীরি বলিল, "ভাল, বউ ঠাকুরাণি, কার জন্য তুমি অমন কর? যাঁর জন্য তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলে, তিনি কি তোমার কথা একদিনের জন্য ভাবেন? তুমি মরতেছ কেঁদে কেটে, আর তিনি

হয় ত হুঁকার নল মুখে দিয়া, চক্ষু বুজিয়া রোহিণী ঠাকুরাণীকে ধ্যান করিতেছেন।”

ভ্রমর ক্ষীরিকে ঠাস্ করিয়া এক চড় মারিল। ভ্রমরের হাত বিলক্ষণ চলিত। প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, “ তুই যা ইচ্ছা তাই বকিবি ত আমার কাছে থেকে উঠিয়া যা।”

ক্ষীরি বলিল, “ তা চড় চাপড় মারিলেই কি লোকের মুখ চাপা থাকিবে? তুমি রাগ করিবে বলিয়া আমরা ভয়ে কিছু বলিব না। কিন্তু না বলিলেও বাঁচিনা। পাঁচি চাঁড়ালনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি,—সে দিন অত রাত্রে রোহিণী, বাবুর বাগান হইতে আসিতেছিল কি না?”

ক্ষীরোদার কপাল মন্দ তাই এমন কথা সকাল বেলা ভ্রমরের কাছে বলিল। ভ্রমর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষীরোদাকে চড়ের উপর চড় মারিল, কিলের উপর কিল মারিল, তাহাকে ঠেলা মারিয়া ফেলিয়া দিল, তাহার চুল ধরিয়া টানিল। শেষ আপনি কাঁদিতে লাগিল।

ক্ষীরোদা, মধ্যে মধ্যে ভ্রমরের কাছে, চড় টা চাপড় টা খাইত, কখনও রাগ করিত না, কিন্তু আজি কিছু বাড়াবাড়ি, আজ একটু রাগিল। বলিল, “তা ঠাকুরুণ, আমাদের মারিলে ধরিলে কি হইবে —তোমারই জন্য, আমরা বলি। তোমাদের কথা লইয়া লোকে একটা হৈ হৈ করে, আমরা তা সইতে পারি না। তা আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তুমি পাঁচিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর।”

ভ্রমর, ক্রোধে দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, “তোর জিজ্ঞাসা করিতে হয় তুই করগে—আমি কি তোদের মত ছুঁচো পাজি, যে আমার স্বামীর কথা পাঁচি চাড়ালনীকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব? তুই এত বড় কথা আমাকে বলিস্। ঠাকুরাণীকে বলিয়া আমি ঝাঁটা মেরে তোকে দূর করিয়া দিব। তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা।”

তখন সকাল বেলা, উত্তম মধ্যম ভোজন করিয়া, ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষীরি চাকরাণী, রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। এদিকে ভ্রমর উর্দ্ধমুখে সজলনয়নে,যুক্তকরে,মনে মনে গোবিন্দলালকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, “ হে গুরো! শিক্ষক, ধর্ম্মজ্ঞ,আমার এক মাত্র সত্য স্বরূপ। তুমি কি সে দিন এই কথা আমার কাছে গোপন করিয়াছিলে!”

তার মনের ভিতর যে মন, যে মন হৃদয়ের লুকায়িত স্থান কেহ কখন দেখিতে পায় না—যেখানে আত্মপ্রতারণা নাই, সেখান পর্য্যন্ত ভ্রমর দেখিলেন, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই। অবিশ্বাস হয় না। ভ্রমর কেবল একবার মাত্র মনে ভাবিলেন, যে তিনি অবিশ্বাসী হইলেই বা এমন দুঃখ কি? আমি মরিলেই সব ফুরাইবে। হিন্দুর মেয়ে, মরা বড় সহজ মনে করে।

আমার মালা গাঁথা।

এক ছড়া মালা গাঁথিতে বড়ই সাধ হলো। সূর্য্যমুখী এতক্ষণ মুখ তুলিয়া আকাশপানে চাহিয়াছিল, সন্ধ্যা হইল দেখিয়া আস্তে আস্তে মস্তক অবনত করিল; আমিও মালা গাঁথিবার জন্য একগাছি সূতা লইয়া বাগানের দিকে চলিলাম। মুক্ত দ্বার দিয়া কাননে প্রবেশ করিলাম। এই কানন ভ্রমণে কাহারও নিষেধ নাই; সাধারণ সকলের জন্যই বাগানটি প্রস্তুত হইয়াছে। সন্ধ্যার মন্দ সমীরণে উদ্যানস্থ পুষ্পের গন্ধ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, গাছের পাতাগুলি অল্পে অল্পে দুলিতে লাগিল আর কেমন একপ্রকার চিত্তসন্তোষজনক শব্দ হইতে লাগিল। বহির্জগতের সহিত আমাদের অন্তরাত্মার কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানি না,কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে সমীরণভরে দোদুল্যমান বৃক্ষপত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনও দুলিতে লাগিল; ঝিল্লিগণের ঝিঁ ঝিঁ রব বড় মধুর বোধ হইল আর সেই সঙ্গে আমার হৃদয় যন্ত্র বাজিয়া উঠিল। আমি যেন কি অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, যেন কোন দ্রব্য হারাইয়াছি কিন্তু কি যে সে দ্রব্য তাহা স্মরণ করিতে পারিলাম না। অনেক প্রকার অসম্ভব চিন্তার উদয় হইল। ভাবিলাম কিংশুকে যদি গন্ধ থাকিত, সুপক্ক ফল যদি না পড়িত, বিদ্যুতের আলোক যদি নয়নস্নিগ্ধকর হইত আর আমার যদি এই সকল পুষ্পের ন্যায় ভুবনমোহিনী শক্তি থাকিত তাহা হইলে বেশ হইত। এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময় দেখি কতকগুলি ফুল শুকাইয়া ভূপতিত হইল। পতনকালীন সরসর শব্দে যেন বলিতে লাগিল—'memento horœ novissimœ.' এই উপদেশবাক্য আমার অন্তরে লাগিল, আমি আমার শেষের দিন স্মরণ করিলাম; তখন বুঝিলাম যে আমার এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ আজি হউক কালি হউক দুদিন পরে হউক, ঐ বৃন্তচ্যুত পুষ্পের ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। না না—পুষ্পের সহিত আমার তুলনা কোথায়? পতনকালে ফুলটি যেন হাসিতেছিল, যতক্ষণ বৃক্ষে ছিল ততক্ষণ বৃক্ষের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে, সৎগন্ধ দানে কত লোকের চিত্তসন্তোষ করিয়াছে, আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিয়া ধ্বংস হইল, এ ধ্বংসে দুঃখ নাই। কিন্তু আমি —আমি সৎগন্ধ বিতরণে কয়জনের চিত্ত সন্তোষ করিয়াছি, কাহার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছি? কাহারও নয়। তবে এ পৃথিবীতে আসিয়া কি করিলাম? যখন আমার এই জীবন বুদ্বুদ কালস্রোতে মিশাইবে তখন কি হাসিতে পাইব না? যাই হউক আর ভাবিব না, মিছা ভাবনায় সব ভুলিয়া গিয়াছি। হাতের সূতা

হাতে রহিয়াছে; মালা ত গাঁথা হয় নাই।

মালার জন্য ফুল তুলিতে চলিলাম। দেখিলাম অনেক গুলি ফুল ফুটিয়াছে, আর কতকগুলি ঈষৎ হেলিয়া দুলিয়া ফোটে ফোটে হইতেছে। মল্লিকা সুন্দরী দেখিল যে ভূমণ্ডল ক্রমে ক্রমে অন্ধকারাবৃত হইতে লাগিল এখন আর লজ্জা কেন? এই ভাবিয়া ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন মোচন করিল—আপনার গন্ধে আপনি ঢলিয়া পড়িল। ঐ ঢলেপড়াভাব আমি বড় ভাল বাসি। নিজের গুণ মনে মনে জেনে যে নম্রভাব ধরে, তারে বড় ভাল বাসি। মল্লিকে। ক্ষুদ্র বৃক্ষে তোমার জন্ম—ঐ বিদেশী আরোকেরিয়া, উহার পাতার ন্যায় তোমার পাতার সৌন্দর্য্য নাই; সুন্দর পলাশের ন্যায় বর্ণও নাই কিন্তু তবু আমি তোমারে বড় ভাল বাসি—তোমার ঐ সৎগন্ধ আর ঐ ঢলে পড়া ভাব আমার অন্তরে লাগিয়াছে। কখন জানি না, কিন্তু শুনিতে পাই সরলমনের সহিত সরলমনের বিনিময় সহজেই হয়:—আমার নিজের মন আমি চিনিতে পারিলাম না—জানিনা সরল কি গরলময়—কিন্তু বোধ হয় তোমার উপর যেরূপ সাদা, অন্তরও সেইরূপ, নহিলে তোমার ঐ ঢলে পড়া ভাব থাকিত না। তুমি গর্ব্বিতা হলে তোমার সহিত আলাপ করিতাম না, তোমার নিকট এতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতাম না; কিন্তু আমি বুঝিয়াছি তুমি সেরূপ নও সেই জন্যই তোমাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছি, মল্লিকে আজি আমার কৌতূহল নিবারণ করিতে হইবে।

মল্লিকে বল দেখি জগজ্জনমনোহর ঐ সৎগন্ধ তুমি কেন বিতরণ করিতেছ? ঐ গন্ধে বিভোর হইয়া মানবগণ নন্দনকাননের সুখ এই ভূমণ্ডলে ভোগ করিবে এই জন্যই কি তুমি তোমার গন্ধ ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিতেছ? কিন্তু তাহাতে তোমার লাভ কি? যথার্থ স্বার্থপরতাশূন্য হইয়া পরের সুখবর্দ্ধন করাই কি তোমার উদ্দেশ্য?

মনে ভাবিলাম মধুর হাসি হাসিয়া মল্লিকা বলিল—তোমার ন্যায় সরল লোকেই আমার উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থপর জ্ঞান করে। গন্ধবিতরণে আমার নিজের লাভ কি? তবে বলি শুন—এ সংসারে তুমি একা—সংসারবন্ধনে বদ্ধ না হয়ে উদাসীনের ন্যায় বিচরণ করিতেছ। তুমি কি বুঝিবে? আমাদের ন্যায় কামিনীগণের মনের ভাব তোমায় কি রূপে বুঝাইব? আমরা চাই—জগৎশুদ্ধ সকলে আমাদের ভাল বাসিবে, মানবগণ নিজ নিজ হৃদয়কাননে আমাদের যত্নসহকারে রোপণ করিবে, তাহাদের জলসেচনে পরিবর্দ্ধিত হইব; এখন বল দেখি আমার ঐ গন্ধটুকু না থাকিলে কে আমায় আদর করিত, কে আমায় ভাল বাসিত? ঐ অপরাজিতা সুন্দরী ভুবনমোহিনী নীলিমায় অঙ্গ সাজাইয়া কানন

শোভা করিতেছে, স্বীকার করি উহা-রও আদর আছে। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য—শুকাইলে উহাকে আর কে ভাল বাসে? কিন্তু আমি শুকাইয়া যাই আর যাহাই হই না কেন, যতক্ষণ গন্ধ থাকে ততক্ষণ সমান আদর পাই—এইটি যখন মনে হয় তখন আমার কত আমোদ, নিজের গন্ধে নিজে যখন মুগ্ধ হই তখন আমার কত সুখ তাহা তুমি কিরূপে বুঝিবে। সকলে, ভাল বাসিবে—ঐ সুখের আশা যদি না থাকিত তাহা হইলে কি আমি এরূপ গন্ধবিতরণ করিতাম? আপনার গর্ব্ব আপনার মনে আপনি বলিয়া যদি মন না উছলিত তবে কি নিজশরীরে ঐ গন্ধ ধরিতাম? বোধ হয়—না। আমার অভিপ্রায় স্বার্থপর বোধে ঘৃণা করিও না। স্বার্থশূন্য এজগতে কেহই নাই।

স্বার্থ শূন্য কি কেহই নাই—হতেও পারে। গ্রামের মধ্যে বড় লোক—বড় পরোপকারী শশী বাবু অতিথিশালা করেছেন,প্রতিদিন কত অতিথি প্রতিপালন করিতেছেন—কেন? নিজে প্রশংসা পাবেন বলে, আর নিজের মনের সুখসাধনের জন্য। এই যে পাঁচটি অঙ্গুলিযুক্ত আমার দক্ষিণ হস্ত অন্নের গ্রাসটি আদর করিয়া মুখমধ্যে দিয়া থাকে ইহা শুধু মুখের কি উদরের উপকারের জন্য নয়। যদি অন্য রূপে হাতের পুষ্টিসাধন হতে পারিত, তাহা হইলে এই দক্ষিণ হস্তের সহিত সুচিক্কণ দন্তাবলীপরিবেষ্টিত মুখের প্রণয় থাকিত কি না বলিতে পারি না।

সেখানে যাই সেই খানে দেখি সকলেই নিজের জন্য ব্যস্ত, আমিও নিজের তুষ্টিসাধনের জন্য মালাটি গাঁথিয়া শেষ করিলাম। মালাটি নিজে পরিয়া নিজের অঙ্গের শোভা বাড়াইব স্থির করিলাম। এমন সময় দেখি রামধন ঘোষাল শশী বাবুর একটি পারিষদ—বু ভেলভেটে অঙ্গ সাজাইয়া বাগানের দিকে আসিতেছেন। সংসারকাননে ইনি একটী অপরাজিতা। উভয়েই গন্ধহীন। অপরাজিতা সূর্য্যরশ্মি থেকে ৭টি রং লইয়া কেবল নীল রংটি বাহিরে প্রকাশ করে, ঘোষাল মহাশয়ও শশী বাবুর কিরণ থেকে অন্ন বস্ত্র আভরণ এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ* এই সাতটি রং লইয়া কেবল বু বসনের আভা বাহিরে প্রকাশ করিতেছেন। রামধন ঘোষালকে দেখিলেই আমার মনে মনে কেমন এক রকম ঘৃণার উদয় হয়, কেন তা জানি না—যাহারে ভাল বাসি তার সব ভাল, কিন্তু যাহারে দেখিতে পারিনা তার সকল কাজই ঘৃণাজনক, কারণ তাহার কাজ গুলি নিজের মনোমত নয় বলিয়াই তাহারে আমরা ভাল বাসি না।

---

* শেষোক্ত ৪টি রং শশী বাবুর কিরণে আছে কি না বিজ্ঞান বলে এখনও তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। পারিষদগণ শশীবাবুকে দেবতার ন্যায় স্তব করে দেখিয়া ঐ কয়টি অনুমান করিয়া লইলাম।

রামধন বাবুর অঙ্গসজ্জা আমার চক্ষে বিষতুল্য, আজি তাঁহাকে দেখে আমার অঙ্গ সাজাবার বাসনা দূর হয়ে গেল। আমার মালা পরা সাধ একেবারে ঘুচে গেল। নিজের অঙ্গ সাজাইয়া পরের মন হরণ করিতে আর বাসনা রহিল না। এখন ভাবিলাম—নিজের নয়নের তৃপ্তি-সাধনার্থে পরের অঙ্গ সাজাইব, হাতের মালা পরের গলে দিয়া নয়ন ভরিয়া তাহার শোভা দেখিব—মনে মনে বড়ই বাসনা হলো। কিন্তু হবি হবি—এ মালা কার গলে পরাইব, এ মালা গলে পরিলে কার শোভা বাড়িবে? অন্ধকারে বসিয়া মোটা সূতায়, কি ফুল তুলিতে কি ফুল তুলিয়া যে মালা গাঁথিলাম এ মালায় ত কাহারও সৌন্দর্য্য বাড়িবে না। তবে পরের গলে মালা দিয়া কি লাভ হইবে? আর পরেই বা আদর করিয়া আমার এ মালা কেন পরিবে? আদর—আদর কথাটি বড় মিষ্ট; আমি আদর বড় ভাল বাসি। যে আদরে অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান মায়ের গলা জড়াইয়া ঝুলিতে থাকে, স্বামীর যে আদরে প্রণয়িনীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হয় আর মুখে মধুর হাসি দেখা দেয়, বন্ধুর দোষ দেখিলে লোকে যে আদর মাখান তিরস্কার করিয়া থাকে, সেই আদর ভরা হাতে কে আমার হাত হইতে মালাটি লইবে? সেই আদর মাখা বচনে কে আমায় বলিবে ও ফুলটির বদলে আর একটি ফুল বসাও, ও ফুলটি ছিঁড়িয়া ফেল, এই স্থানটি বেশ হইয়াছে, ওখানটি ভাল হয় নাই, কে ঐরূপ আদর করিয়া আমার পরিশ্রম সফল করিবে? আমার মালাকে আদর করে এমন কি কেহই নাই? থাকিতেও পারে। যখন তেমন লোক পাইব, তখন তাহাকে মনের মত মালা গাঁথিয়া পরাইব—এখন, এই সূত্র-নিবদ্ধ কাননকুসুমনিচয়কে মাতা বসু-মতীকে সমর্পণ করিব। ফুলগুলি খুলিয়া মাটীতে ছড়াইলাম।—

কৃ—

বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

পঞ্চম খণ্ড।

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ।

(অবতারণা)

অশোক রাজার সময়ে—মৌর্য্যবংশের অধিকার কালে—মগধ সাম্রাজ্যের উন্নতির মুখে—খৃষ্টীয় শক আরম্ভ হইবার ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বে, যখন সভ্য ভারতের অধিকাংশ লোকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়—যখন বুদ্ধদেবের নাম বিশ্বামিত্র, বাদরায়ণ প্রভৃতি বেদপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের নাম ঢাকিয়া ফেলে—যখন ব্রাহ্মণগণও আমাদের সর্ব্বনাশ হইল মনে করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের নব অভ্যুদয় দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হন, তখন কে ভাবিয়াছিল যে ঐ অল্পসংখ্যক হীনবল, বীর্য্যহীন, বিচারপরাজিত ব্রাহ্মণগণই আবার ভারতবর্ষের একাধিপতি হইবেন—আবার তাঁহাদিগেরই গৌরবে ভারত গৌরবান্বিত হইবে। বোধ হয় কেহই এরূপ প্রত্যাশা করেন নাই, সকলেই ভাবিয়াছিলেন আজি হউক, কালি হউক, দশদিন পরেই হউক, ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগের পদানত হইবেন। কিন্তু তাহা হইবার নহে। বিচ্ছিন্ন মমতাশূন্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একটী শক্তি ছিল। যে শক্তি থাকিলে কিছুতেই লোপের মার নাই সেই শক্তি ছিল; যে শক্তিবলে ইহুদিরা আজিও ইহুদি আছে—গৈবীরেরা আজিও গৈবীর আছে—সেই শক্তি ছিল। যদি পৌরাণিক ধর্ম্মের উৎপত্তি না হইত, যদি চীনের ন্যায় সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধ হইত, তথাপি ব্রাহ্মণ নাম বিলুপ্ত হইত না। সে শক্তিটী স্বশ্রেণীহিতৈষিতা। এখন যেমন লোকের স্বদেশহিতৈষিতা (patriotism) বলিয়া একটী শক্তি জন্মিতেছে—তেমনি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তৎকালে স্বশ্রেণীর অর্থাৎ

ব্রাহ্মণজাতির (সমস্ত দেশের বা লোকের নয়) ঐক্য এবং সমতা বজায় রাখিবার জন্য একটী প্রবৃত্তি ছিল। স্বীয় ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস, উচ্চতর জ্ঞানজনিত অভিমান, আমার জ্ঞান আছে এই অহঙ্কার, ব্রাহ্মণমাত্রেরই চিরকালই আছে। এই কয়টী শক্তি ছিল বলিয়াই তাঁহারা অনেকবার অনেক বিপদে রক্ষা পাইয়াছেন। এই শক্তি ছিল বলিয়াই দুর্দ্দমনীয় মুসলমানের অসির আঘাতেও পারস্যের ন্যায় ভারতসমাজ ছিন্ন ভিন্ন হয় নাই। এক্ষণে আমরা যে প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিতেছি তাহাতে বৌদ্ধের সহিত সংগ্রামে বহু শতাব্দী পরে ব্রাহ্মণ কি উপায়ে জয়লাভ করিয়াছেন তাহাই দেখান যাইবে।

(ধর্ম্ম প্রচারার্থ বৌদ্ধদিগের অবলম্বিত উপায়াবলী)

আমাদের গৌরবের প্রথম সময়ে—গভীর চিন্তাশীল লোকদিগের সময়ে—যখন উচ্চদরের দার্শনিক মত সকল চারিদিকে প্রচারিত হইতেছিল, সেই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি। বুদ্ধদেবের অমানুষশক্তি, নিঃস্বার্থ প্রাণিহিতৈষিতা প্রভৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অনেকে তাঁহার অনুগামী হয়—তৎকালীন সামাজিক অবস্থাও উঁহাদের উন্নতির কারণ হয়। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকগণ প্রধানতঃ তিন দলে বিভক্ত ছিল। একদল মঠে থাকিত উঞ্ছবৃত্তি ও ভিক্ষাদ্বারা উদরপূর্ত্তি করিত—এবং বুদ্ধত্ব লাভের জন্য ধ্যান ধারণায় রত থাকিত। ইহাদিগেরই জ্ঞানের উন্নতি অবনতিক্রমে ভিক্ষু, অর্হত, বোধিসত্ত্ব নাম হইত। উচ্চ বিষয়ের মতামত আলোচনা মঠেই হইত, কোন মত বিষয়ে সন্দেহ হইলে এইখান হইতেই তাহার মীমাংসা হইত। বড় বড় রাজারা ধর্ম্মগত মীমাংসা করিবার জন্য এই ভিক্ষুদের লইয়া সভা করিতেন। দ্বিতীয় দল বিষয়ী লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিত। তাহারা কোন প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম, নীতি, বিনয় প্রভৃতি শিক্ষা দিত। ইহাদিগের নাম শ্রাবক। একজন শ্রাবক শব্দের অর্থ করিয়াছেন যাহারা শুনে, কিন্তু বাস্তবিক শ্রু ধাতু ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া শ্রাবক পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, যাহারা শুনে তাহাদিগকে শ্রোতা বলে, ও যাহারা শুনায় তাহারাই শ্রাবক।* এই শ্রাবকেরাও বিবাহাদি করিত না। তৃতীয় দল বিষয়ী লোক। ইহারা পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বৌদ্ধদিগের ইচ্ছা নয় যে, কেহ বিষয়কর্ম্ম করে। তাহাদের চেষ্টা এই যে লোকে চিন্তা করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য, নির্ব্বাণের জন্য, চেষ্টা করুক—কিন্তু তাহা

---

* কনিংহাম যে রূপ বলেন যদি শ্রাবকেরা সেইরূপই ছিল, যদি তাহারা কেবল শ্রোতা অর্থাৎ বুদ্ধদিগের সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর লোক ছিল এবং তাহারাই মঙ্ক যদি বা মোহন্ত হইল, তবে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী সকলেই কি মোহন্ত ছিল? তবে অশোক রাজা বৌদ্ধ হইলেন কি রূপে?

হইলে জগৎ চলে না। অতএব কতক লোক সংসার লইয়া থাকুক, তাহারা শুনিয়া যে টুকু ধর্ম্মশিক্ষা করিতে পারে করুক,এই পর্য্যন্ত, সুতরাং তাহারা ইতর সাধারণের ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য চেষ্টা করিত এবং সে চেষ্টায় অনেক লোককে আয়ত্ত করিয়াছিল। দেখ উহাদের একদল প্রচারক ছিল, একদল প্রচারক দিগের উপর তত্ত্বাবধারণ করিতে থাকিত; ধর্ম্মোন্নতির জন্য এই দুইদলই একান্ত উদ্যোগী, ইহাতেও শীঘ্র শীঘ্র ধর্ম্মপ্রচার হইয়া পড়িল। বৌদ্ধেরা স্ত্রীলোকদিগকেও ধর্ম্মপ্রচার করিতে দিত এবং উহাদিগকেও মঠের মধ্যে স্থান দিত। যে ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের বিবাদ তাহারা বৈদিক ক্রিযাসক্ত, স্ত্রী ও শূদ্র, ধর্ম্মশাস্ত্র ও বৈদিক ক্রিয়াতে একেবারে বঞ্চিত। বৈশ্যগণও বড় একটা যাগযজ্ঞাদিতে থাকিতে পারিত না। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম এক প্রকার বন্ধ বলিলেই হইল।

(ব্রাহ্মণদিগের উপায়)

এখন নিয়ম এই যে, ইতর সাধারণ লোকে যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে সেই ধর্ম্মেরই গর্ব্ব অধিক। একে বৌদ্ধ ধর্ম্ম রাজার ধর্ম্ম, তাহাতে ধর্ম্মপ্রচার জন্য লোক নিযুক্ত,তাহার উপর আবার বৌদ্ধগণ যে কেবল ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক এমন নহে—যে কোন জাতীয লোককেই উন্নত পদ প্রদানেও কাতর নহে* সুতরাং অনেক লোক ঐ ধর্ম্মে আসিয়া পড়িল। হিন্দুস্থানের পশ্চিমাংশই ব্রাহ্মণদিগের প্রধান স্থান; ব্রাহ্মণগণ এখন আপনাদিগের ভ্রম দেখিতে পাইলেন, তাঁহারাও সাধারণ লোকদিগকে আপনার দলে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; যে খানে বৌদ্ধদিগের ক্ষমতা প্রবল হয় নাই—সেই খানে যাইয়াই তাহাদিগকে স্মৃতি উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন; অনার্য্যদিগের দেবতা আপন দেবতা বলিয়া গ্রহণ করত দলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে দেবতা উপাসনা বলিলে প্রায়ই পৌত্তলিকতা বুঝাইত না। জৈমিনী বেদব্যাখ্যার মীমাংসায় লিখেন তাঁহার মতে দেবতা বলিয়া কোন জীব পদার্থ নাই কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি,তখনকার ব্রাহ্মণেরা কার্য্য গতিকে

---

* বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে রাহুল ক্ষত্রিয় ছিলেন, কশ্যপ ব্রাহ্মণ, কাত্যায়ন বৈশ্য ও উপলি শূদ্র ছিলেন। ইঁহারা সকলেই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক, সকলেই বুদ্ধদেবের নিজ শিষ্য। উপলি যদিও শূদ্র তথাপি বুদ্ধদেবের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। যখন বুদ্ধদিগের প্রথম ধর্ম্মসভা হয়, বুদ্ধ উপলির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিয়াছিলেন উপালিই বিনয় ধর্ম্মপ্রচারের প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র। বিনয়ধর্ম্ম সাধারণ লোকদিগের জন্য। বুদ্ধদেব বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন শূদ্রদিগের দ্বারাই তাঁহার মত সাদরে গৃহীত হইবে এবং তাহার জন্য একজন শূদ্রই বিশেষ উপযুক্ত। উপলি ধর্ম্ম ভ্রাতা কশ্যপের সমস্ত প্রশ্নে সম্যক্ উত্তর করিয়াছিলেন।

সাকার উপাসক হইলেন, তাঁহাদের মত হইল "সাধকানাংহিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা।" সাধকেরা নিরাকার ব্রহ্ম বুঝিতে পারেনা অতএব ঈশ্বরের রূপকল্পনা আবশ্যক।

(অন্ত্যজ বর্ণ)

অনার্য্যগণ যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে প্রাচীন স্মৃতিতে আমরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিমাত্র বর্ণের উল্লেখ পাই—কিন্তু অনেক পুরাণ এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে বর্ণ পাঁচটি—এই শেষ বর্ণের নাম অন্ত্যজ বা নিষাদ। মাধবাচার্য্য ঋগ্বেদের টীকায় উহাদের নিষাদ নাম দিয়াছেন; অন্যান্য পুরাণে নিষাদ ও অন্ত্যজ শব্দ এক পর্য্যায়ক রূপে ব্যবহৃত। আমরাও আধুনিক সমাজে দেখিতে পাই একদল শূদ্রের জল ব্রাহ্মণেরা ব্যবহার করেন আর একদলের করেন না। যাহাদের জল ব্যবহার করা যায় তাহারা সৎশূদ্র যাহাদের না যায় তাহারা অন্ত্যজ। আহীরি গোয়ালা সৎশূদ্র, দেশী গোয়ালা অন্ত্যজ। চাষার মধ্যে সদ্গোপ সৎশূদ্র, কৈবর্ত্ত অন্ত্যজ,ডুলে প্রভৃতি ছোটলোকও এই অন্ত্যজ দলের মধ্যে।

(জাত্যভিমান)

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ব্রাহ্মণেরা এত ঘৃণা করিলেও এই সকল জাতি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে রহিল কেন? তাহার এক কারণ এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে আসিবামাত্র উহাদের একটু জাত্যাভিমান জন্মে, এক জন ডুলেকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলাম সেও বলিল মুচি মুসলমান হইতে ডুলে উৎকৃষ্ট জাতি. মুচি চাম কাটে,মুসলমানের ব্রাহ্মণ নাই। ব্রাহ্মণদিগের সংশ্রবে উহাদের এই জাত্যভিমান টুকু জন্মিয়াছে।

(কোথায় অনার্য্যদীক্ষা আরম্ভ হয়)

অনার্য্যদিগের প্রথম দীক্ষা দক্ষিণ রাজবারায় হয়। দক্ষিণ রাজবারায় নিষধ বলিয়া একটি রাজত্ব ছিল। নূতন যে পঞ্চম বর্ণ পুরাণে উল্লিখিত আছে সে পঞ্চম বর্ণের নাম নিষাদ (নিষাদ ও নিষধ একই শব্দ) তাহাতে বোধ হয় প্রথম অনার্য্য প্রবেশ এইখানেই ঘটে। দক্ষিণ রাজবারায় হিন্দুদিগের প্রধান স্থান। শিব ও শক্তির উপাসনা ব্রাহ্মণেরা এই স্থান হইতেই প্রাপ্ত হন। কারণ এখনও দেখা যায় শৈবদিগের একটী প্রধান দুর্গ রাজবারা। এইরূপে আপন ধর্ম্মে পৌত্তলিকতা প্রবেশ করাইবামাত্র হিন্দুদিগের দল বাড়িয়া উঠিল।

(ব্রাহ্মণদিগের উৎসব)

অশিক্ষিত লোকদিগের পক্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম যত সুবিধা বৌদ্ধ এত নহে। ব্রাহ্মণধর্ম্মের বারটী সংস্কার আছে। একটী ছেলে হইলে গর্ব্ভহইতে আরম্ভ করিয়া ছেলের বিবাহ পর্য্যন্ত লোকে বারবার আমোদ করিতে পারিবে এবং ঐ বারটী সংস্কারই তাহারা সমস্ত জীবনের মধ্যে সুখের দিন বলিয়া মনে করে। বৌদ্ধদিগের এরূপ ছিল কি না সন্দেহ। শেষ

বৌদ্ধদিগেব মধ্যেও পৌত্তলিকতা প্রবেশ করিয়া ছিল কিন্তু সে এক বুদ্ধেব উপাসনা মাত্র—হিন্দুদিগেব পৌত্তলিকতা দেশ-ভেদে ভিন্ন। যে দেশেব লোক যে দেবতা চায় সে সেই দেবতা উপাসনা কবিতে পাবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বযং বলিয়াছেন।

যো যো যাং যাং তনু-ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতু-
মর্হতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধা-
ম্যহং॥

শিবভক্ত শিব উপাসনা কবিল—বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণু উপাসনা কবিল—অথচ ব্রাহ্মণেব সর্ব্বত্র মান্য হইল। উপবিউক্ত প্রবন্ধে প্রমাণ হইবে ইতব লোককে স্বধর্ম্মে আনযন কবিবাব জন্য বাহ্যিক যে সকল আড়ম্বব আবশ্যক,তাহাতে বৌদ্ধ অপেক্ষা ব্রাহ্মণেব সৌভাগ্য অধিক।

(ভক্তিশাস্ত্র)

মতামত সম্বন্ধেও সাধাবণ লোক মোহিত করিবাব পক্ষে হিন্দুদিগেব প্রাধান্য ঘটিয়া উঠিল। বৈদিক সময়ে যাগযজ্ঞ স্বর্গলাভেব উপায় ছিল। বুদ্ধিবিপ্লবেব সময় জ্ঞানই হয সাযুজ্য, নয় সালোক্য, না হয় নির্ব্বাণ লাভেব একমাত্র উপায় পবিগণিত হয়। এই সময়ে ভক্তিমার্গ ব্রাহ্মণেরা উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। শাণ্ডিল্যদেব বেদ উপনিষদাদিতে নিঃশ্রেযস্লাভের উপায় না দেখিয়া এই ভক্তিমার্গ প্রচার করেন। এই ভক্তি এই সময়ে হিন্দুদিগের মূলমন্ত্র হয। ভক্তি কাহাকে বলে শাণ্ডিল্যেব প্রথম সূত্র এই—

"সা পরানুবক্তি বীশ্ববে।"

ঈশ্ববে অর্থাৎ যে কোন দেবতায় পবম অনুবাগই ভক্তি—সকলের সার ভক্তি; মুক্তিতার দাসী। পুরাণ ববাবর এই দুই সুবে গাইয়াছেন, ভক্তি ও জ্ঞান। জ্ঞান শিক্ষিতদিগের জন্য, ভক্তি অশিক্ষিতের জন্য। ভক্তিতে শুদ্ধ যে অনার্য্যগণ মোহিত হন এমন নহে—ভক্তিতে অনেক খাটি বৌদ্ধও গলিয়া দেবোপাসক হইযাছেন। ভক্তিশাস্ত্র যে নাস্তিক্য নিবাবণেব প্রধান উপায়, তাহা শুদ্ধ যে আমবাই বলিতেছি এমন নহে, প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটককাব তাঁহাব আশ্চর্য্য রূপক গ্রন্থে চার্ব্বাক্, মহামোহ, বৌদ্ধ প্রভৃতি যে সকল হিন্দুধর্ম্মবিবোধী পাত্র প্রবেশ করাইয়াছেন, তাহাদের কেবল ভয যে, যোগিনী বিষ্ণুভক্তি তাহাদিগকে না তাড়াইতে পাবে। ভক্তি গাঢ হইয়া একবাব মস্তকে প্রবেশ করিলে লোকের বুদ্ধিগুলি উচ্চতব সমালোচনায় কিরূপ অপারগ হয় তাহা আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং চার্ব্বাক ও বৌদ্ধ যে উহাকে ভয় করিবে আশ্চর্য্য কি?

(বেদীতে বসিযা ধর্ম্ম প্রচার)

হিন্দুরা প্রচার কার্য্যও ছাড়েন নাই। বৌদ্ধেরা তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচাব করিত। হিন্দুবা শেষ পুবাণ পাঠ আরম্ভ কবিলেন। পুবাণে পাই যে নৈমিষারণ্য বা আর

কোন স্থানে পরাশর বা অন্য কোন ঋষি এই এই কথা বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় হিন্দুরা পরাশরাদি বৈদিক ঋষির নাম করিয়া আপনারা পুরাণ প্রচারকার্য্যে রত হন।

বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মব্যাখ্যা অপেক্ষা হিন্দুদিগের পুরাণপাঠের মোহিনী শক্তিও অবশ্য অধিক। বৌদ্ধেরা বলিলেন দান-কর—ব্রাহ্মণ বলিলেন দান করিয়া বলি রাজার সর্ব্বস্ব গেল। শেষ আত্মদেহ পর্য্যন্ত দান করিলেন। বৌদ্ধ বলিলেন সত্য কথা কও—ব্রাহ্মণ বলিলেন যুধিষ্ঠির একটী অর্দ্ধ মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন, এই পাপে নরক দর্শনযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন।

এই পুরাণ প্রচার আরম্ভ হইয়া অবধি অশিক্ষিতগণকে হিন্দুমতে আকর্ষণ করিবার বিশেষ সুবিধা হইল।

(ব্রাহ্মণ শ্রমণের কার্য্যদক্ষতা এবং অনুরাগ)

উপরি উক্ত প্রবন্ধে বোধ হইল, সাকার উপাসনা, ভক্তিমার্গ উপদেশ ও পুরাণ প্রচার এই তিন উপায়েই ব্রাহ্মণেরা জয়ী হন। ইহার উপর আর একটি কারণও ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম চালাইবার লোক কাহারা? সংসারত্যাগী বিবাহাদিশূন্য ভিক্ষুগণ। প্রথম ধর্ম্মের প্রচার সময়ে ভিক্ষুদিগের দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছিল। উহারা প্রাণপণে ধর্ম্ম প্রচার চেষ্টায় রত ছিল। সংসারের সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া কেবল প্রাণপণে ধর্ম্মের জন্য চেষ্টা করিত। কিন্তু সেই ধর্ম্মার্থ উৎকট যত্ন কালসহকারে নষ্ট হইল। যখন ভিক্ষুগণ রাজা রাজপুরুষগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন, যখন মঠের অতুল ঐশ্বর্য্য হইল, তখন আর ধর্ম্মপ্রচার কে করে। নিয়মমত কার্য্য করিয়াই ভিক্ষুরা ক্ষান্ত থাকিত। ও'দিকে ব্রাহ্মণদিগের বড় সুবিধা—তাঁহাদের ধর্ম্ম তাঁহাদের জীবনোপায়। একজন ব্রাহ্মণ যদি একটি গ্রাম হিন্দু করিল, সে গ্রাম পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে তাহার থাকিবে। সুতরাং একদিকে স্বার্থ সাধনার্থে উৎকট পরিশ্রম আর দিকে সম্পূর্ণ উদাসীনতা, ইহার মধ্যে পড়িয়া বৌদ্ধধর্ম্ম উৎসন্ন হইল। ব্রাহ্মণদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইল।

(শ্রমণের হীনবল হইবার আর একটি কারণ)

ভারতবর্ষ যেরূপ দেশ ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বলবান্, বৌদ্ধেরা যদি প্রাণপণে ভারতবর্ষ হইতে ব্রাহ্মণদিগকে এককালীন দূরীভূত করিয়া তাহার পর বিদেশে প্রচারক পাঠাইত, তাহা হইলে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু তাহা না করিয়া, ঘরের শত্রু বিনাশ না করিয়া, যে সকল লোক ধর্ম্মবিষয়ে উৎকট শ্রম করিয়াছে ও করিতে পারে, এমন সকল লোক বাছিয়া বাছিয়া বিদেশে পাঠাইত। প্রথম অবস্থায় তাহাতে ক্ষতি হয় নাই, যেহেতু নূতন দীক্ষিতদিগের মধ্যে সকলেই সমান উদ্যোগী। কিন্তু শেষ—যাহারা কার্য্যক্ষম

তাহারাই দেশ হইতে বাহির হইতে লাগিল; ব্রাহ্মণের সুবিধা হইল। এই সকল প্রচারকেরা বিদেশে বিলক্ষণ শ্রম করিয়াছে, ইহাদের মধ্যেও অনেক অগষ্টিন্ স্কোয়ার্টজ্ ডফ সাহেব ছিল। ইহারা বহুসংখ্যক বৌদ্ধগ্রন্থ তত্তদ্দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। বীল সাহেবের চৈন পুস্তকের তালিকায় অনেক এদেশীয় লোক অনুবাদক ছিলেন দেখা যায়।

(বৌদ্ধ ধর্ম্মনাশের অপর কারণ)

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার যখন আরম্ভ হয় তখন যে উহারা শুদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের সহিতই বিরোধ করিয়াছিল এমন নহে। প্রথম বিপ্লব সময়ে ব্রাহ্মণবিরোধী অথচ বৌদ্ধ শত্রু আর এক দল লোক ছিল। তাহারা তৈর্থিকোপাসক, আমরা প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে পূরণ নামক একজন তৈর্থিকের নাম দেখিতে পাই। প্রথম ইহারাও বৌদ্ধদিগের উন্নতিতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চুপ করিয়া থাকে। পরে যখন বৌদ্ধেরা বিধর্ম্মী বলিয়া আপন দলের অনেক লোককে বৌদ্ধসঙ্ঘ বা বৌদ্ধ সমাজ হইতে দূর করিয়া দিতে লাগিল, তখন তৈর্থিকোপাসকেরা উহাদের সঙ্গে মিলিতে লাগিল। বৌদ্ধদিগের দুর্ব্বলতার আর একটি কারণ হইল। বৌদ্ধগণ আর এক দোষ করিতেন তাঁহারা দলাদলি বড় ভাল বাসিতেন। বুদ্ধদেব মরিবার ২০০ বৎসরের মধ্যে ১৮টা স্বতন্ত্র দল হয় শুনিতে পাই। ব্রাহ্মণের পক্ষে যত দল হউক না সবই উহাদের সহিত একতাসূত্রে বদ্ধ, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে উচ্চতম অদ্বৈতবাদী হইতে জঘন্য লিঙ্গোপাসক পর্য্যন্ত এক রাজনৈতিকসূত্রে বদ্ধ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মে সেটি ছিল না। 'তুমি লবণ খাইবে আমি খাইব না' এই লইয়া উহাদের একবার বড় দলাদলি হয়। ইউরোপে আজিও ঠিক এইরূপ চলিতেছে। কাথলিকেরা পোপ মানিলেই আপনার লোক বলিয়া স্বীকার করেন। প্রোটেষ্টেণ্টেরা কি হাত ভিন্নমতাবলম্বীদিগকে আপন চর্চ্চ হইতে দূর করিয়া দিতেছেন। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, ইহাতে কাথলিকের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতেছে। ব্রাহ্মণের ক্ষমতাও সেকালে ঠিক এইরূপে বাড়িয়াছিল।

(ভারতবর্ষে বুদ্ধদিগের শেষদশা অন্তর্জ্জগতে)

কনিঙহাম বলেন সেকন্দর সাহেব সময় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের তুল্য সম্মান ছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে দেখিতে পাই অযোধ্যায় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণে ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধ। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের পর শ্রমণের জয় হয়। ফাহিয়নের সময় শুনিতে পাই, দুইই সমান; বৌদ্ধেরা যেন একটু অধিক বলবান্। হিয়ানসাঙের সময় বিহারের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কি? কনিঙহম যাহা বলিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিয়া আমরা তাহার এই কারণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহের বলে অনেক বৌদ্ধ সংসারী হিন্দু হইয়া গিয়া-

ছেন, যাহাদের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া বিহারে পোষণ হইত, সে সকল লোক আর বিহারবাসীদিগকে ভিক্ষা দিতে সম্মত নহে। সুতরাং অনেক মঠ উঠিয়া গেল। ক্রমে যে সকল বিহারের জমী-দাবী প্রভৃতি ছিল তাহাই রহিল, অবশিষ্ট উঠিয়া গেল। এই সকল বিহারে বৌদ্ধ দিগের দার্শনিক মতের তর্ক বিতর্ক হইত এবং বিদ্যাবিষয়ে তাহাদের বিশেষ খ্যাতিও ছিল। শঙ্করাচার্য্য এইরূপ মঠবাসীদিগেরই সঙ্গে বিচার করিয়া অনেককে আত্মাবলম্বিত শুদ্ধাদ্বৈতমতে আনয়ন করেন। যেখানে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি ছিল, সেইখানে শঙ্করাচার্য্য শিষ্যেরা শুদ্ধা-দ্বৈত মতানুযায়ী এক প্রকার পৌত্তলিক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। যাহা বাকি ছিল ন্যায়শাস্ত্রের বহুল প্রচার সময়ে ১০ম বা ১১শ শতাব্দীর বিচার কালে তাহারও ধ্বংস হইল। উদয়নাচার্য্যের আত্মতত্ত্ববিবেকই বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে লিখিত শেষ গ্রন্থ। কিন্তু বোধ হয় তখনও বৌদ্ধধর্ম্ম নির্ম্মূল হয় নাই। প্রবোধ চন্দ্রোদয়াদি কাব্যগ্রন্থে উহার স্মৃতি দে-খিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় ১৫ শতাব্দীতে যে নানা প্রকার নূতন নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় ঐ সময়ে উহার যা কিছু বাকি ছিল, তাহার শেষ স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। তাহার পর প্রায় চারিশত বৎসর আমরা উহাদের নামও শুনিতে পাই নাই। এখন আবার বৌদ্ধদিগকে সমাদর করিতে শিখিয়াছি।

(বাহ্যজগতে)

অন্তর্জগতে বৌদ্ধদিগের যে আধিপত্য ছিল তাহার কথা উক্ত হইল। বাহ্য জগতে উহাদের আধিপত্য অনেক অগ্রেই উৎসন্ন গিয়াছিল। প্রথম প্রচার সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী রাজারা বুদ্ধকে বিস্তর উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু আইন করিয়া প্রজাদিগের বুদ্ধের নিকট গমন বন্ধ করিয়াছিলেন। দেবদত্ত উঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ঘাতক পুরুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন। শেষ দেখিতে পাই বৌদ্ধেরাই উৎপীড়ক, কনিংহামের *এনসেণ্ট ইণ্ডিয়ায় দেখি ৭ম শতা-*ব্দীতে অনেক বৌদ্ধ রাজাই উৎপীড়ক; বৌদ্ধ কুচবেহার অঞ্চলে একজন ব্রাহ্মণ রাজা হইয়া হিন্দুদিগের উপর দারুণ অত্যাচার করিতেছে। বুন্দেল খণ্ডের নিকটও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাতেই তাদৃশ রাজাদিগের শেষ দশা যে সন্নিকট, বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। শঙ্করা-চার্য্যের সময়ে একজনও বৌদ্ধ রাজার নাম নাই।

বৌদ্ধেরা এ দেশে না থাকুক আমরা যদি প্রণিধান করিয়া দেখি তাহাদের ধর্ম্ম তাহাদের আচার আমাদের নিত্য কর্ম্মমধ্যে নিতাই দেখিতে পাই।

বঙ্গে ধর্ম্মভাব।

আজ কাল আমাদের দেশে নাস্তিকতার কিছু প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কৃতবিদ্যমণ্ডলীমধ্যে যাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ে একেবারে উদাসীন নহেন, তাঁহারা প্রায় নাস্তিক। সাধারণ লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা প্রায় পণ্ডিতদিগের অনুসরণ করেন। এই কারণে, যাহারা কৃতবিদ্য নহে তাহাদের মধ্যেও অনেকে দেখাদেখি উদাসীন অথবা আস্থাশূন্য।

যাঁহাদের কিছু মাত্র লেখা পড়া বোধ আছে, তাঁহারা সকলেই প্রায় হিন্দুধর্ম্মে আস্থাশূন্য, কেবল লোকলজ্জা ভয়ে, সমাজচ্যুত হইবার আশঙ্কায়, অহঙ্কার এবং আত্মাদরের খাতিরে মৌখিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। হিন্দুধর্ম্ম কলহের উপযুক্ত নহে* বলিয়াই আমরা উহার বন্ধু। হিন্দুধর্ম্ম দুর্ব্বল, জরাজীর্ণ, নিরাশ্রয় বলিয়াই আমরা উহার সহায়। আর ব্রাহ্মেরা উহার শত্রু, অশুভাকাঙ্ক্ষী, উচ্ছেদাভিলাষী, এজন্যও অনেকে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ—যুক্তিদ্বারা হিন্দুধর্ম্ম সমর্থন করিতে প্রস্তুত। নতুবা, শ্রদ্ধা বা আস্থা আছে বলিয়া বোধ হয় না। আপনার সুখের, স্বার্থের, বা আমোদের প্রতিকূল হইলে প্রায় কাহাকেও হিন্দুধর্ম্মের মুখ রাখিতে দেখা যায় না। হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মকাণ্ডও কতক কতক শিক্ষিত দলের আছে, কিন্তু সে অন্য কারণে। তাঁহারা দেবদেবীকে প্রকাশ্যে প্রণাম করেন, কতকটা উদাসীন ভাবে, কতকটা পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ, কতকটা হয় ত লোকের চক্ষে ধূলা দিবার অভিপ্রায়ে। বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব করেন, কতকটা পিতা মাতার খাতিরে, কতকটা বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে, কতকটা আমোদের জন্য, আর কতকটা—ঠিক বলা যায় না, কিন্তু বোধ হয় যেন শ্রীচরণ কমল যুগলের ভয়ে। কেহ না মনে করেন, হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা হইতেছে। হিন্দুধর্ম্ম ভাল কি মন্দ, শ্রদ্ধার উপযুক্ত কি না, সে কথা আমরা বলিতেছি না;

* শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' ইত্যভিধেয় পুস্তকের বিশমোল্লায় গলৎ আছে। তিনি যে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ঠিক হিন্দুধর্ম্ম নহে। হিন্দুধর্ম্ম যে কি, তাহা নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের যে কোন স্থলে যে কোন মত পাওয়া যায়, তাহাই হিন্দুধর্ম্মের অংশ। এবং সংস্কৃতের বিশাল সাহিত্যে নাই হেন কথা নাই, নাই হেন মত নাই। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম কি, তাহা বলা দায়। রাজনারায়ণ বাবু যে সকল মত লইয়া বিচার করিয়াছেন, ঠিক তাহার বিপরীত মতও হিন্দুধর্ম্মের অংশ বলিয়া পরিগৃহীত। রাজনারায়ণ বাবু যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়াছেন, তাহা হিন্দুধর্ম্ম রূপ মহাসাগরের একটা ঢেউ মাত্র এখনকার হিন্দুসমাজ যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে, তাহাতে সে ঢেউয়ের নাম গন্ধও নাই।

সমাজমধ্যে ধর্ম্মভাবের কিরূপ অবস্থা, তাহাই নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অবস্থা আরও শোচনীয়। ভক্তি শ্রদ্ধা দূরের কথা, অনেক ভদ্র লোকে ব্রাহ্ম বলাইতে লজ্জা বোধ করেন, ব্রাহ্ম বলিলে অপমান বোধ করেন। অথচ ব্রাহ্মধর্ম্মে এতই যে কি লজ্জা বা অপমানের কথা আছে, তাহাও বুঝা যায় না। সে যাহাই হউক, লজ্জা থাক বা না থাক, ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর লোকের আস্থা নাই। যাঁহারা নাম লেখাইয়া কুলত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র,—তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ আবার গোময় খাইয়া সমাজে ফিরিয়াছেন, দেখা গিয়াছে,—কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম সমাজকর্তৃক সমাদৃত নহে। অশিক্ষিত লোকে পূর্ব্বাবধিই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী, এক্ষণে আবার কৃতবিদ্যেরাও ইহার প্রতিকূলে। দুই চারি দশ জন কৃতবিদ্যের আস্থা থাকিতে পারে, কিন্তু দুই চারি জনের কথা ধর্ত্তব্য নহে। আর নূতন করিয়া ব্রাহ্ম হইতেও প্রায় দেখা যায় না। ব্রাহ্মধর্ম্মের দিন কাল গিয়াছে। বিশেষতঃ যাঁহারা প্রকাশ্য, নাম লেখান, রেজেষ্টরি করা ব্রাহ্ম, তাঁহাদের মধ্যেও সকলে আস্থাবান্ নহে। অনেকে ব্রাহ্ম, কেবল লঘু গুরুভেদ উঠাইবার জন্য, কেবল ছত্রিশ জাতি লইয়া কুক্কুটমাংসের মহোৎসব করিবার জন্য, কেবল পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিলোপ করিবার জন্য। সমাজে যাতায়াত করেন, কেহ আমোদ দেখিতে, কেহ গান শুনিতে, কেহ সময় কর্ত্তন করিতে, কেহ লোকের চক্ষে ধূলা দিতে, কেহ প্রধান আচার্য্যের মন রাখিতে। এ স্থলেও বলিতেছি, কেহ না মনে করেন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের নিন্দা করিতেছি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পাইল না, তাহার কতকগুলি কারণ দেখা যায়। একতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশীয় ধর্ম্ম—বঙ্গ দেশেই ইহার উৎপত্তি। থিওডোর পার্কার ইহার সেণ্ট পল বটেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্ম হইয়াছে। যে খানে যে ধর্ম্মের উৎপত্তি, সেখানে সে ধর্ম্ম প্রায় প্রবল হয় না। দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল নাই; থাকিলেও দৃঢ় নহে। হিন্দুর বেদ আছে, খৃষ্টীয়ানের বাইবেল আছে, মুসলমানের কোরাণ আছে, পারসিকের জেন্দ আবেস্তা আছে—ব্রাহ্মের কি আছে? তিনি কিসের দোহাই দিতে পারেন? তাঁহার দোহাই দিবার জিনিষ দুটি—প্রকৃতি এবং সহজজ্ঞান। কিন্তু তিনি যে রূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তেমন ঈশ্বরের কথা প্রকৃতি কিছু বলে না। সহজজ্ঞানও এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারে না। যদি পারিত, তাহা হইলে ঈশ্বর লইয়া এত মতভেদ হইত না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে দেশে স্থান পাইল না, তাহার আর একটা কারণ বোধ হয় আমাদের আত্মাদর। পরের শিষ্য হইতে গেলেই আপনাকে একটু ছোট হইতে

হয়। যদি কাহারও অনুসরণ করিতেই হয়, তবে না হয় স্পেন্‌সর, কোমৎ, মিলের অনুসরণ করিব। নতুবা যার তার মতে ডিটো দিয়া, যাকে তাকে গুরু স্বীকার করিয়া আপনাকে ছোট স্বীকার করিব কেন? এই রূপ নানা কারণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবল হইতে পারিল না। তাহার সকল গুলি নির্দ্দেশ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই হয় কঠোর নাস্তিক, নয় কঠোরতর উদাসীন। কিন্তু একটা আশ্চর্য্য এই যে, যাঁহাদের দোহাই দিয়া ইঁহারা নাস্তিক, তাঁহারা কেহই ঠিক নাস্তিক নহেন। ঈশ্বর নাই, এমন কথা কেহই বলেন না। মিল ঈশ্বর স্বীকার করেন। বাইবেলের সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর স্বীকার করেন না বটে, স্রষ্টা স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু নির্ম্মাতা স্বীকার করেন। জগতের নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়া তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আবার সেই নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়াই নির্ম্মাতার শক্তির সীমাবদ্ধতা সংস্থাপন করিয়াছেন, কেননা কৌশলাবলম্বন শক্তির অভাবের পরিচায়ক। সে যেমনই হউক, মিল নাস্তিক নহেন। ডারুইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন নিয়মে যদিও নির্ম্মাণ কৌশল তর্কের খণ্ডন হইয়া গিয়াছে, তবু ডারুইন নাস্তিক নহেন। তিনি স্পষ্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার করেন। স্পেন্‌সরও নাস্তিক নহেন। প্রচলিত ধর্ম্ম সকল যে ভ্রমাত্মক, তাহা তিনি বলেন বটে, কিন্তু এই সকল ভ্রান্ত ধর্ম্মের মূলে যে সত্য আছে, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহার ঈশ্বর—বিশ্বব্যাপী অজ্ঞেয় শক্তি। বৈজ্ঞানিকেরা এত দিন আলোক, তাপ, তাড়িত প্রভৃতি দ্বারা বিশ্বকার্য্যের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, কিন্তু অধুনাতন সর্ব্বপ্রধান বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন, যে এ সকলও চরম শক্তি নহে—বিশ্বব্যাপী এক মহান্ শক্তির ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র। এই বিশ্বব্যাপী শক্তিকে স্পেন্‌সর ঈশ্বর বলেন। কোমৎ আস্তিক নহেন বটে, কিন্তু নাস্তিকও নহেন। ঈশ্বর নাই, এমন কথা তিনি বলেন না। তিনি বলেন, জগতের ঘটনা পরম্পরা দেখ, এবং এই ঘটনা পরম্পরা যে নিয়মে বদ্ধ তাহাদের অনুসন্ধান কর। এতদতিরিক্ত আর কিছু আছে কি না, তাহা জানিবার আমাদের অধিকার নাই—তাহা অজ্ঞেয়—সুতরাং তাহার অনুসন্ধান করা পণ্ডশ্রম মাত্র। নাস্তিক হওয়া দূরের কথা, বরং নাস্তিকদিগকে তিনি মতিভ্রান্ত এবং অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

তবে ইঁহারা নাস্তিক হইলেন কেন? কিন্তু ইঁহারাও উত্তর দিতে পারেন,—নাস্তিক না হইবই বা কেন? তোমার স্পেন্‌সর, কোমৎ, মিল কিছু বেদ নহেন, যে শ্রীমুখ দিয়া যাহা বাহির হইবে তাহাই অভ্রান্ত। তাঁহারা এক এক জন মহা পণ্ডিত বটেন, তাঁহাদের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া অনেক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি

অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহারা যাহা কিছু বলিবেন তাহাই বিশ্বাস করিতে হইবে, যতটুকু বলিবেন ঠিক তত টুকুই বিশ্বাস করিতে হইবে এমনই বা কি শাস্ত্র আছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করাইতে চাও, তাহার প্রমাণ দাও—কেবল ইহার উহার নামে কে বিশ্বাস করিবে? প্রমাণ কিছু আছে কি?

এ কথার সচরাচর এই রূপ উত্তর প্রদত্ত হইয়া থাকে,—ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ দেওয়া যায় না বটে, কিন্তু অস্তিত্বের প্রমাণাভাবে নাস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এবং ঈশ্বর নাই, এ দুইটি প্রতিজ্ঞায় অনেক প্রভেদ। যাহা কিছুরই অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, তাহাই নাই, এ কথা বলা যায় না। আর,—ঈশ্বর যে নাই তাহারই বা প্রমাণ কি?

নাস্তিকেরা সহজে নিরস্ত হইবার লোক নহেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর নাই, এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এ দুইটা এক কথা নহে বটে, কিন্তু সচরাচর কি রূপ করিয়া থাকেন? ইহাই সচরাচর দেখা যায়, যে যতক্ষণ কোন বিষয়ের প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাহার নাস্তিত্বেই লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। চতুর্ভুজ মনুষ্য যে নাই, তাহার কিছুই প্রমাণ দিতে পারেন না, তবে তাহা নাই বলিয়া বিশ্বাস করেন কেন? কেবল এই কারণে, যে তাহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। যদি তাহাই হইল, তবে ঈশ্বর সম্বন্ধেই বা অন্য প্রণালী অবলম্বন করিব কেন? ঈশ্বর নাই, এ কথারও কোন প্রমাণ দেওয়া যায় না বটে, কিন্তু প্রমাণ চাহিবারও কাহারও অধিকার নাই। আমরা প্রমাণ দিতে বাধ্য নহি। যিনি অস্তিত্ব পক্ষ অবলম্বন করিবেন, প্রমাণের ভার তাঁহারই উপর থাকা উচিত এবং যুক্তিসঙ্গত। সে প্রমাণ যতক্ষণ দিতে না পারিবেন, ততক্ষণ আমরা মানিব না, মানিতে বলিতেও পারেন না।

এ বিবাদের মীমাংসা করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই—সাধ্যও নাই। যাহা বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জগৎ, উভয় জগতের কারণ, উভয় জগতের আধার, তাহা বাহ্য জগৎ এবং অন্তর্জগৎ হইতে অবশ্য বৃহত্তর, সুতরাং বাহ্যজগৎ তাহাকে কেমন করিয়া পাইবে—অন্তর্জগৎ তাহাকে কেমন করিয়া ধরিবে? যাহার অজ্ঞেয়ত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহার উপর বাক্যব্যয় করা এক প্রকার বেকুবি, কেননা বাক্যব্যয় করিলেই তাহার অজ্ঞেয়ত্ব পাকতঃ অস্বীকার করা হয়।

নাস্তিকেরা আরও বলেন যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসে সমাজের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ঈশ্বরের বিশ্বাস ধর্ম্মের একটা অঙ্গ, এবং ধর্ম্মের সম্বন্ধ পরলোকের সঙ্গে, ইহলোকের সঙ্গে নহে। ইহলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ নীতির। অতএব লোকে ধর্ম্মে আস্থাবান্ হউক বা না

হউক, তাহাতে সমাজের কিছু অনিষ্ট নাই।

ঈশ্বরে বিশ্বাসাবিশ্বাসে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সমাজের অনিষ্ট নাই, ইহা আমরাও স্বীকার করি। প্রত্যেকের ধর্ম্ম প্রত্যেকের নিজের কথা। তুমি যদি ঈশ্বর না মান, তাঁহার ফল তুমিই ভোগ করিবে—অন্যকে করিতে হইবে না। যদি নরকে যাইতে হয়, তুমিই যাইবে, অপর কাহাকেও যাইতে হইবে না। নাস্তিকতা সামাজিক পাপ নহে। কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে সমাজের অনিষ্ট যদিও নাই, গৌণসম্বন্ধে আছে। তাহা আমরা দেখাইতেছি।

সংসারে ইহাই সচরাচর দেখা যায় যে, যখনই আমরা কোন প্রাচীন তত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া নূতন তত্ত্ব অবলম্বন করি, তখনই কিয়ৎ পরিমাণে পরিত্যক্ত তত্ত্বের শত্রু হইয়া উঠি। পূর্ব্বে যে ভাল বাসিয়াছিলাম, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তখন অযথা ঘৃণা করি। সহানুভূতিজনিত অনুরাগ বিরুদ্ধানুভূতিজনিত বিরাগে পরিণত হয়। পূর্ব্বে যাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আদর করিয়াছি, পরে তাহাকেই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া অশ্রদ্ধা করি—অমূল্য বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম, মূল্যহীন বলিয়া ঘৃণায় বর্জ্জন করি—হয় ত প্রকাশ্য অবমাননা করি। এবং এই শত্রুতার বেগ প্রায় পূর্ব্বানুরাগের বেগানুযায়ী হইয়া থাকে। পিউরিটানেরা পূর্ব্বতন ধর্ম্মমন্দির সকলকে ঘোড়া বাঁধিবার আস্তাবল করিতেন। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় লোকে 'মাস'—পুস্তকের পাতা ছিঁড়িয়া বন্দুকে দিবার কাগজ করিত, 'চালিসে' করিয়া মদ্যপান করিত, গির্জার মধ্যে সুরাপানোদ্দীপ্ত হইয়া বেলেল্লাগিরি করিত। কালাপাহাড় ব্রাহ্মণসন্তান এবং হিন্দুধর্ম্মে পরম আস্থাবান্ ছিলেন। সেই কালাপাহাড় মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া জগন্নাথ দেবকে পোড়াইলেন।

ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, পরিত্যক্ত ধর্ম্মে যদি কিছু সত্য থাকে—থাকিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা—তাহাও দেখিতে পাই না, দেখিতে চাহি না—হয় ত দেখিয়াও দেখি না। তাহাতে যদি কিছু ভাল থাকে—থাকিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা—তাহারও উপেক্ষা করি—হয় ত মন্দ মনে করি। যাহাকে দেখিতে পারি না, তার সব মন্দ।

এই কয়টি মনে রাখিয়া দেখা যাউক, নাস্তিকতায় কোন অনিষ্ট আছে কি না। প্রায় সকল সমাজেই ধর্ম্ম এবং নীতি একত্র সম্বদ্ধ দেখা যায়; ধর্ম্মনির্লিপ্ত নীতিশাস্ত্র বা নীতিনির্লিপ্ত ধর্ম্ম কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং, পূর্ব্বোক্ত কারণে, ধর্ম্ম পরিত্যাগের সঙ্গে প্রায়ই নীতিরও অপচয় ঘটে। নীতির অপচয় যে সামাজিক অমঙ্গল, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই।

আর একটা অনিষ্ট এই ঘটে, যে ধর্ম্ম পরিত্যাগের সঙ্গে ধর্ম্মভাবের আবশ্যকতা

পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যথনই আমরা ভ্রান্ত বলিয়া পূর্ব্ববিশ্বাস পরিত্যাগ করি, তখনই ভাবিয়া লই যে, এই ভ্রমের সঙ্গে সত্য বা ভাল কিছু নাই —থাকিতে পারে না। ধর্ম্মপরিত্যাগ করি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাবের উপকারিতা পর্য্যন্ত উপেক্ষা করি। বঙ্গের নাস্তিক দলে তাহাই ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। অনেকে ধর্ম্মবিশেষের সঙ্গে ধর্ম্মভাবও উড়াইতে চাহেন। অনেকের ভরসা আছে, যে কালে ধর্ম্মভাব পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবে।

সমাজমধ্যে এরূপ মতের বহুলপ্রচার হইতে দেখিলে আমরা বাস্তবিকই ভীত হই। কোন সমাজ মধ্যে ধর্ম্মভাবের অপচয় হইতে দেখিলে আমাদের মনোমধ্যে সমাজের অনিষ্টাশঙ্কা উপস্থিত হয়। ধর্ম্মভাবের কার্য্যকারিতায় আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আমাদের বিশ্বাস নিতান্ত অমূলকও নহে। প্রাকৃতিক পরিণতিবাদের* সাহায্যে ধর্ম্মভাবের কার্য্যকারিতা সংস্থাপন করা যায়। নিম্নতর জীব সকলের ধর্ম্মভাবের অস্তিত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, কোন চিহ্ন দেখা যায় না। অতএব ইহা স্বীকার্য্য যে ধর্ম্মভাবটা চৈতন্যের স্বভাবপ্রদত্ত, অবশ্যস্থাতব্য অংশ নহে। জীবের ক্রমপরিণতিতে উহা মানবমানসে আবির্ভূত হইয়াছে। অতএব ইহা সিদ্ধ যে, মনুষ্যজীবনের প্রয়োজননিচয়ের সঙ্গে ধর্ম্মভাবের উপযোগিতা আছে। সুতরাং উহা মানবের সুখবিধায়িনী, শুভপ্রসূতি এবং কল্যাণদায়িনী।

ধর্ম্মভাবের উপকারিতা অন্য রকমেও দেখা যায়। আজি, এই নাস্তিকতার মধ্যেও,ধর্ম্মভাব অনেক সৎকার্য্যের মূল; অনেক সৎকীর্ত্তির উত্তেজক, অনেক দেশহিতকর ব্যাপারের প্রাণ। আজি, এই বিজ্ঞানপ্রধান, বিজ্ঞানসর্ব্বস্ব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও এই ধর্ম্মভাব, অনেকের পক্ষে অনেক বিপদে ভরসা, অনেক দুঃখে সান্ত্বনা, অনেক শোকে জুড়াইবার স্থান, অনেক তাপিত হৃদয়ের শান্তিসলিল।

যাঁহারা মনে করেন, কালে ধর্ম্মভাব পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবে, তাঁহাদিগকে আমরা গুটি দুই কথা বলিতে চাই। কোমৎ বলিয়াছেন বটে, যে কোন বিষয়ের মূলানুসন্ধান করা বৃথা—তাহা মানবের অজ্ঞেয়। কিন্তু বৃথা হউক, অবৃথা হউক,ছাড়ান ত যায় না। অনেক সময় মনের ভিতর হইতে প্রশ্ন হয়—আমি কে ?—আমি ছাড়া সংসারে যাহা আছে তাহা কি ?—কোথা হইতে আসিলাম ?—কোথা হইতে আসিল ? হর্বট স্পেন্সর, পরমাণু লইয়া এবং আকর্ষণী ও বিক্ষেপণী শক্তিদ্বয় লইয়া অপূর্ব্ব জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ডারুইন বৃক্ষের বানর খাড়া করিয়া মনুষ্যজাতির পিতৃনিরূপণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু গোল ত

* Evolution theory.

মিটিল না—এক পদ সরিয়া গেল মাত্র। তার পর লাপ্লাসের জগতে জীবসঞ্চার ব্যাখ্যা। তিনি অপূর্ব্ব এক চিত্র আঁকিলেন। আমরা মনশ্চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সেই চিত্র দেখিলাম। দেখিলাম—অপার, অনন্ত, নীল সমুদ্র, তাহার গর্ভ, তাহার উপকূল, তথায় কর্দ্দমরাশি—সেই সমুদ্রের উপরে, উপরের নীল সমুদ্রে, তাড়িত প্রবাহ ছুটিতেছে—আর সেই সমুদ্রের গর্ভে, সেই উপকূলের কর্দ্দমরাশির ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট জন্মিয়া কিল্‌কিল্ করিয়া নড়িয়া উঠিতেছে—এই অপূর্ব্ব চিত্র দেখিয়া মোহিত হইলাম বটে, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের জ্ঞানও সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। কিন্তু জ্ঞান এবং চিন্তা সমদূরগামী নহে—যাহা জানি না, হয় ত জানিতে পারিও না, তদ্বিষয়ক চিন্তাও মনে আসে। এই জ্ঞানাতীত বিষয়ের চিন্তাই ধর্ম্মভাবের মূলভিত্তি। সুতরাং চিন্তা যত দিন জ্ঞানসীমার অন্তর্বদ্ধ না হয়, তত দিন অন্ততঃ ধর্ম্মভাবের লোপ হইতে পারে না। কিন্তু চিন্তা কোন কালে জ্ঞানসীমার অন্তর্বদ্ধ হইবে কি? ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে জ্ঞান বৃদ্ধিশীল—বিজ্ঞানের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিই হইতেছে। ইহাও সকলে স্বীকার করিবেন যে, কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তদ্বিষয়ক অনুসন্ধান আবশ্যক। অনুসন্ধেয় বিষয়ের মানসিক অস্তিত্ব—অহম্প্রতীতির অনস্থাবিশেষরূপে স্থিতি—অনুসন্ধানের পূর্ব্বগামী; —যাহার ভাব মনে নাই, তাহার অনুসন্ধান হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে ইহা আবশ্যক যে চিন্তা জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিবে। এবং চিন্তা যত দিন জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিবে, তত দিন ধর্ম্মভাবের লোপ আশা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তবে, এমন কথা উঠিতে পারে যে, যখন মনুষ্যের জ্ঞান সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে, তখন অবশ্য জ্ঞানাতীত চিন্তা থাকিবে না, কেন না জানিতে আর কিছু বাকি থাকিবে না, সুতরাং ধর্ম্মভাব লুপ্ত হইবে। কিন্তু মনুষ্যজ্ঞান কোন কালে সম্পূর্ণ এবং সর্ব্বদর্শী হইবে কি? স্পেন্‌সর* বলেন—না।

আর এক দল নাস্তিক আছেন, তাঁহারা মনে করেন যে বিজ্ঞানের যত উন্নতি হইবে ধর্ম্মভাবও তত দুর্ব্বল হইয়া যাইবে। এ মতেরও আমরা অনুমোদন করি না। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের অব্যভিচারিতায় দৃঢ় আস্থা জন্মাইয়া দেয়। ভূয়োদর্শন বৈজ্ঞানিকের মনে জাগতিক ঘটনাবলির অচল সম্বন্ধে, কার্য্যকারণের অচল সাহচর্য্যে, সুফল কুফলের অবশ্যম্ভাবিতায়, অটল আস্থা বদ্ধমূল হইয়া যায়। ভ্রমবুদ্ধিপরবশ হইয়া সাধারণ লোকে, যে পুরস্কার পাইবার, যে শাস্তি এড়াইবার আশা করে, বৈজ্ঞানিক তাহার অনুমোদন করিতে,

* First Principles. The unkowable.

তাহাতে আস্থা রাখিতে পারেন না বটে, কিন্তু তিনি দেখিতে পান যে, বিশ্বরচনা এমনই চমৎকার যে পুরস্কার অথবা শাস্তি কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল। দেখিতে পান যে, অবাধ্যতার বিষময় ফল অপরিহার্য্য। দেখিতে পান যে, মনুষ্য যে সকল শক্তির অধীন, তাহারা ক্ষেমঙ্কর এবং অব্যভিচারী। দুঃখ যেমন অবাধ্যতার অনিবার্য্য ফল, বাধ্যতার অবশ্য প্রাপ্তব্য ফল তেমনি অধিকতর সম্পূর্ণতা, উচ্চতর সুখ। সুতরাং তিনি অবাধ্যতার যার পর নাই বিরোধী। সুতরাং তিনি নিজে বাধ্য এবং অপরকে বাধ্য দেখিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং বিজ্ঞান ধর্ম্মভাব প্রসবিনী। অতএব যথার্থ জ্ঞান, প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের বিরোধী হইলেও, ধর্ম্মভাবের বিরোধী নহে—বরং পরিপোষক। স্পেন্সরের বিশ্বাস এইরূপ।

মানবলভ্য জ্ঞানের সীমা আছে। সে সীমা যে মনুষ্যশক্তির অনতিক্রম্য তাহা জ্ঞানই আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেয়। বুঝাইয়া দেয় যে, এ বিশ্বের চরম কারণ, মূল শক্তি, মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। সুতরাং দেখাইয়া দেয় যে, মনুষ্যশক্তি অতি ক্ষুদ্র। যে মহান্ শক্তি বিশ্বের আধার—প্রকৃতি, জীবন, চিন্তা যাহার মূর্ত্তিপরম্পরা মাত্র—সে শক্তি যে কেবল মাত্র জ্ঞানের অতীত নহে, ধারণারও অতীত, তাহা জ্ঞানই আমাদিগকে দেখাইয়া দেয়। নম্রতা, আপনার ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞান, বিশ্ব শক্তির মহত্ত্ব জ্ঞান, এ সকল যদি ধর্ম্মভাবের অংশ হয়, তাহা হইলে জ্ঞান অবশ্য ধর্ম্মভাবের পরিপোষক। গল-শিষ্য স্পুট্জাইম বলেন, ভক্তিই ধর্ম্মভাবের সার। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে যথার্থ জ্ঞানের ন্যায় ধর্ম্মভাবপোষণানুকূল আর কি? কেন না বিশ্বশক্তির মহত্ত্ব জ্ঞান পরিপুষ্ট করিতে অমন আর কি? অতএব জ্ঞান, ধর্ম্মবিশেষের অথবা প্রচলিত ধর্ম্মপ্রণালী সমূহের বিরোধী হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মভাবের প্রতিকূল নহে। যে কোমৎ সর্ব্বধর্ম্মবিরোধী, সেই কোমৎই আবার নবধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া আপনাকে পরম গৌরবান্বিত মনে করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যে ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান গৌরব।

অধ্যাপক হক্সলি এ সম্বন্ধে একস্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন;—"যথার্থ জ্ঞান এবং যথার্থ ধর্ম্ম, যমজা ভগিনী, এক হইতে অপরের পার্থক্য উভয়েরই মৃত্যুর কারণ। জ্ঞান যে পরিমাণে ধর্ম্মজীবন, জ্ঞানের সেই পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি; ধর্ম্মও যে পরিমাণে প্রমামূলক, ধর্ম্মের সেই পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি। জ্ঞানানুরাগীদিগের মহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল, ততটা তাঁহাদের বুদ্ধির ফল নহে, যতটা সেই বুদ্ধির ধর্ম্মভাব নির্দ্দেশিত গতির ফল। তাঁহারা যে সকল সত্যের আবিষ্কার, যে সকল তত্ত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, সে সকল, ততটা তাঁহাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্যনিবন্ধন নহে, যতটা তাঁহাদের সহিষ্ণুতা, তাঁহাদের

অনুরাগ, তাঁহাদের একচিত্ততা, তাঁহাদের ত্যাগ স্বীকার নিবন্ধন।"

ধর্ম্মবিদ্বেষীদিগকে আর একটা কথা বলিয়া আমরা এ প্রবন্ধের শেষ করিব। তাঁহারা সমাজকে ধর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চাহেন, ভালই, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্মবন্ধনের পরিবর্ত্তে আর কোন্ কার্য্যের বন্ধন তাঁহারা সংস্থাপিত করিতে পারেন? ধর্ম্মব্যতীত আর কি বন্ধন বাঁধিতে চাহেন? সমাজের জন্য একটা বন্ধন যে আবশ্যক, তাহাতে বোধ হয় কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই সন্দেহ করিবেন না। আমাদের কার্য্যমূলা বৃত্তি সকল অন্ধ এবং চিন্তাশূন্য। যখন তাহারা আবেগপ্রণোদিত হয় তখন কুপথ সুপথ জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠে। সমাজের মঙ্গলের জন্য ইহা আবশ্যক যে,এই বৃত্তিনিচয়ের উপর একটা শাসন থাকে। ধর্ম্মশাসনের স্থানে আর কোন্ শাসনকে অভিষিক্ত করা যাইতে পারে, আমরা ভাবিয়া পাই না। সত্য, এরূপ দৃষ্টান্ত আছে যে, কেহ কেহ ধর্ম্মবন্ধনকে পদদলিত করিয়াও পৃথিবীর প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন—ধর্ম্ম মানেন নাই, অথচ সাধুতায় জগতের দৃষ্টান্ত স্থল, জগতের অনুকরণীয়। কিন্তু সকলেই কিছু কোমৎ* বা লাপ্লাসের ন্যায় লোক নহে। সকলেরই জ্ঞানার্জ্জনৈকচিত্ততা কিছু এত প্রবল নহে, যে অধিকাংশ জীবনী আকর্ষণ করিয়া নিকৃষ্ট বৃত্তিনিচয়কে ক্রমে হ্রস্ব-তেজ করিয়া ফেলিতে পারে। সকলেরই মানবহিতপরায়ণতা কিছু এত প্রশস্ত নহে, যে রিপুগণ তাহার তলে ছায়াচ্ছন্ন-কারমজ্জিত হইয়া ক্রমে শুকাইয়া উঠে। সাধারণের জন্য একটা শাসন চাই। সাধারণকে সৎপথে উৎসাহিত করিতেও একটা উত্তেজনা চাই—মনুষ্যমানসের স্বাভাবিক প্রবণতা পাপের দিকে।

ধর্ম্মশাসন ব্যতীত আর ত্রিবিধ শাসন আমরা কল্পনা করিতে পারি,—বিবেচনা শক্তি, রাজবিধি, এবং সাধারণের মত। ইহাদের কার্য্যকারিতা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক।

প্রথম, বিবেচনা শক্তি। নীতিসূত্র-নিচয়ের প্রাকৃতিক মূল অবশ্য আছে, কিন্তু তাহা কয়জন বুঝে? কার্য্যবিশেষের ফলাফল কয়জন গণনা করিতে পারে? কয়জন গণনা করে? সমাজের অধিকাংশ লোকেরই কার্য্যে বিবেচনার ভাগ অতি অল্প। যত কেন উন্নত, যত কেন সভ্য সমাজ হউক না, লোকের কার্য্য অভিনিবেশপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে প্রায় ইহাই বোধ হয়, যেন যতদূর পারা যায় চিন্তা না করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই অধিকাংশ লোকের উদ্দেশ্য।† অতি সামান্য দৈনন্দিন কার্য্য, যাহাতে

* কোমতের নাম,-মাদেম ক্লোতিল্‌দ দে ভোঁর নামের সঙ্গে যাঁহারা মন্দভাবে জড়াইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা নিন্দুক মনে করি।

† Indeed, it almost seems as though most made it their aim to get through life with least possible expenditure of thought. *H. Spencer.*

অতি অল্প বিবেচনা আবশ্যক, তাহাও প্রায় কেহ বিবেচনা করিয়া করে না; অথচ এ সকল কার্য্যে কোন বলবান্ নিকৃষ্ট বৃত্তির উত্তেজনা নাই। তবে, যেখানে নিকৃষ্টবৃত্তির উত্তেজনা আছে, সেখানে যে লোকে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে পারিবে, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? নৈতিক আত্মার ধর্ম্মশাসনে হতবিশ্বাস হইয়া, প্রাকৃতিক মূল নির্ব্বাচন করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিবে, ইহা কেমনে বিশ্বাস করিব?

নীতিসূত্রের প্রাকৃতির মূল নির্ব্বাচন করিয়া কার্য্য করিতে পারিবার পূর্ব্বে অনেক কথা বুঝা আবশ্যক। এই কার্য্যের প্রবৃত্তি ভাল, এই কার্য্যের প্রবৃত্তি মন্দ, ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইলে কেবল তত্তৎকার্য্যের অব্যবহিত ফল পর্য্যালোচনা করিলে চলিবে না, গৌণ ফল সকলও দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে, ইহাতে নিজের লাভালাভ কি?—অন্যের লাভালাভ কি?—সমাজের লাভালাভ কি? অনেক কার্য্য আছে, আশু অনিষ্ট করে না কিন্তু পরিণামে সর্ব্বনাশ করে। অনেক কার্য্য আছে, নিজের লাভ হয় কিন্তু পরের সর্ব্বনাশ হয়। এরূপ অবস্থায় অভ্রান্ত বিচার কয়জন করিতে পারে? এত বিচার করিয়া কে কার্য্য করিতে পারে? এত বিচারই বা কয়জন করিতে পারে? আবার বিপদের উপর বিপদ, যাঁহারা ফলাফল বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই বা তদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন কি? অতি পণ্ডিত, অতি বড় জ্ঞানী, অথচ জানিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া শত শত অনিষ্টকর কার্য্য করেন, তাহার ফলভোগ করেন; যতদিন কষ্টভোগের স্মৃতি মনোমধ্যে জাজ্বল্যমান থাকে ততদিন হয় ত নিবৃত্ত থাকেন, আবার যেমন কালের ছায়ান্ধকার সেই স্মৃতির উপর পড়িয়া তাহাকে অপরিষ্কার করে, অমনি যে সেই।

আসল কথা, মনুষ্যের কার্য্য, মনুষ্যের বিশ্বাস, অধিকাংশ স্থলেই বিবেচনা দ্বারা স্থিরীকৃত হয় না, অনুভূতি দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। অতএব বিবেচনাশক্তি ধর্ম্মের সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহে। এ উপযুক্ততা বিবেচনাশক্তির যখন হইবে, সে দিন এখনও আসে নাই, আসিতে বিলম্ব আছে।

দ্বিতীয়, রাজবিধি। রাজবিধি যে ধর্ম্মের মূলাভিষিক্ত হইতে পারে না, তাহার একটা কারণ এই যে, রাজবিধি কার্য সমুৎপাদিকা শক্তি নহে। রাজবিধির অধিকার নিবৃত্তির দিকে, প্রবৃত্তির দিকে নহে। এই এই কার্য্য করিও না, রাজবিধি কেবল ইহাই বলে,—তাহাও স্পষ্টতঃ বলে না, প্রাকৃতঃ বলে। এই কার্য্য কর, এমন কথা রাজবিধি বলে না। পরের কুৎসা করিও না, পরের গায়ে হাত দিও না, পরদ্রব্য আত্মসাৎ করিও না, এই সকল রাজবিধির আজ্ঞা। দুঃখার্ত্তকে সান্ত্বনা কর, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান

কর তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় দাও, ইহা রাজবিধি বলে না। সুতরাং আমাদের উচ্চতর প্রবৃত্তি সকলের উপর রাজবিধির অধিকার নাই। আবার নিবৃত্তির দিকে যে অধিকার, তাহাও অতি সংকীর্ণ। রাজবিধি বলিলেন,—'দেখ বাপু, অন্ধকার রাত্রে গৃহস্থের মেয়ের ঘরে প্রবেশ করিও না, যদি কর এমন জানিতে পারি, তাহা হইলে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন বৎসর মেয়াদ দিব।' উত্তর —'যে আজ্ঞা, আপনি যাহাতে না জানিতে পারেন তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান্ থাকিব।' রাজবিধির কার্য্যকারিতা মিটিয়া গেল। অতএব রাজবিধিও ধর্ম্মের সিংহাসনে বসিতে পারে না।

তৃতীয়, সাধারণের মত।* মৃত মহাত্মা জন ষ্টুয়ার্ট মিল, তাঁহার 'ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রস্তাবত্রয়' ইত্যভিধেয় গ্রন্থে এই শাসনের কার্য্যকারিতা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি যেন অসদাচার অবলম্বন করিয়া কথাটা বুঝাইয়াছেন। লিখিয়াছেন যে, ব্যভিচারে যে পাপ, ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তাহা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অবশ্য সমান। কোন ধর্ম্মই এমন শিক্ষা দেয় না যে, স্ত্রীলোক পরপুরুষগামিনী হইলে তাহার অদৃষ্টে চৌষট্টি রৌরব হইবে, আর পুরুষ পরস্ত্রীগামী হইলে তাহার ভাগ্যে অক্ষয় স্বর্গ হইবে। যদি নীরয়ে পচিতে হয়, উভয়কেই হইবে। অথচ ব্যভিচারদোষে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ অধিক লিপ্ত, কেন না সাধারণের মত উভয়ের মধ্যে একটু তারতম্য করে— ব্যভিচারিণীর যে নিন্দা, যে কলঙ্ক, যে লাঞ্ছনা, যে গঞ্জনা, ব্যভিচারীর তত নহে। এ স্থলে দেখা যাইতেছে, যে পাপহইতে বিরত রাখিতে ধর্ম্মশাসন অপেক্ষা সমাজশাসনের (সাধারণের মত) কার্য্যকারিতা অধিকতর। মনুষ্যকে ধর্ম্মশাসন যে পাপ হইতে যে পরিমাণে বিরত রাখিতে পারে না, সমাজশাসন সেই পাপ হইতে সে পরিমাণে বিরত রাখিতে পারে। অতএব সাধারণ মতের কার্য্যকারিতা ধর্ম্মশাসনের অপেক্ষা ন্যূন নহে, বরং অধিক।†

মিলের যুক্তিতে গুটি দুই ছিদ্র আছে বলিয়া বোধ হয়। সিদ্ধান্তটি ঠিক করিয়া করা হয় নাই বা ঠিক করিয়া লেখা হয় নাই। মিলের তর্ক হইতে ঠিক সিদ্ধান্ত এইরূপ হয়,—এক দল মনুষ্যকে ধর্ম্মশাসন যে পাপ হইতে যে পরিমাণে বিরত রাখিতে পারে, আর একদল মনুষ্যকে সমাজশাসন সেই পাপ হইতে তদপেক্ষা অধিকপরিমাণে বিরত রাখিতে পারে। ইহার উপর আমরা এই বলিতে চাই, যে সমান অবস্থায় দুইটি শক্তির কার্য্য দেখিয়া তাহাদের বল তুলনা হইতে

* Public Opinion.

† J. S. Mill, Utility of Religion মিলের গ্রন্থ আমাদিগের নিকট এক্ষণে নাই থাকিলে স্থানটা উদ্ধৃত করিয়া দিতাম।

পারে বটে, কিন্তু যে স্থলে অবস্থার সমতা নাই সে স্থলে হইতে পারে না। মিলের যুক্তির দোষ এই যে, অবস্থার সমতা অভাবেও তিনি তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। স্ত্রীলোক এবং পুরুষ, উভয়েই মনুষ্য বটে, কিন্তু মনুষ্যজাতির অন্তর্গত বলিয়া কি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোন নির্দ্দেশিতব্য প্রভেদ নাই? যদি থাকে, তবে ইহাদের উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শক্তির কার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা কখনই শক্তিদ্বয়ের বলতুলনা হইতে পারে না। মনুষ্যও জীব, বানরও জীব, কিন্তু জীব-শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া কি মনুষ্য এবং বানর এতদুভয়ের উপর ভিন্ন২ শক্তির কার্য্য দেখিয়া, সেই শক্তিগণের বলের ন্যূনাধিক্য নির্দ্দেশিত হইতে পারে? যদি না হয়, তবে, স্ত্রীলোকও মানুষ পুরুষও মানুষ বলিয়াই বা কেন হইবে? মিলের তর্কের ভ্রান্তি সুস্পষ্টতর করিবার জন্য আমরা ঐরূপ আর একটা যুক্তি লিপিবদ্ধ করিতেছি। গোবর্দ্ধন দাস মনুষ্য; বেতাল পঞ্চবিংশতির রাজমহিষীও মনুষ্য, রাজমহিষীর গাত্র চন্দ্রকরস্পর্শে দগ্ধ হইয়াছিল, গোবর্দ্ধন দাস মধ্যাহ্ণ সূর্য্যতাপেও ক্লিষ্ট নহে; অতএব সূর্য্যকিরণ অপেক্ষা চন্দ্রকিরণ অধিকতর তাপযুক্ত। যদি এ যুক্তিতে, এ সিদ্ধান্তে ভুল থাকে, তবে মিলের যুক্তিতে, মিলের সিদ্ধান্তেও আছে।

স্ত্রীপ্রকৃতি এবং পুরুষপ্রকৃতি যে এক রূপ নহে, তাহা বুঝাইতে অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন রাখে না। শারীর তত্ত্ববিৎ মাত্রেই জানেন, যাঁহারা শারীরতত্ত্ববিৎ নহেন তাঁহারাও জানেন, যে স্ত্রীপুরুষের শারীরিক গঠন একরূপ নহে সুতরাং মানসিক গঠনও একরূপ হইতে পারে না। অতএব ইহা সিদ্ধ, যে স্ত্রী প্রকৃতি এবং পুংপ্রকৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। মিলের যুক্তির আর একটা দোষ এই যে, যে স্থলে দুই তিনটি শক্তি কার্য্য করিতেছে, মিল সে স্থলে একটী মাত্র ধরিয়া বিচার করিয়াছেন—বাকী গুলিকে একেবারে উপেক্ষা করিয়াছেন, নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। পুরুষে স্ত্রীলোকে যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে সমাজশাসনের কঠোরতা ব্যতীতও স্ত্রীলোকে অপেক্ষাকৃত অধিকতর জিতেন্দ্রিয়তা ভরসা করা যায়। পুরুষ প্রতিপালক, স্ত্রীলোক প্রতিপালিত। যে প্রতিপালিত, তাহাকে সুতরাং প্রতিপালকের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, প্রতিপালকের মন রাখিয়া চলিতে হয়, প্রতিপালকের বিরাগের ভয় করিতে হয়। যে কার্য্য করিলে প্রতিপালক বিমুখ হইবেন, সে কার্য্য করিতে প্রতিপালিত অল্পে সাহস করে না। অতএব মিলের যুক্তি ভাঙ্গিয়া গেল।

এই গেল মিলের মত সমালোচন। এক্ষণে একবার মিলকে অব্যাহতি দিয়া, অন্যরূপ বিচারমার্গ অনুসরণ করিয়া, সাধারণ মতের সহিত ধর্ম্মশাসনের তুলনা করিয়া দেখা যাউক।

সাধারণের মতটা বাহ্যশক্তি। তাহার

শাসন কেবল কার্য্যের উপর থাকিতে পারে। মনের উপর কোন অধিকার নাই। মনের দুরভিসন্ধি যতক্ষণ না কার্য্যে পরিণত হয়, ততক্ষণ তাহা সাধারণ মতের কার্য্যপথবর্ত্তী নহে। সুতরাং সাধারণের মত মনঃসংশোধনে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ মত কার্য্যবিশেষের উপর শাসনরূপে প্রযুক্ত হইবার পূর্ব্বে ইহা আবশ্যক যে, সেই কার্য্য সাধারণে জানিতে পারে। সুতরাং যে স্থলে প্রকাশসম্ভাবনা নাই, সে স্থলে সাধারণের মত অকর্ম্মণ্য। অতএব দেখা গেল যে, সাধারণ মত মনঃসংশোধন করিতে অক্ষম এবং গোপনের পাপ নিবারণ করিতে অক্ষম। ধর্ম্মভাব আভ্যন্তরীণ শক্তি, সুতরাং তাহার এ কার্য্যকারিতা আছে। মানস সংশোধন করিতে সক্ষম, কেন না উহার কার্য্য মনের উপর। গোপনের পাপ নিবারণ করিতে সক্ষম, কেন না উহার কাছে কোন কার্য্যই গোপন থাকিতে পারে না—মনের অগোচর পাপ নাই। অতএব সাধারণ মতও ধর্ম্মসিংহাসনে বসিবার অনুপযুক্ত।

আমরা যে বিচার করিলাম, তাহাতে বুঝা গেল যে ধর্ম্মভাবের আবশ্যকতা আছে। সমাজের হিতের জন্য, মানবের মঙ্গলের জন্য,ধর্ম্মভাবের আবশ্যকতা আছে। পাপহইতে বিরত রাখিতে, সৎপথে উৎসাহিত করিতে, উচ্চতর প্রবৃত্তি সকলের উন্নতিসাধনে, পশুভাবের সংযমনে, ধর্ম্মভাবের আবশ্যকতা আছে। ধর্ম্মভাবের অপচয়ে সমাজের অমঙ্গল আছে। কোমৎ অথবা লাপ্লাসের ন্যায় লোক নাস্তিক হইলে সমাজের অনিষ্ট না হইতেও পারে, কিন্তু বাধু বাবু, মাধু বাবু, যাদু বাবু যদি নাটক লিখিতে শিখিয়াই নাস্তিক হয়েন, তাহাতে অনিষ্ট আছে। তাঁহারা যে সমাজের অন্তর্গত, সে সমাজের বড় দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। বঙ্গসমাজে এইরূপ লোকের কিছু বাড়াবাড়ি, অতএব বঙ্গসমাজের বড় দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে।

এ বিষয়ে অনেক কথা আমাদের বলিতে বাকী থাকিল। এ বিষয়ের পুনরান্দোলন করিবার ইচ্ছাও থাকিল। প্রবন্ধের অতি বিস্তৃতি দোষ পরিহারার্থে আমরা আজিকার মতন নিরস্ত হইলাম।

শান্তিধর্ম্ম ও সাহসশিক্ষা।

ইদানীন্তন সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ নিয়মানুসন্ধান। যেখানে সভ্যতার উন্নতি সেইখানেই নিয়মের সমাদর। অন্যতঃ বিজ্ঞানশাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা নিয়ম সমালোচক বলিয়া বিজ্ঞান আলোচনা সভ্যসমাজের শ্রেষ্ঠতর অবলম্বন, বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতি সাধিলে কার্য্য প্রণালী কেবল দৈবাধীন বা মায়াপরতন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস থাকে না। ন্যায়সঙ্গত নিয়মাবলীর উন্নতিপ্রাপ্তির সঙ্গে সমাজকার্য্য ক্রমশঃ নিয়মেরই অধীন হইয়া থাকে, শাস্ত্রের বচন ও পুরাতন লোকের একাধিপত্য হ্রাস হইতে থাকে ও সকল বিষয়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যতীত অপর কথা ক্রমে অগ্রাহ্য হয়। একদিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মনির মাংসপেষী বলব্যাপক উন্নতি ও আর একদিকে স্পেন এবং আমাদের হতভাগ্য ভারতভূমির অবনতি পর্য্যালোচনা করিলে উক্ত কথার কিয়দংশ সত্যতার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরামচন্দ্র নৌকায় পদার্পণ করিবামাত্র কাষ্ঠনির্ম্মিত যান স্বর্ণময় হইল, কংসারি শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদান করিতেই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার গলদেশান্তরে চিত্রিত দেখা গেল, ইব্রাহিমের বংশজাত মুসা লালসাগরে হস্তনিক্ষেপ করিতেই সমুদ্র শুকাইয়া গেল, এ সকল কথায় কোন সমাজে দৃঢ় বিশ্বাস ও অন্যতর স্থানে অবিশ্বাস হয় কেন? ইহার মধ্যে এক সমাজেরই বা কেন ক্রমশঃ অবনতি অপরেরই বা কেন ক্রমশঃ উন্নতি দেখা যায়?

ইহার সদুত্তর অনুসন্ধান করিতে হইলে দেশ দেশান্তরের মানবসমাজের গঠনসৌষ্ঠব ও ধর্ম্মনীতির উন্নতি যত্নসহকারে স্থির মনে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। আমাদের নিয়ত স্মরণ রাখা উচিত যে, জাতীয় মহত্ত্ব বা সামাজিক গৌরব-মন্দির জাতীয় ধর্ম্মভিত্তির উপর কিয়দংশে সংস্থাপিত। জাতীয় ধর্ম্মের প্রকৃতি অনুসারে জাতীয় সভ্যতার অঙ্গবিকাশ হইয়া থাকে। যে ধর্ম্ম সপ্তসিন্ধুর আলেখ্যতুল্য রমণীর পবিত্র তটে প্রশান্ত ব্রাহ্মণগণের পবিত্র ওষ্ঠ হইতে, নিদাঘনিশীথে হৈম চন্দ্রকরোল্লাসিত নির্ঝর রবের সঙ্গে সুমধুর গাথায় উচ্চারিত হইত, যাহাতে কেবল "শান্তি" "শান্তি" পরম সুখ বলিয়া গণ্য হইত, সেই ধর্ম্মসম্ভূত সমাজপ্রকৃতির অঙ্গসৌষ্ঠব এক প্রকার। যে প্রশস্তমনা বোধিসত্ত্ব শাক্যসিংহের স্বর্গীয় সহৃদতায় ইদানীন্তন* সরল চিত্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণ লজ্জা ও নম্রতা সহকারে আপন আপন নীতি-

* "It might be impossible for honest Christians to think over the career of this heathen Prince (Buddha) without some keen feeling of humiliation and shame." *Cannon Siddon quoted by Spencer.*

প্রণালী মলিন দেখেন, তাঁহার সমাজশ্রী আর এক প্রকার। পুনরায় সমসাময়িক বাহুবলব্যাপ্তিকর খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মানুরাগী বলিষ্ঠ জাতিনির্ম্মিত সমাজমন্দিরের ভিন্ন গঠন দৃষ্ট হয়। নিগূঢ় চিন্তা করিলে অনেকেই দেখিতে পাইবেন ইদানীন্তন সভ্যসমাজ এই দুই প্রকার ধর্ম্মেরই কিছু কিছু অনু করণ করিতে অভিরত। যাহারা শান্তি-ময় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অনুসরণ করেন তাঁহারাও ছয় দিবস সংসার যুদ্ধে নিমগ্ন থাকিয়া কাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে বা তোপমুখে নিহত করিয়া সপ্তম দিবসে 'শান্তি শান্তি' বলিয়া ধর্ম্মাহুতি দিয়া থাকেন, কিন্তু রবিবারে যাহা ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া জ্ঞান হয় সোমবারে তাহা স্মৃতিপথ হইতে একবারে স্খলিত হইয়া পড়ে।

এইরূপ ধর্ম্ম বিপর্য্যয়ের কারণ আছে। যে কালে সমাজ নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আ-শ্রয়ে নিরাপদ ছিল, সেকাল বহুদূরগত। যে রাম শান্তিময় জগজ্জীবনের ছায়া মাত্র তিনিও মানবলীলা সম্পন্নহেতু চিরকাল সংহারকার্য্যে ব্যতিব্যস্ত, যে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মসন্তান, তিনি রাজসূয় যজ্ঞে ও রাজ-তিলক লালসায় দিগ্বিজয় অর্থাৎ সহস্র২ প্রাণিবিনাশে মত্ত। এখনকার স্বদেশ-উদ্ধারকারী উইলিয়ম টেলের রমণীয় উপাখ্যান শুনিয়া সমস্ত ইউরোপ খণ্ড তাঁহাকে দেববৎ উপাসনা করিয়া থাকেন। টেল আপনদেশ অত্যাচার-শূন্য করিবার অভিপ্রায়ে নিরস্ত্র হাবমেন জ্রিশিয়রকে সতর্কহীন সময়ে তীক্ষ্ণ তীর-প্রক্ষেপণে শমনভবনে প্রেরণ করেন, এজন্য তিনি সমস্ত সভ্যরাষ্ট্রে পূজ্য; কিন্তু অপরদেশে কোন বীর সেই একই অভিপ্রায়ে কোন মর্ম্মান্তিক ক্লেশহইতে নিষ্কৃতির আশায় আপন বৈরনির্য্যাতনের অভিসন্ধি করায় চিরঘৃণাস্পদ হইয়াছেন। তাঁহার নাম অকথ্য, অশ্রাব্য, দুষ্কৃয়ান্বিত (মিসক্রিয়ান্ট) বলিয়া জগতে জাগি-তেছে। স্বটলণ্ডে দেশ-হিতৈষী উই-লিয়ম ওয়ালেস স্বদেশীয় সাহিত্যলেখকের লেখনীতে বীরত্বের ও মহত্বের উচ্চতর শিখরোপরি সংস্থাপিত, কিন্তু তত্তৎ-কালীন ইংলণ্ডদেশীয় চরিত্রচিত্রকরের করে তিনি ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়মবর্জ্জিত, সমাজ শান্তির প্রধান শত্রু, অবশেষে নরহন্তা ও লুণ্ঠনপ্রিয় ডাকাইতদলের সদার বলিয়া চিত্রিত হইয়াছেন। এইরূপ একই ধর্ম্মের দুই দুই অর্থ ও একই শ্রেণীস্থ লোকের দুই দুই আখ্যা আমরা প্রচার করিতে বিরত নহি। কিন্তু এই প্রকার দুই দুই ধর্ম্মাবলম্বনের ও দুই দুই বিচা-রের বিশেষ আবশ্যকতা আছে, তাহা ক্রমশঃ বিবৃত করা যাইতেছে।

যে সময়ে যোগস্তুতি, মুনিবৃত্তি অব-লম্বন, ফল মূল আহরণে জীবন ক্ষেপণ করিয়া, তনুত্যাগ করা সহজ ছিল, সে দিন এক্ষণে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, গিরি, নদী, বন, উপবন, সম্পত্তিনিয়মের অধীন হইয়াছে, জঙ্গল, অধীশ্বরের পক্ষরক্ষ-কের (কনসরভেটরের) করগত; ফল মূল সংগ্রহ, পত্রচ্ছেদন, সকলই রাজ-

নিয়মাধীন, মূল্য দাও কিম্বা দণ্ড গ্রহণ কর—দণ্ডবিধি সর্ব্বত্র ব্যাপক। সকলই মালিকের মুলুক, দলিল দর্শাইয়া স্বত্ব সাব্যস্থ কর,নচেৎ যদি পার স্ববলে অধিকার সংস্থাপন কর। এই কথা গুলি হৃদয়ঙ্গম করিলে কি প্রতীতি হয়? নিরীহতার কাল গত হইয়াছে, পশ্চাতেই বল বা অগ্রেতেই দেখ সত্যযুগ অনেকদিন গত বা আসিতে অনেক কাল বিলম্ব আছে। কেবল স্থিরভাবে বসিয়া ভাবিলে সে সময় লব্ধ হইবার নহে। সত্য,নীতি, ধর্ম্ম ও রাজ্য বিস্তার করিতে পার না পার, নিজস্বত্ব প্রাণপণে রক্ষা করিবার চেষ্টা কর। নিজের সুখ ও সামাজিক এই উভয়ই সুখের জন্য আগ্রহাতিশয় লোভপরায়ণ লোকের আক্রমণ সর্ব্বদা প্রতিরোধ করা কর্ত্তব্য। যে ধর্ম্মে এই শিক্ষা দেয় যে বামগণ্ডে চপেটাঘাত করিলে দক্ষিণ গণ্ড পুনরাঘাত করিবার জন্য ফিরাইয়া দাও, তাহা লৌকিক বা জাতীয় সম্ভ্রম বা স্বত্বসম্বন্ধে পরিণত করিলে কেবল হাস্যাস্পদ হইতে হয়। নিরীহতার, শান্তচিত্তেরও সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্" এ বিষয়েও সত্য। যেখানে প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব প্রাধান্য সংস্থাপনে নিয়ত পদচালনা করিতেছে, সেখানে শান্তভাব, দৌর্ব্বল্য বলিয়া বুঝাইতে পারে, আপন স্বত্বে অবহেলা করিলে অপরের দুর্নীতি,বৃদ্ধি হয়, সূচাগ্র হইতে ফালাগ্র শত্রুপক্ষের হস্তগত হয়। সেই জন্য আপন আপন জাতীয়ধর্ম্ম বা জাতীয় নীতির দৃঢ়পত্তন করা বিশেষ আবশ্যক।

যে সম্প্রদায়ের লোক-বিশেষে উল্লিখিত মত তর্ক করিয়া থাকেন তাঁহাদের সমস্ত কথা এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। তাঁহারা আরো কহিয়া থাকেন যে জাতীয় গৌরব বা জাতিপ্রতিষ্ঠা জন্য যুদ্ধচর্চ্চা আবশ্যক, জাতিসমুচ্চয়ের প্রত্যেক ব্যক্তি বিগ্রহনিপুণ হওয়া উচিত। যুদ্ধ নৃশংস কার্য্য,বলবান্ জাতির সহিত নিকৃষ্ট জাতির যুদ্ধ নিতান্ত ক্ষতিকর। শোক, অভাব, দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু ত আছেই, তার পর যুদ্ধে কোন কোন জাতির একবারে ধ্বংস হওয়া সম্ভব, তথাপি যুদ্ধপ্রিয় লোকেরা কহেন যে, যে নিকৃষ্ট জাতি উচ্চতর সভ্য জাতির সহিত বলে বা কৌশলে সমকক্ষ না হইতে পারে তাহার জীবিত থাকিয়া নীচত্বের পরিচয় দিয়া কাজ কি? মহীতল হইতে রসাতল যাওয়াই শ্রেয়স্কর।

তাঁহারা বলেন বিগ্রহ ও শস্ত্রশাস্ত্রের আলোচনায় সমাজ অনেক প্রকারে উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ বীর্য্য, সাহস, সহিষ্ণুতা ও ঐকমত্য। বনের পশু পক্ষী কিম্বা নগরের পুরবাসিগণের প্রতিই দৃষ্টিনিক্ষেপ কর আমরা নিশ্চয়ই দেখিব যে যাহারা অহরহঃ আক্রমণ করিতে কিম্বা অপরের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে তৎপর তাহারা বিশেষ২ গুণের আস্পদ। ইংরাজিতে যাহাকে বুল ডগ (Bull dog) কহিয়া থাকে তাহারা পর্য্যায়ক্রমে যুদ্ধশিক্ষায়

ঐরূপ উগ্রস্বভাবপ্রাপ্ত যে একবার কোন দ্রব্য তাহাদের গ্রাসে পতিত হইলে তীক্ষ্ণঅস্ত্রে অঙ্গচ্ছেদ করিলেও সেই পদার্থের নিষ্কৃতি নাই, সিংহের কথা আমরা ততদূর জ্ঞাত নহি, কিন্তু সময়ে সময়ে ব্যাঘ্রশিকারের যেরূপ সংবাদ পাইয়া থাকি তাহাতে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের চর্ব্বণে দৃঢ় লৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্রসকল কোমল ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় চর্ব্বিত হইয়া যায়। হস্তী বহু লোকের আক্রমণ ও অস্ত্রের আঘাত তৃণতুল্য জ্ঞান করে, কিন্তু ভয় দর্শাইতে সতত অক্ষম। পার্ব্বতীয় বাজপৌরি প্রভৃতি যে সকল পক্ষী অনবরত আক্রমণে অভিরত তাহারা আপন আপন বৃত্তি পরিচালনায় ক্রমশঃ এরূপ পুষ্টিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি যোজনাধিক অতিক্রম করে, ও তাহাদের তীক্ষ্ণ নখাধারে অপেক্ষাকৃত গুরুতর জন্তু সকলকে উচ্চস্থ নীড়মধ্যে অবহেলায় উত্তোলন করিতে পারে। অপরদিকে তৃণজীবী পশুনিচয়, যাহারা প্রবলতর জন্তু হইতে প্রাণরক্ষায় ব্যাকুল তাহাদের ক্ষমতা কতদূর? ব্যাঘ্রের দ্বাদশ হস্ত ও মৃগের ত্রয়োদশ হস্তব্যাপক এক একটি লম্ফ। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, যাহাদের প্রস্থানই জীবনরক্ষার উপায়, তাহারা পলায়নেই পটু। এই পটুতা একদিনের শিক্ষা নহে, দ্রুত পদচালনা করিতে করিতে অনেক মৃগের প্রাণবিনাশ হইবার পর অবশিষ্ট যাহারা পলাইতে সক্ষম হইয়াছিল তাহাদের সন্তান সন্ততিগুলিই পুরুষানুক্রমে এইরূপ দ্রুতপদ হইয়া আসিয়াছে। মনুষ্যসমাজেও ঠিক এইরূপ অবস্থা। যাহারা বিশেষ বিশেষ কোন গুণে নিপুণ, তাহারাই জীবন যুদ্ধে অপরকে পরাভব করিয়া জাতীয় সোপানে সভ্যতার মন্দিরে বিরাজমান। যাহারা নির্ব্বীর্য্য বা যুদ্ধে অক্ষম তাহাদের জীবনে কোন ফল নাই, এমন কি তাহাদের মধ্যে অনেক জাতি এক্ষণে নাই, এই কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অধিক লেখা অনাবশ্যক। যতদিন যুদ্ধ জাতিবিশেষের বিশেষ ব্যবসায় ছিল, ততদিন ক্ষত্রিয়কুল বীর্য্যই প্রধান পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য করিতেন, ততদিন এই বিশাল ভারতক্ষেত্র তাঁহাদেরই করস্থ ছিল। বোধ হয় বীরত্বেরই ধন এই ভারত। কিন্তু সেই বীরত্ব অদৃশ্য হইবার কারণ কি? বিখ্যাত বিচক্ষণ পণ্ডিত জন ইষ্টুয়ার্ট মিল কহিয়াছেন "সাহস আমাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতি নহে, ইহা সুশিক্ষার ও উৎকর্ষণের ফল।"* আমরা যত বিপদে পড়ি, অঙ্গচাতুরি, বল বা বুদ্ধিচালনায় যতবার উদ্ধার হই আমাদের সাহস ততই বৃদ্ধি হয়, জয়লাভে ততই উৎসাহ ঘটে এবং বিপৎপাতে ভীত না হইয়া বরং গৌরবলাভের ইচ্ছা

* "Consistent courage is always the effect of cultivation."—*Mill on Nature.* p. 47.

প্রবল হয়। স্বভাবসিদ্ধ ভয়কে সুশিক্ষা দ্বারা সংযম করিলে সাহসের আবির্ভাব হয়, কিন্তু সে শিক্ষার শিক্ষালয় কোথায়? দেশীয় সমাজ। যতদিন দেশীয় সমাজে সাহসের আদর থাকিবে সাহসিক পুরুষ সমাদৃত ও ভীরুতা ঘৃণিত থাকিবে, ততদিন যুবা পুরুষগণ সাহস শিক্ষা অবিরত অভ্যাস করিবে। স্পার্টা দেশে, রোম রাজ্যে, মধ্যযুগ প্রতিষ্ঠিত ইউরোপখণ্ডের যোদ্ধৃবর্গে, বা ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়কুল সমাজে, যেখানে দেখ, যথায় সাহসের শিক্ষা ও সমাদর তথায় বীরত্বের উন্নতি, যেখানে সাহসের অবমাননা তথায় ভীরুতার বৃদ্ধি। ভারতে আচার্য্যের দ্বারা শস্ত্রশিক্ষা ছিল, ইউরোপে প্রত্যেক প্রভুর দুর্গমধ্যে ব্যায়ামশালা ছিল। সম্মুখসমরে মৃত্যু যোদ্ধার স্বর্গারোহণের পন্থা ছিল, শস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়েরা রণে ভয়পরতন্ত্র হইয়া ভঙ্গ দিলে, তাহাদের কলঙ্ক শশাঙ্কের কলঙ্কের ন্যায় যুগে যুগে হইত। আবার ইউরোপ খণ্ডে "Chivalry" সংস্থাপনা দ্বারা যোদ্ধৃবর্গ একটি পবিত্র ও দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন। তাহাদের নিয়মাবলী অতি সুন্দর ছিল, সেই নিয়ম দ্বারা ভ্রাতৃভাব সম্পন্ন হইত, ও অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতা লাভের উদ্দেশে প্রত্যেক অঞ্চলের নাইটগণ ঐ নিয়ম প্রতিপালনে বিশেষ তৎপর হইতেন।

"ভগবানকে সতত ভয় কর" "ধর্ম্ম রক্ষার্থ যুদ্ধ কর" "শতবার মৃত্যু ভাল তবু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা অবিধেয়" "নারী ও কুমারীগণের প্রতি সতত শিষ্ট হও" "আপন প্রাণদানেও দুর্ব্বলের রক্ষা কর" "জীবন সংশয় হইলেও বাক্যের সত্যতা প্রতিপালন কর।" এই ধর্ম্ম রক্ষা করা যদিও দুরূহ, যদিও অনেক নাইটের বাক্য কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল কি না সন্দেহ, তথাপি এই সকল সুনীতি যে মধ্যযুগে ইউরোপ খণ্ডে কতকগুলি মহদভিপ্রায় মহাবীরের প্রসূতি তাহা সংশয়বিহীন। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের বীরত্ব উত্তেজনার একটি প্রধান কারণ ছিল; বীরগণ দুর্ব্বলা অবলার রক্ষণ, দেবদুর্লভ সরলা সুন্দরীরা বীরপুরুষেরই ধন, সেই ধন সংগ্রহ বীরত্ব পরিচালনার এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বীরত্ব প্রীতিসংযোগে সতেজ হয়, এবং সেই বীরত্বে বীরাঙ্গনা সংমিলনলাভ অতি সুমধুর, কুলধর্ম্মের উত্তেজনায় গাণ্ডীবের সংযোগ, ইহা প্রখর ও কোমলের মিলন—কিন্তু এই মিলন দীর্ঘ স্থায়ী,* চিন্তাশীল পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, যে সকল প্রথাদি বীরত্ব উত্তেজনার মূল, তাহা মানবপ্রকৃতির অন্যান্য অনেকানেক সদ্বৃত্তিরও উৎস। যে যুদ্ধহ্রদে নরনাশের বিষ-বারি তাহাতেই আবার সদগুণের সুনীতিরও উৎপত্তি।

* অতি বর্ব্বরলোকের মধ্যেও সাহস উত্তেজনায় এইরূপ প্রথা দৃষ্টি হয়। নরমাংসাশী ফিজিয়ান জাতি সমাজে যোদ্ধৃবর্গ রণবিজয়ী হইয়া গৃহাভিমুখ হইলে বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ সুন্দরীগণ তাহাদের হস্তে আপনাদিগকে অর্পণ করিয়া থাকে।

এদিকে আবার বীরত্বের নাশে স্বাধীনতার ধ্বংস; অধীনতার নীতিপ্রণালীও পৃথক্: দৌর্ব্বল্য প্রবল হইলে দুর্ব্বলের বুদ্ধিচাতুর্য্য একমাত্র আশ্রয়। "বলে না পারি ফিকিরে মারিব।" তখন চাণক্যের ও মাকিয়াবেলির প্রণীত বুদ্ধিচতুরতা সমাজের আশা বা দুরাশার স্থল হইয়া উঠে—শঠের সহিত শঠের মত আচরণ করিতে শিক্ষা হয়। ইউরোপে ইটালী, ও ভারতে বঙ্গ-দেশ এই শিক্ষার অভিনয় স্থান। এই উভয় প্রদেশের সমাজের অবস্থা ও তাৎকালিক নিয়মাবলীর সৌসাদৃশ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

প্রথমতঃ ইটালীর রোমরাজ্য বিধ্বংস হইবার পর পশ্চিমখণ্ডের অপর সমস্ত দেশে অরাজকতা। সে সময়ে পূর্ণ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ইটালীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর সভ্যতার বীজভূমি। ভিনিস, জেনোয়া, রোম, ও টসকেনি অপেক্ষাকৃত শারীরিক সচ্ছন্দতার ও সামাজিক সুপ্রণালীর চিরন্তন রঙ্গভূমি, পুরাতন রোমরাজ্যের সভ্যতার কিছু কিছু কণিকা এ নগরচয়ে বিকীর্ণ ছিল। রোমনগর হইতে কৈসারগণের রাজধানী স্থানান্তরিত হইলেও ইহা খ্রীষ্টীয়ান্ ধর্ম্মাবলম্বী পোপদিগের সুপ্রসিদ্ধ পবিত্র ধাম হইয়া উঠিল, ধর্ম্মতত্ত্ব চতুর্দ্দিগ্ব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে এখানেই আলোচিত হইতে লাগিল। পশ্চিমাঞ্চলের অসভ্যতা ও পূর্ব্বখণ্ডের সভ্যতার এই নগর সকল মধ্যবর্ত্তী হইয়া উঠিল। তাৎকালিক প্রসিদ্ধ রাজ্যচয়মধ্যে ভিনিস বাণিজ্যের প্রধানতম নগর বলিয়া বিখ্যাত হইল; বাণিজ্যের সহিত অর্থাগম, সুরুচি, জীবনের সুখপ্রদায়ক দ্রব্য নিকরের আবিষ্ক্রিয়া বা সংগ্রহ হইতে লাগিল। উচ্চতম আল্প পর্ব্বতের উত্তর অঞ্চলে প্রজাসমূহের স্বাধীনতা যে ফিউডল প্রভুদের দৃঢ় চপেটাঘাতে ধরাশায়ী হইয়েছিল, তাহাদের অত্যাচার ইটালীর জনাকীর্ণ নগরে প্রবেশ করে নাই। স্বাধীনতা, বাণিজ্য ও অর্থসমাগমের সঙ্গে এই সকল নগরে সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইল, ইটালীর নিকটস্থ সাগরসমূহ পণ্যদ্রব্যপরিপূর্ণ পোতমালায় সুশোভিত হইল।

ইটালীর প্রত্যেক নগরে হুণ্ডি প্রেরণ জন্য ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইল। একা ফরেন্স নগরে অশীতি ব্যাঙ্কঘর ও পশমের বস্ত্র নির্ম্মাণার্থ দুই শত কুঠি সংস্থাপন, ও ঐ সকল কুঠিতে ত্রিংশ সহস্র লোক প্রাত্যহিক কার্য্যে নিযুক্ত হইল। তিন লক্ষ করিয়া ফ্লোরিন্ (প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা) মুদ্রিত হইতে লাগিল। দুইটী রোকড়ের কুঠি হইতে ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় এড্ওয়ার্ড তিন লক্ষ মার্ক মুদ্রা (প্রায় ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা) কর্জ্জ পাইয়াছিলেন। ফ্লরেন্স রাজ্যে প্রায় ষাটি লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগ্রহ হইত কিন্তু এইরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়াও এ সকল রাজত্ব স্বল্প কাল মধ্যে অবনতি প্রাপ্ত, স্বাধীনতাহীন ও মলিনশ্রী হইল।

স্ব স্ব নগরে শান্তিসুখ সম্ভোগে পুর

বাসিগণ শিথিলাঙ্গ, কোমলহৃদয়,আলস্য-ময় হইল। যাহারা উদরপূরণ কামনায় দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য, যাহারা প্রতিদিন জলযানে বা পদব্রজে হিংস্র জন্তুসহ যুদ্ধ করিয়া খাদ্য অর্জ্জন করিতে বাধ্য, তাহাদের অঙ্গবল বা মানসিক সাহস এতাদৃশ বণিক নিকেতনে স্থায়ী হওয়া অসম্ভব ক্রমে যুদ্ধে ইহাদের নিতান্ত অপ্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। বিগ্রহ বর্ব্বরের কর্ম্ম বলিয়া ইটালী সমাজে পরিগণিত হইল। অস্ত্র-বিদ্যার হ্রাসের সহিত সাহসের হ্রাস হইয়া এই সুন্দর সুসভ্য দয়ার্দ্রচিত্ত ইটালিয়ান জাতির অবনতিপ্রাপ্ত হইল। পরে কপটতা ও চাতুর্য্য ইহাদের প্রধান অস্ত্র হইয়া উঠিল, নরহত্যা ভিক্ষা, দুর্ভিক্ষ, হতাশ, দাসত্বে দেশ ব্যাপ্ত হইল।

আর এক দিকে বাঙ্গালার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ কর। সময়সাগরে পুরাবৃত্ত তরী যত উজান বহিয়া যাও ভারত ক্ষেত্রে কোথাও সভ্যতা অপ্রতিহত দেখিবার নাই। বাহিক সৌভাগ্যেরই বা হ্রাস কোথায়? প্রান্তরে প্রচুর শস্য দায়ী ক্ষেত্র, নগরে প্রচুর শিল্পনিপুণ পুরবাসিগণ। সেই ভারত-অন্তর্গত মহা রাজ্য আদিম কাল হইতে সৌভাগ্য-শালী। বেদ, দর্শন, কাব্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, পুরাণ যাহা ভারতের মানসিক ভাণ্ডার ও পৃথিবীর গৌরব তাহাতে বঙ্গ দেশ স্বত্বাধিকারী। বৌদ্ধমতাবলম্বী পাল নৃপতিকুলের সময় হইতে পলাশিযুদ্ধের দিন পর্য্যন্ত, দুর্ভাগ্য, অত্যাচারপীড়িত হইয়াও আমরা কি কখন সভ্যতাবিরহিত? স্বদেশজাত সামগ্রী ও স্ব স্ব শিল্পনৈপুণ্যে আমাদের নির্ভর ছিল। বিদেশীয় সামগ্রীতে আমাদের দৃষ্টি ছিল না, অন্ন, বস্ত্র, অস্ত্র, ধাতুনির্ম্মিত প্রয়োজনীয় দ্রব্য, অলঙ্কার, বিরামদায়ী তাবৎ দ্রব্যই গৃহজাত, বরং আমাদের উদ্বৃত্ত সামগ্রীসমূহ অপর দেশের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা সমৃদ্ধির পরিপোষক ছিল। তখন আমাদের নগরগুলি লোকসমাকীর্ণ। অবনী-বিখ্যাত গৌড় নগরের ত কথাই নাই! ঢাকা, বিক্রমপুর, স্বর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, তমলুক, বনবিষ্ণুপুর, কাশিমগঞ্জ, প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থল ছিল। একথা সাধারণতঃ প্রকাশ নাই যে এক চন্দ্রকোণা নগরেই ১৪০০০ হাজার তন্তুবায় বংশ অহরহঃ বস্ত্রনির্ম্মাণে ব্যস্ত থাকিত; এখনও লোকে কহিয়া থাকে এ সহরে "বাযান্ন বাজার ও তিপ্পান্ন গলি" ছিল, এক সময় ঐ চন্দ্রকোণার ঘন বুনন বসন সমস্ত বঙ্গরাজ্যে গৃহস্থের আচ্ছাদনের প্রধান সংস্থান ছিল। শিল্পীদের মধ্যে রেসম ও কার্পাস ও তন্নির্ম্মিত বস্ত্র জন্য বঙ্গদেশ চিরবিখ্যাত। যে সময়ে রোম রাজ্যে অরিলিয়ন (২৭০ হইতে ২৭৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত) অধিপতি ছিলেন, তখন রোম নগরে বঙ্গদেশ-জাত রেশমী বস্ত্র স্বর্ণ মুদ্রার সহিত সমান ওজনে বিক্রীত হইত। বাগদাদের খলিফা, পারসিয়ার সাহা বা দিল্লীর মোগল নৃপতিগণ এই বঙ্গদেশের রেশমী বস্ত্রে মোহিত ছিলেন;

নুরজিহান বাজ্ঞী যে কয়েকদিন আপন পূর্ব্বতন স্বামী সের খাঁ সহ বর্দ্ধমানে বাস করিয়াছিলেন সেই সময়ে বীরভূমের রেশমী বস্ত্রের এতদ্রূপ অনুরাগিণী হইয়াছিলেন যে দিল্লীশ্বরী হইয়াও ঐ বস্ত্রের কারুকার্য্য বা উন্নতিসাধনে অমনোযোগী হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রসাদে অন্তঃপুরে বীরভূমের তন্তুবায়হস্তনির্ম্মিত চেলির বসন ভিন্ন মোগল মহিলাগণের অন্য কোন সজ্জা মনোনীত হইত না। ঢাকার "জল তরঙ্গিণী" কেবল গল্প নহে। একদিন আরঙ্গেব নৃপতি আপন কন্যার অঙ্গলাবণ্য সন্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্ৎসনা করায়, কুমারী সলজ্জে উত্তর দিয়া ছিলেন যে তাঁহার অঙ্গ সাতপুরু অঙ্গিয়ায় আবৃত। এতৎসম্বন্ধে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁয়ের সময়েও একটি কৌতুকাবহ ঘটনা হইয়া যায়। হরিত দুর্ব্বা দলময় প্রাঙ্গণে এক খানি মলমলের চাদর বিস্তৃত ছিল। এক জন তন্তুবায়ের গাভি ঐ বস্ত্র দেখিতে না পাইয়া, ঘাসের সহিত তাহা গ্রাস করায় তন্তুবায় নগরবহিষ্কৃত হয়। অতি অল্পদিন হইল মেদিনীপুর প্রদেশের অন্তর্গত মনোহরপুর ও বর্দ্ধমান সন্নিদ্ধে বন পাশ (কামারপাড়া) পল্লিতে যেরূপ লৌহাস্ত্র দা, কাটারি, চাকু ও পিস্তল নির্ম্মিত হইত তাহা শিল্প নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয়স্থল ছিল। বীরভূম প্রদেশের ইলাম বাজারের গালার খেলনা, আলুন্দরের দবি ও হস্তিদন্ত নির্ম্মিত পুত্তল গুলি কেমন সুন্দর ও শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় তাহা অনেকে জানেন। অপর মূল্যবান্ স্বর্ণ বা রৌপ্যানির্ম্মিত অলঙ্কারের বিষয় এই বলিলেই হয় যে অতি প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এরূপ সূক্ষ্ম গঠন কোন দেশেই এ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয় নাই। বিদেশীয় উচ্ছিষ্ট দ্রব্য-সম্ভোগ রুচির জয় হউক। বিলাতি সামগ্রীর পক্ষপাত প্রবৃত্তির জয় হউক। আমাদের দেশীয় নগরে সমুদায় শিল্প-নিপুণতার যদিও অবনতি দৃষ্ট হয় তথাপি সে সকল স্থান সভ্যের আবাসভূমি বলিয়া এক্ষণেও নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কারু-কার্য্যের যে এত অবনতি হইয়াছে তথাপি বঙ্গদেশ জাত দ্রব্যাদি ইউরোপ খণ্ডের বৃহৎ বৃহৎ দ্রব্যপরিদর্শনে কলনির্ম্মিত, ষ্টীম-এন্‌জিন গঠিত সামগ্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। সম্প্রতি পেরিশ ও ভিয়েনা উভয় নগরের শিল্পসামগ্রী পরিদর্শনে নিরপেক্ষ মহোদয়গণ ভারতবর্ষের শিল্পীদের* মুক্তকণ্ঠে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। মানসিক ব্যাপার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে আমরা একদিকে দাসত্বভার বহন করি-

* "The Emperor was especially struck with the beauty and novelty of the Indian Show, which the Arch-Duke Charles Lowis declared in conversation with the Royal commissioner, to be the best in the whole building—*opening of the Vienna Exhibetion.*
See also p. 98, of Dr. R. L. Mitra, Orissa vol. 1.

যাও চিন্তাশীলতা, বুদ্ধির পরিচালনা, সামাজিক নীতি বা ক্রিযাকলাপ শিথিল হইতে দিই নাই। নিজধর্ম্মে আস্থা, পরধর্ম্মে বিদ্বেষবিহীনতা ও শাস্ত্র আলোচনায় আমরা কখন পরাঙ্মুখ নহি, নিতান্ত দুর্ব্বল, পরপীড়িত ও কুসংস্কারবিশিষ্ট হইযাও আমাদের সমাজে বিদ্যার মার্জ্জনা ও ধর্ম্মের সংস্করণ মধ্যে২ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কবিত্বের আদর, প্রতি গণ্ডগ্রামেই শাস্ত্রের, স্মৃতির, ন্যায়ের আলোচনা ঘোরতর দাসত্বের অন্ধকারও ছিন্ন ভিন্ন করিযাছে। জয়দেব, চণ্ডীদাস, মুকুন্দ, রঘুনন্দন, রঘুনাথ, গৌরাঙ্গদেব বঙ্গভূমির মলিনমুখ মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল করিযাছেন। কিন্তু আমরা উদার, মার্জ্জনাশীল, পরদুঃখ গ্রাহী, সহৃদয, শিষ্ট ও সুবুদ্ধি হইযাও দুর্ব্বল, সাহসবিহীন। এই স্থানে ইটালিয়ান ও বঙ্গবাসিগণ সমকক্ষস্থাযী। দুর্ব্বলের অন্তকপটতা, চাতুরি ও বিপদে ভীতি ভীরুতাসম্ভূত পাপে কলঙ্কিত, একতার অভাবে জাতিপ্রতিষ্ঠা স্থাপনে অপারগ। যে মরিবার মরুক আমার কি? প্রতিবেশীর ঘরে ডাকাইতি ত আমার কি? আমার কপাট দৃঢ় অর্গলে বদ্ধ—নিদ্রা যাই! কিন্তু এরূপ চিন্তা পাপ বলিয়া আমাদের জ্ঞান আছে। যাঁহারা কহেন, যে ইহা আমাদের স্বভাব সিদ্ধ তাঁহারা কি সত্যবাদী? না আমাদের বিদ্বেষী বৈরী? এ সকল স্বভাবগত পাপ নহে, কেবল সমাজগত অবস্থাঘটিত চরিত্রদোষ। এই দোষাচরণ না করিলে দুর্ব্বলের সমাজ রক্ষার, প্রাণ রক্ষার, সম্ভ্রম রক্ষার আর কি উপায় ছিল? এই পাপ সংশোধন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, যখন পাপ বলিযা আমাদের জ্ঞান হইযাছে, তখন সংশোধন হইবার লক্ষণ দৃষ্ট হইয়েছে। কিন্তু সুশিক্ষিত দূরদর্শী দেশমুখের নিকট আমাদের একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে, ভীরুতা পাপমোচনের উপায কি? যাহারা সাহসে নির্ভর করিযা লৌহাস্ত্রে ও শোণিতবিসর্জ্জনে রাজ্যবিস্তার করিতে প্রবৃত্ত আজি তাহাদেরই উন্নতি দেখ, আর যাহারা শান্তিধর্ম্ম অবলম্বনে অনুবৃত্তিসাহায্যে ঋষি হইযা বসিয়াছেন তাহাদেরও দশা সন্দর্শন কর, যাহারা এই ঋষিধর্ম্ম ও বীরকার্য্য সামঞ্জস্য করিতে পারিবেন তাঁহারাই প্রকৃত সভ্য। আমরা জানি আমাদের সমাজের অনেক অনেক চূড়ামণি দেশের বর্ত্তমান অবস্থায নিরাশ হইযা হাল ছাড়িযা দিযাছেন। তাঁহারা কহিযা থাকেন এ হতভাগ্য দেশের কোন আশা নাই, যে দেশে চোক রাঙ্গাইলে অপরাধী হইতে হয, সেখানে চক্ষু মুদিয়া থাকাই শ্রেয়স্কর। ভারত-উর্ব্বী নির্ব্বীর হইযাছে, নির্ব্বীরই থাকিবে। কিন্তু যদি মহীতলে দুই এক শত বৎসর মধ্যে প্রলয় উপস্থিত হইবার সংবাদ থাকিত, যদি বঙ্গজাতির জীবন মিয়াদি পাট্টাভুক্ত হইত তাহা হইলে এ সংস্কার প্রামাণিক বলিযা গণ্য করিতাম। কিন্তু সংসার অপরিমেয় কালব্যাপী, সেই কালব্যাপ্তিতে যে গুণের উৎকর্ষণ

কর সম্ভব না হউক বিলম্বেও ফল ফলিবে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায় প্রথমতঃ আরমেনিয়ান জাতি এতদূর নির্ব্বীর্য্য ও যুদ্ধপরাঙ্মুখ ছিল যে তাহাদিগকে পরাভব করিতে অধিনায়ক লুমিলিয়স ও পম্পি নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সপ্তশত বৎসরে সেই দুর্ব্বল জাতির সন্তানেরা মহীতলে এতদ্রূপ বীর্য্যবান্ সৈনিক পুরুষ বলিয়া গণ্য হয় যে তাহারা বিনাসাহায্যে তত্তৎকালীন মহা পরাক্রমশালী পারস্য সাম্রাজ্যকে এককালীন বিধ্বংস করে। এখনকার ইটালিয়ান জাতির অবস্থা কি? ধন্য গারিবল্ডি! যিনি উক্ত জাতিকে পুনরায় বীরের আসনে নীত করিয়াছেন। আইন যত কঠিন হউক আমাদের মানসিক, কোন বৃত্তি পরিচালনার প্রতিরোধ করিতে পারে না। এক্ষণে ভীরুতা পাপ পরিত্যাগ করা অল্প বয়স হইতে পুস্তকের পোকা না হইয়া যাহাতে দেশগৌরব জাতীয় প্রতিষ্ঠা সংবর্দ্ধনে সক্ষম হওয়া যায় তাহারই আলোচনা নিতান্ত কর্ত্তব্য, কবিগুরু বাল্মীকির অপেক্ষা ইদানীন্তন আমেরিকা রাজ্যহিতৈষী জনাথন ভাবার বাক্য আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় অহরহ স্মরণ রাখা চাই "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

এখন কোন কোন বচনের পরামর্শ শুনিয়া শস্ত্রপাণি পুরুষ দেখিয়া প্রস্থান করা, ঘোটকের শতপদের মধ্যে গমন না করা কর্ত্তব্য, কি ইতিহাসের, বিজ্ঞানের উপদেশ গ্রহণে বীরধর্ম্ম অবলম্বন করা উচিত তাহাই চিন্তাশীল সুশিক্ষিতের বিচার্য্য।

কৃষ্ণকান্তের উইল।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

এখন ক্ষীরি চাকরাণী মনে করিল যে, এ বড় কলিকাল—এক রতি মেয়েটা, আমার কথায় বিশ্বাস করে না। ক্ষীরোদার সরল অন্তঃকরণে ভ্রমরের উপর রাগ দ্বেষাদি কিছুই নাই, সে ভ্রমরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী বটে, তাহার অমঙ্গল চাহে না, তবে ভ্রমর, যে তাহার ঠকামি কাণে তুলিল না, সেটা অসহ্য। ক্ষীরোদা তখন, সুচিক্কণ দেহযষ্টি সংক্ষেপে তৈলনিষিক্ত করিয়া, রঙ্গ করা গামছা খানি কাঁধে ফেলিয়া, কলসীকক্ষে, বারুণীর ঘাটে স্নান করিতে চলিল।

হরমণি ঠাকুরাণী, বাবুদের বাড়ীর এক জন পাচিকা, সেই সময় বারুণীর ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিতেছিল, প্রথমে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। হরমণিকে দেখিয়া ক্ষীরোদা আপনা আপনি বলিতে

লাগিল, "বলে যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর—আর বড় লোকের কাজ করা হয় না—কখন কার মেজাজ কেমন থাকে, তার ঠিকানাই নাই।"

হরমণি, একটু কোন্দলের গন্ধ পাইয়া, দাহিন হাতের কাচা কাপড় খানি বাঁ হাতে রাখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "কিলো ক্ষীরোদা—আবার কি হয়েছে?"

ক্ষীরোদা তখন মনের বোঝা নামাইল। বলিল, "দেখ দেখি গা—পাড়ার কালা মুখীরা বাবুর বাগানে বেড়াইতে যাবে—তা কি আমরা ঢাকব রাকব—আমরা কি তা মুনিবের কাছে বলিতে পারি না।"

হর। সে কি লো? পাড়ার মেয়ে আবার বাবুর বাগান বেড়াইতে কে গেল?

ক্ষী। আর কে যাবে? সেই কালা-মুখী রোহিণী।

হর। কি পোড়া কপাল। রোহিণীর আবার এমন দশা কত দিন? কোন বাবুর বাগানে রে ক্ষীরোদা?

ক্ষীরোদা মেজ বাবুর নাম করিল। তখন দুইজনে একটু চাওয়াচাওয়ি করিয়া একটু রসের হাসি হাসিয়া, যে যে দিকে যাইবার, সে সেই দিকে গেল। কিছুদূর গিয়াই ক্ষীরোদার সঙ্গে পাড়ার রামের মার দেখা হইল। ক্ষীরোদা তাহাকেও হাসির ফাঁদে ধরিয়া ফেলিয়া দাঁড় করাইয়া রোহিণীর দৌরাত্ম্যের কথা পরিচয় দিল। আবার দুজনে হাসি চাহনি ফেরাফিরি করিয়া অভীষ্ট পথে গেল।

এইরূপে, ক্ষীরোদা, পথে রামের মা, শ্যামের মা, হারী, তারী, পারী, যাহার দেখা পাইল, তাহারই কাছে আপন মর্ম্মপীড়ার পরিচয় দিয়া, পরিশেষে সুস্থ-শরীরে প্রফুল্ল হৃদয়ে বারুণীর স্ফাটিক বারিরাশিমধ্যে অবগাহন করিল। এদিকে হরমণি, রামের মা, শ্যামের মা, হারী, তারি পারী যাহাকে যেখানে দেখিল তাহাকে সেইখানে ধরিয়া শুনাইয়া দিল, যে রোহিণী হতভাগিনী মেজ বাবুর বাগান বেড়াইতে গিয়াছিল। একে শূন্য দশ হইল, দশে শূন্য শত হইল, শতে শূন্য সহস্র হইল। যে সূর্য্যের নবীন কিরণ তেজস্বী না হইতে হইতেই, ক্ষীরি প্রথম ভ্রমরের সাক্ষাতে রোহিণীর কথা পাড়িয়াছিল, তাহার অস্তগমনের পূর্ব্বেই গৃহে গৃহে ঘোষিত হইল, যে রোহিণী গোবিন্দলালের অনুগৃহীতা। কেবল বাগানের কথা হইতে অপরিমেয় প্রণয়ের কথা, অপরিমেয় প্রণয়ের কথা হইতে অপরিমেয় অলঙ্কারের কথা, আর কত কথা উঠিল, তাহা আমি, হে রটনাকৌশল পরকলঙ্ককলিতকণ্ঠ কুলকামিনী গণ! তাহা আমি, অধম সত্যশাসিত পুরুষ লেখক আপনাদিগের কাছে সবিস্তারে বলিয়া বাড়াবাড়ি করিতে চাহি না।

ক্রমে ভ্রমরের কাছে সম্বাদ আসিতে লাগিল। প্রথমে বিনোদিনী আসিয়া বলিল, "সত্যি কি না?" ভ্রমর, একটু শুষ্ক মুখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বুকে বলিল, "কি সত্য ঠাকুর ঝি?" ঠাকুর ঝি,

তখন কুলধনুর মত দুই খানি ভ্রূ একটু জড় সড় করিয়া, অপাঙ্গে একটু বৈদ্যুতী প্রেরণ করিয়া ছেলেটিকে কোলে টানিয়া বসাইয়া, বলিল, "বলি, রোহিণীর কথাটা?"

ভ্রমর, বিনোদিনীকে কিছু না বলিতে পারিয়া, তাহার ছেলেটীকে টানিয়া লইয়া, কোন বালিকাসুলভ কৌশলে, তাহাকে কাঁদাইল। বিনোদিনী বালককে স্তন্য পান করাইতে স্বস্থানে চলিয়া গেল।

বিনোদিনীর পর সুরধুনী আসিয়া বলিলেন, "বলি মেজ বৌ বলি বলি ছিলুম, মেজ বাবুকে অষুধ কর। তুমি হাজার হৌক গৌরবর্ণ নও, পুরুষ মানুষের মন ত কেবল কথায় পাওয়া যায় না, একটু রূপ গুণ চাই। তা ভাই, রোহিণীর কি আক্কেল, কে জানে?"

ভ্রমর বলিল, "রোহিণীর আবার আক্কেল কি?"

সুরধুনী কপালে করাঘাত করিয়া বলিল "পোড়া কপাল। এত লোক শুনেছে—কেবল তুই শুনিস নাই? মেজ বাবু যে রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছে।"

ভ্রমর হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া মনে মনে, সুরধুনীকে যমের হাতে সমর্পণ করিল। প্রকাশ্যে, একটা পুতুলের মুণ্ড মুচড় দিয়া ভাঙ্গিয়া সুরধুনীকে বলিল, "তা আমি জানি। খাতা দেখিয়াছি। তোর নামে

বিনোদিনী সুরধুনীর পর, রামী, বামী, শ্যামী, কামিনী, রমণী, শারদা, প্রমদা, সুখদা, বরদা, কমলা, বিমলা, শীতলা, নির্ম্মলা, মাধু, নিধু, শিধু, বিধু, তারিণী, নিস্তারিণী, দীনতারিণী, ভবতারিণী, সুরবালা, গিরিবালা, ব্রজবালা, শৈলবালা প্রভৃতি অনেকে, আসিয়া, একে একে, দুইয়ে দুইয়ে, তিনে তিনে, দুঃখিনী বিরহকাতরা বালিকাকে জানাইল, যে তোমার স্বামী রোহিণীর প্রণয়াসক্ত। কেহ যুবতী, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ বর্ষীয়সী, কেহ বা বালিকা, সকলেই আসিয়া ভ্রমরকে বলিল, "আশ্চর্য্য কি? মেজ বাবুর রূপ দেখে কে না ভোলে? রোহিণীর রূপ দেখে তিনিই না ভুলিবেন কেন?" কেহ আদর করিয়া, কেহ চিটাইয়া, কেহ রসে, কেহ রাগে, কেহ সুখে, কেহ দুঃখে, কেহ হেসে, কেহ কেঁদে ভ্রমরকে জানাইল, যে ভ্রমর তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

গ্রামের মধ্যে ভ্রমর সুখী ছিল। তাহার সুখ দেখিয়া সকলেই হিংসায় মরিত—কালো কুৎসিতের এত সুখ?—অনন্ত ঐশ্বর্য্য—দেবীদুর্লভ স্বামী—লোকে কলঙ্কশূন্য যশ। অপরাজিতাতে পদ্মের আদর? আবার তার উপর মল্লিকার সৌরভ? গ্রামের লোকের এত সহিত না। তাই, পালে পালে, দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনী সঙ্গে করিয়া, কেহ কবরী বাঁধিয়া,

চুলে, সম্বাদ দিতে আসিলেন, "ভ্রমর তোমার সুখ গিয়াছে।" কাহারও মনে হইল না, যে ভ্রমর, পতিবিরহবিধুরা, নিতান্ত দোষশূন্যা, দুঃখিনী বালিকা।

ভ্রমর আর সহ্য করিতে না পারিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া, ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, "হে সন্দেহ ভঞ্জন! হে প্রাণাধিক! তুমিই আমার সন্দেহ, তুমিই আমার বিশ্বাস! আজ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? আমার কি সন্দেহ হয়? কিন্তু সকলেই বলিতেছে। সত্য না হইলে সকলে বলিবে কেন? তুমি এখানে নাই আজি আমার সন্দেহভঞ্জন কে করিবে? আমার সন্দেহভঞ্জন হইল না—তবে মরি না কেন? এ সন্দেহ লইয়া কি বাঁচা যায়? আমি মরি না কেন? ফিরিয়া আসিয়া প্রাণেশ্বর! আমায় গালি দিও না যে ভোমরা আমায় না বলিয়া মরিয়াছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

এখন, ভ্রমরেরও যে জ্বালা, রোহিণীরও সেই জ্বালা। কথা যদি রটিল, রোহিণীর কাণেই বা না উঠিবে কেন? রোহিণী শুনিল যে গ্রামে রাষ্ট্র যে গোবিন্দলাল তাহার গোলাম—সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছে। কথা যে কোথা হইতে রটিল তাহা রোহিণী তদন্ত করে নাই. একেবারে সিদ্ধান্ত করিল যে তবে ভ্রমরই রটাইয়াছে। নহিলে এত গায়ের জ্বালা কার? রোহিণী ভাবিল—ভ্রমর আমাকে বড় জ্বালাইল। সে দিন চোর অপবাদ, আজ আবার এই অপবাদ। এ দেশে আর আমি থাকিব না। কিন্তু যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়া যাইব।

রোহিণী না পারে এমন কাজই নাই, ইহা পাঠক পূর্ব্ব পরিচয়ে জানিয়াছেন। রোহিণী কোন প্রতিবাসিনীর নিকট হইতে এক খানি বানারসী সাড়ী ও এক সুট গিলটির গহনা চাহিয়া আনিল। সন্ধ্যা হইলে সেই গুলি পুঁটুলি বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া রায়দিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যথায় ভ্রমর একাকিনী মৃৎশয্যায় শয়ন করিয়া, একএক বার কাঁদিতেছে, এক একবার চক্ষের জল মুছিয়া কড়ি পানে চাহিয়া ভাবিতেছে, তথায় রোহিণী গিয়া পুঁটুল রাখিয়া উপবেশন করিল। ভ্রমর বিস্মিত হইল—রোহিণীকে দেখিয়া বিষের জ্বালায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সহিতে না পারিয়া ভ্রমর বলিল,

"তুমি সে দিন রাত্রে ঠাকুরের ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছিলে? আজ রাত্রে কি আমার ঘরে সেই অভিপ্রায়ে আসিয়াছ না কি?"

রোহিণী মনে মনে বলিল যে তোমার

বলিল, "এখন আর আমার চুরির প্রয়োজন নাই। আমি আর টাকার কাঙ্গাল নহি। মেজ বাবুর অনুগ্রহে, আমার আর খাইবার পরিবার দুঃখ নাই। তবে লোকে যতটা বলে ততটা নহে।"

ভ্রমর বলিল, "তুমি এখান হইতে দূর হও।"

রোহিণী সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিতে লাগিল, "লোকে যতটা বলে ততটা নহে। লোকে বলে আমি সাত হাজার টাকার গহনা পাইয়াছি। মোটে তিন হাজার টাকার গহনা, আর এই সাড়ী খানি পাইয়াছি। তাই তোমায় দেখাইতে আসিয়াছি। সাত হাজার টাকা লোকে বলে কেন?"

এই বলিয়া রোহিণী পুঁটুলি খুলিয়া বানারসী সাড়ী ও গিল্‌টির গহনা গুলি ভ্রমরকে দেখাইল। ভ্রমর লাথি মারিয়া অলঙ্কার গুলি চারিদিকে ছড়াইয়া দিল।

রোহিণী বলিল, "সোনায় পা দিতে নাই।" এই বলিয়া রোহিণী নিঃশব্দে গিল্‌টির অলঙ্কার গুলিন একে একে কুড়াইয়া আবার পুঁটুলি বাঁধিল। পুঁটুলি বাঁধিয়া, নিঃশব্দে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমাদের বড় দুঃখ রহিল। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে পিটিয়া দিয়াছিল, কিন্তু রোহিণীকে একটি কীলও মারিল না, এই আমাদের আন্তরিক দুঃখ। আমরা উপস্থিত থাকিলে, রোহিণীকে যে স্বহস্তে প্রহার করিতাম, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কোন সংশয়ই নাই। স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই এ কথা মানি। কিন্তু রাক্ষসী বা পিশাচীর গায়ে যে হাত তুলিতে নাই, একথা তত মানি না। তবে ভ্রমর যে রোহিণীকে কেন মারিল না, তাহা বুঝাইতে পারি। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে ভাল বাসিত, সেই জন্য তাহাকে মারপিট করিয়াছিল। রোহিণীকে ভাল বাসিত না, এ জন্য হাত উঠিল না। ছেলের ছেলেয় ঝগড়া করিলে জননী আপনার ছেলেটিকে মারে, পরের ছেলেটিকে মারে না।

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রি প্রভাত না হইতেই ভ্রমর স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল। লেখা পড়া গোবিন্দলাল শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রমর লেখাপড়ায় তত মজবুত হইয়া উঠে নাই। ফুলটি পুতুলটি পাখীটি স্বামীটিতে ভ্রমরের মন, লেখা পড়া বা গৃহকর্ম্মে তত নহে। কাগজ লইয়া লিখিতে বসিলে, একবার মুছিত, একবার কাটিত, একবার কাগজ বদলাইয়া আবার মুছিত, আবার কাটিত। শেষ ফেলিয়া রাখিত। দুই তিন দিনে একখানা পত্র শেষ হইত না। কিন্তু আজ সে সকল কিছু হইল না। তেড়া বাঁকা ছাঁদে, যাহা লেখনীর অগ্রে বাহির হইল, আজ তাহাই ভ্রমরের মঞ্জুর। "ম" গুলা "স" র মত হইল— "স" গুলা "ম" র মত হইল—"ধ" গুলা

ফর মত, "ফ" গুলা "থ" র মত "থ" গুলা "খ" র মত, ইকারের স্থানে আকার—আকারের এককালীন লোপ, যুক্ত অক্ষরের স্থানে পৃথক পৃথক অক্ষর, কোন কোন অক্ষরের এককালীন লোপ, —ভ্রমর কিছু মানিল না। ভ্রমর আজি এক ঘণ্টার মধ্যে এক দীর্ঘ পত্র স্বামীকে লিখিয়া ফেলিল। কাটাকুট যে ছিল না এমত নহে। আমরা পত্রখানির কিছু পরিচয় দিতেছি।

ভ্রমর লিখিতেছে—

"সেবিকা শ্রী ভোমরা" (তার পর তোমরা কাটিয়া ভ্রমরা) "দাস্যাঃ" (আগে দাস্যা, তাহা কাটিয়া দাস্য—তাহা কাটিয়া দাস্যো—দাস্যাঃ ঘটিয়া উঠে নাই) প্রণামাঃ (প্র লিখিতে প্রথমে "প্র" তার পর "শ্র" শেষে "প্র") "নিবেদনঞ্চ" (প্রথমে নিবেদঞ্চ, তার পর নিবেদনঞ্চ) "বিষেস।" (বিশেষঃ হইয়া উঠে নাই)

এইরূপ পত্র লেখার প্রণালী। যাহা লিখিয়াছিল, তাহার বর্ণগুলি শুদ্ধ করিয়া, ভাষা একটু সংশোধন করিয়া নিম্নে লিখিতেছি।

"সে দিন রাত্রে বাগানে কেন তোমার দেরি হইয়াছিল—তাহা আমাকে ভাঙ্গিয়া বলিলে না। দুই বৎসর পরে বলিবে বলিয়া ছিলে, কিন্তু আমি কপালের দোষে আগেই তাহা শুনিলাম। শুনিয়াছি কেন, দেখিয়াছি। তুমি রোহিণীকে যে বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছ, তাহা সে স্বয়ং আমাকে দেখাইয়া গিয়াছে।

তুমি মনে জান বোধ হয় যে তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম, যে তাহা নহে। যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি, যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি পিত্রালয়ে যাইব।"

গোবিন্দলাল যথাকালে সেই পত্র পাইলেন। তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কেবল হস্তাক্ষরে এবং বর্ণশুদ্ধির প্রণালী দেখিয়াই তিনি বিশ্বাস করিলেন যে এ ভ্রমরের লেখা। তথাপি মনে অনেকবার সন্দেহ করিলেন—ভ্রমর তাঁহাকে এমন পত্র লিখিতে পারে তাহা তিনি কখন বিশ্বাস করেন নাই।

সেই ডাকে আরও কয়খানি পত্র আসিয়াছিল। গোবিন্দলাল প্রথমেই ভ্রমরের পত্র খুলিয়াছিলেন; পড়িয়া স্তম্ভিতের ন্যায় অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন; তার পর সে পত্রগুলি অন্যমনে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের একখানি পত্র পাইলেন। কবিতাপ্রিয় ব্রহ্মানন্দ লিখিতেছেন—

"ভাই হে! রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়—উলু খড়ের প্রাণ যায়। তোমার উপর

বৌ মা সকল দৌরাত্ম্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা দুঃখী প্রাণী, আমাদিগের উপর এ দৌরাত্ম্য কেন? তিনি রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, তুমি রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছ। আরও কত কদর্য্য কথা রটিয়াছে—তাহা তোমাকে লিখিতে লজ্জা করে।—যাহা হৌক, তোমার কাছে আমার নালিশ—তুমি ইহার বিহিত করিবে। নহিলে আমি এখানকার বাস উঠাইব। ইতি।"

গোবিন্দলাল আবার বিস্মিত হইলেন। —ভ্রমর বটাইয়াছে?

মর্ম্ম কিছুই না বুঝিতে পারিয়া গোবিন্দলাল সেইদিন আজ্ঞা প্রচার করিলেন, যে এখানকার জল বায়ু আমার সহ্য হইতেছে না—আমি কালই বাটী যাইব। নৌকা প্রস্তুত কর।

পর দিন নৌকারোহণে, বিষণ্ন মনে, গোবিন্দলাল গৃহে যাত্রা করিলেন।

শৈশব সহচরী।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ।

দেশান্তরে।

সেই নিশীথে—সেই জ্যোৎস্নময়ী নিশীথে দুইটি অবগুণ্ঠনবতী যুবতী রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন। যেমন বসন্তপবন-সঞ্চালনে বৃক্ষের কুসুমপল্লবসমন্বিত শাখা সকল অতি ধীরে ধীরে দুলিতে থাকে, অবগুণ্ঠনবতীদিগের ক্ষীণাঙ্গ সেই রূপ দুলিতেছিল। রাজপথ জনশূন্য, চন্দ্রালোকে অতি সুন্দর,এবং পরিষ্কার দেখাইতেছিল। তাহার পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে ভীম তরু সকল প্রহরীস্বরূপ দাঁড়াইয়া শন শন করিয়া ধ্বনি করিতেছিল; চন্দ্রালোকবিচ্ছেদে বৃক্ষতলে স্থানে স্থানে নিবিড় অন্ধকার হইয়াছিল। যুবতীদ্বয় অতি সঙ্কুচিত চিত্তে দ্রুতপদে যাইতেছিলেন, মধ্যে মধ্যে অতি মৃদুমধুর স্বরে কথোপকথন করিতেছিলেন এবং কখন কখন পশ্চাদ্বর্ত্তিনী পরিচারিকাকে ডাকিতেছিলেন "বিধু চলে আয় না" আবার মৃদু মৃদু স্বরে কথোপকথন করিতেছিলেন।

বয়ঃকনিষ্ঠা কহিল,

"দিদি তুমি অন্যমনস্ক হইতেছ কেন?" বয়োজ্যেষ্ঠা উত্তর করিল—"বিনোদ আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। এই শুনিলাম রজনীর বড় জ্বর হইয়াছে—অঘোর হইয়া আছে—এমন লোকটি তাহার নিকট নাই যে তাহাকে দেখে—সেই জন্য বাবাকে বলে আমরা তাড়াতাড়ি

আসিলাম। কিন্তু তাহার ঘরে কেহ নাই —খালি রহিয়াছে, ঘরে চাবি দেওয়া নাই—খোলা রহিয়াছে—অথচ রজনী সেখানে নাই—ঘরের ভিতর একটি বিছানা পড়িয়া রহিয়াছে—একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে—কিন্তু রজনী নাই।—বিনোদ, জগদায়ে তবে রজনী এ রাত্রে কোথা গেল? তবে কি তাহার কোন দুর্ঘটনা ঘটিল। আহা! কত কষ্ট পাইতেছে—সকলি এ অভাগিনীর জন্য।” বলিতে বলিতে স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। অবগুণ্ঠন দ্বারা মুখ আবৃত করিলেন, কিন্তু তাঁহার ঘন ঘন নিশ্বাসে বুঝা গেল যেন তিনি ক্রন্দন করিতেছেন। এই যে যুবতী রজনীর দুঃখে দুঃখিতা হইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন ইনি কুমুদিনী।

তিন জনে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধে চলিলেন। কুমুদিনীর কত কি মনে হইতে লাগিল,—পূর্ব্বকথা স্মরণ হইতে লাগিল। —রজনীর সহিত গঙ্গাতীরে তাঁহার প্রথম সন্দর্শন—কি বিপদেই প্রথম সন্দর্শন!—সেই এক দিন রজনীর জন্য মনে কষ্ট পাইয়াছিলেন—সে কত কষ্ট—তাঁহার উরুদেশে কত যত্নের সহিত রজনীর মস্তক রাখিয়াছিলেন।—সেই অবধি রজনীর প্রতি তাঁহার কিছু মনে মনে স্নেহ জন্মিয়াছে—কিন্তু সে স্নেহ কুমুদিনী কখন বুঝিতে পারেন নাই—তার পর রজনী তাঁহার ভগিনীপতি হইল—তাঁহার সোণার স্বর্ণপ্রভার স্বামী হইল—তখন সেই স্নেহ বদ্ধমূল হইল—রজনীকে সহোদরের ন্যায় ভাল বাসিতে লাগিলেন—সেই রজনীর এত কষ্ট?—এত কষ্টের কারণ কে? সে কারণ কুমুদিনীই। নয়নে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। আর এক দিনের ঘটনা তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—সেই বাপীকূলে—সেই জ্যোৎস্নাময়ী বাপীকূলে—সেই কুসুমিত কামিনী কুঞ্জবনে—রজনী তাঁহাকে কি বলিয়াছিল; —স্মরণে বড় লজ্জা হইল—সে যে ভাল বাসার কথা,—রজনী তাঁহাকে ভাল বাসিত,—কি লজ্জা। লজ্জায় মুখ রক্তিমাবর্ণ হইল—মাথায় আরো কাপড় টানিলেন—সে সময়ে রজনী কি কথা বলিয়াছিল তাহা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলেন। সকলই স্মরণ হইল। তিনি তাহাকে কি উত্তর দিয়াছিলেন, স্বভাবতঃ তাহাও মনে হইল—প্রথমে হেসে হেসে আদর করে বলেছিলেন—ছিঃ অমন কথা বলিও না—তুমি আমার ভগিনীপতি —আমার স্বর্ণপ্রভার স্বামী—আমি কি স্বর্ণের স্বামী কাড়িয়া লইতে পারি;—অমন কথা যদি আর বল, তা হলে এই কুসুমিত কামিনী বৃক্ষের ডালে আঁচল গলায় বাঁধিয়া মরিব।—তার পর আবার কি কথায় রাগ হইয়াছিল—সেই রাগে রজনীকে তাঁহার নিকট মুখ দেখাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন—এবং সঙ্গে সঙ্গে কত রূঢ় কথা বলিয়াছিলেন—সেই অবধি একবার রজনীর সহিত ভাল করে দেখা করিবার বড় সাধ করিত—একবার মন খুলে কথা কহিতে সাধ

হইত,—কত সাধ হইত—কিন্তু সে সাধ পুরিত না—রজনী তাঁহাকে দেখিলে সরিয়া যাইত—কুমুদিনীর বোধ হইত—যেন ঘৃণা করিয়া সরিয়া যাইত—তজ্জন্য কুমুদিনী কত দুঃখিত হইতেন—গোপনে কত কাঁদিতেন—এক এক দিন কেঁদে কেঁদে চক্ষু ফুলে উঠিত।

এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে রমণী-ত্রয় গঙ্গাতীরের রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। নদীর মৃদু মধুর জলকল্লোল নিনাদে ও নদীতীরস্থ শীতল নৈশ বায়ুস্পর্শে কুমুদিনীর স্বপ্ন ভাঙ্গিল। সম্মুখে অনন্ত বারিরাশি চন্দ্রালোকে ঝিক্‌মিক্ করিতে করিতে নাচিতেছে আর দূরে একখানি ক্ষুদ্র তরী তরতর বেগে দক্ষিণাভিমুখে ধূম-প্রান্তে মিশাইতেছে, তাহার দাঁড়ের প্রক্ষিপ্ত জলকণা চন্দ্রকিরণে নাচিতেছে। কুমুদিনী মোহিতনেত্রে সেই নৌকার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ভাবিলেন কে এমন দুর্ভাগ্য আছে যে, সকল ত্যাগ করিয়া এই মধুর জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে দেশান্তরে যাইতেছে—আহা বোধ হয় ওর কেহ নাই।—অভাগার প্রতি দয়া হইল—সেই জন্য সেই নৌকাপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ কে তাঁহার স্কন্ধদেশস্পর্শ করিল—অতি ভয়-সূচক স্বরে বলিল, "দিদি দেখ।"

কুমুদিনী চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি?"

"ঐ দেখ, গাছতলায় কি নড়িতেছে।" কুমুদিনী দেখিলেন নদীতীরে বৃক্ষের তলে নিবিড় অন্ধকারমধ্যে কি নড়িতেছে—মানুষ বলিয়া বোধ হইল—কিঞ্চিৎ ভীতা হইয়া রমণীগণ অতি দ্রুত চলিতে লাগিলেন। অনতিদূর আসিলা তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারিণী পরিচারিকা একবার পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করিল, অমনি বলিয়া উঠিল "ওগো কে দৌড়ে ধর্‌তে আস্‌চে।" প্রথমতঃ কুমুদিনী, বিনোদিনী ও তাঁহার পরিচারিকার ন্যায় দৌড়িয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান ব্যক্তি একটি স্ত্রীলোক। তাঁহাকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছে। কুমুদিনীর প্রথমে ইচ্ছা হইল দৌড়িয়া সমভিব্যাহারীদিগের সঙ্গ লয়েন, কিন্তু দৌড়িতে লজ্জা হইল। দ্রুতপদে চলিলেন, ইতিমধ্যে পশ্চাৎ ধাবমানা রমণী তাঁহার সন্নিকট হইয়া তাঁহাকে ডাকিল, "দিদিঠাকুরুন শোন শোন।" কুমুদিনী তাহাকে চিনিতে পারিয়া দাঁড়াইলেন। একটি পরমাসুন্দরী রমণী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অতি দ্রুত দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার হস্ত-ধারণ করিল এবং একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার রূপ দেখিয়া কুমুদিনী শিহরিয়া উঠিলেন। তাহার আগুল্ফ পর্য্যন্ত লম্বিত রুক্ষ এবং আলুলায়িত কেশরাশি সেই সুন্দর মুখমণ্ডল আবৃত করিয়াছে। সেই জ্যোৎস্নাময়ী গভীর নিশীথে, নিঃশব্দ এবং নির্জ্জন রাজপথে কুমুদিনীর চক্ষে সে রূপ অতি ভয়ঙ্কর

বোধ হইল। তাহার কটাক্ষ ভয়ঙ্কর—তাহার মধ্যে মধ্যে রুক্ষ কেশরাশি বিশিষ্ট মস্তক নাড়া ভয়ঙ্কর—সে ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্য কুমুদিনীর অসহ্য হইল। কুমুদিনী চক্ষু মুদিত করিলেন, আবার নদীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, নদীর রূপও ভয়ঙ্কর বোধ হইল। সেই নৈশ সমীরণ সন্তাড়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার মধুর নিনাদ ভয়ঙ্কর বোধ হইল, আর দূরপ্রান্তে সেই মোহিনী শক্তিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র তরণীর দাঁড়ের প্রক্ষিপ্ত যে জলকণা চন্দ্রালোকে ঝিকমিক করিতেছিল তাহাও ভয়ঙ্কর বোধ হইল। রাজপথ প্রতি দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন সঙ্গিনীগণ অদৃশ্য হইয়াছে—মনে মনে এক প্রকার ভাবের আবির্ভাব হইল। ভয় নহে কিন্তু যেন ভয়ের সহিত কোন সংশ্রব আছে।—কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া অতি কঠিন স্বরে স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, "কি চাও?—" রমণী উত্তর করিল "তিনি চলে গিয়াছেন ঐ দেখ যাইতেছেন," বলিয়া সেই ক্ষুদ্র নৌকার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" আগন্তুক কহিল "ঐ যাইতেছেন—জ্বর গায়ে যাইতেছেন—আমায় নিয়ে গেলেন না—উম্মাদিনী বলে নিয়ে গেলেন না—কিন্তু তাঁহাকে কে মানুষ করেছে—সে ত এই উন্মাদিনী—আমি কত কাঁদলুম তবু নিয়ে গেলেন না—কি হবে দিদিঠাকুরুণ কি হবে—কেমন করে বাঁচবেন—তিনি যে একাকী—সঙ্গে কেহ নাই আবার তাতে বড় জ্বর—বল্লেন আর এ দেশে কখন আস্‌বেন না—আর আমাদের সঙ্গে দেখা হবে না—বলিতে বলিতে উন্মাদিনী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। "কে, কে" কুমুদিনী বারম্বার, জিজ্ঞাসা করাতে অনেক ক্ষণের পর উন্মাদিনী বলিল, "আমার রজনীকান্ত।" শুনিবামাত্র কুমুদিনী বেগে তাহার হস্ত ত্যাগ করিয়া, নদীর কূলে আসিয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে সেই মোহিনীশক্তিধারিণী নৌকার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অনেক ক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া মুখ ফিরাইলেন, শেষে অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

ষড়্‌বিংশতি পরিচ্ছেদ।

প্রেম-উন্মাদ।

রজনীকান্তের দেশান্তর গমনের সংবাদ কুমুদিনীর পিতা এবং মাতা শুনিলেন। শুনিয়া উভয়ে বড় দুঃখিত হইলেন। তাহাদিগের পুত্রসন্তান ছিল না—দুই কন্যা মাত্র, কুমুদিনী ও স্বর্ণপ্রভা। কুমুদিনী বালবিধবা স্বর্ণপ্রভা মৃতা—বিবাহের দুই এক বৎসর পরেই মৃতা, এই সকল কারণে তাহার স্বামী রজনীকান্ত তাঁহাদিগের পুত্র সন্তানের স্থান পাইয়া ছিল। স্বর্ণপ্রভার মৃত্যু হইলেও রজনীর প্রতি তাঁহাদিগের স্নেহের হ্রাস হয় নাই, রজনীর হীনাবস্থা হইলে তাঁহারা রজনীকে তাঁহাদিগের পুত্রের ন্যায় গৃহে রাখিতে অনেক

চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু রজনী যাইতে স্বীকার করেন নাই। যাহা হউক রজনীর দেশান্তর গমনের সংবাদ শুনিয়া, কুমুদিনীর মাতা নিতান্ত কাতরা হইলেন। হরিনাথ বাবু দেশে দেশে লোক প্রেরণ করিলেন কিন্তু কোন সংবাদ পাইলেন না। তাঁহার বাটীতে সকলেই নিরানন্দ—সকলেই নিরুৎসাহ;—হরিনাথ বাবু চিন্তিত, কুমুদিনী গম্ভীর, তাঁহার মাতা কাতরা, রজনীকান্তের জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক তাঁহার মাতা দিন দিন অতিশয় কৃশ এবং দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন, অবশেষে শয্যাশায়ী হইলেন। গ্রাম্য কবিরাজ কিছুদিন চিকিৎসা করিল, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না, সকলে ভাল ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পরামর্শ দিল। কিন্তু ভাল ডাক্তার ত সেখানে নাই—কি উপায় হইবে. কুমুদিনী বড় ব্যস্ত হইলেন। হরিনাথ বাবু কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, আত্মীয়দিগের সহিত পরামর্শ করিলেন, তাহাদিগের মধ্যে শরৎকুমার পরম আত্মীয়, সম্বন্ধে জামাতা,—সন্তানের ন্যায় স্নেহভাজন, অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী, শরৎকুমারকে একবার আনিতে বলিয়া পাঠাইলেন। একদিন প্রাতে শরৎকুমার আসিলেন। হরিনাথ বাবু তাঁহাকে দেখিয়া বড় সুখী হইলেন এবং তাঁহার সাহস বৃদ্ধি হইল। বলিলেন, "তোমার শ্বশুড়ী মরণাপন্না, ভালরূপ চিকিৎসার কোন উপায় দেখিতেছি না, তিনি কাশীধামে যাইতে নিতান্ত মানস করিয়াছেন। তুমি বরং একবার কুমুদিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া যা হয় একটা স্থির কর, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

যে দিবস কুমুদিনী শরৎকে বলিয়াছিলেন "যদি তোমার কাছে আমি আত্মসমর্পণ স্বীকৃত হইয়া থাকি, তবে সে অঙ্গীকার বিস্মৃত হও" সেই দিবস হইতে শরৎকুমার আর কুমুদিনীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। আজ কুমুদিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহাতে মনে কত প্রকার ভাবের উদয় হইতে লাগিল। কখন মনে হইতে লাগিল, হয় ত কুমুদিনী সত্য সত্য তাঁহাকে ভাল বাসে,—কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সে দিবস তাহাকে রূঢ় বাক্য বলিয়াছিল। রজনীকান্তের বিষয়ের তিনি অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া রজনীর প্রতি কুমুদিনীর দয়া জন্মিয়াছিল, সেই জন্য ক্ষণিক তাঁহার প্রতি অস্নেহ জন্মিয়াছিল. বোধ হয় এক্ষণে সে ভাব অন্তর্হিত হইয়া থাকিবে, এবার হয় ত কত আদর করিবে—হয় ত বিবাহে সম্মতা হইবে। আবার ভাবিলেন, কুমুদিনী ধনবানকে ভাল বাসে না, দরিদ্রকে ভাল বাসে—রজনী এখন দরিদ্র—হয় ত তাহাকে ভাল বাসে, হয় ত তাহাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু রজনী ত দেশান্তরী—দেশান্তরী বটে, সেই জন্য ত আরো বিপদ; রজনী দরিদ্র, রজনী পীড়িত, রজনী মনোদুঃখে দেশান্তরী—কুমুদিনীর কি দয়ার শেষ আছে, রজনীর প্রতি

কুমুদিনীর দয়া, স্নেহ উচ্ছলিয়া উঠিয়াছে। রজনী কুমুদিনীর আদরের ভগিনীপতি, সেই রজনীর বিষয় তিনি লইয়াছেন। তিনি কে? সম্বন্ধে ভগিনীপতি মাত্র—তাঁহার প্রতি কি আর কুমুদিনী চাহিয়া দেখিবে? কখন না। এখন তিনি দরিদ্র—রজনী ধনী—যে কুমুদিনীর ভাল বাসা পাইয়াছে সেই ধনী।—রজনী—রজনী—রজনী—নামটা কি কর্কশ—রজনী দুই চক্ষের বিষ—ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে শরৎকুমার অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন। প্রাঙ্গনে আসিয়া একটি দ্বারপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অমনি মুখমণ্ডল মলিন হইয়া গেল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন শরৎকুমার আসিতেন, তখন এই দ্বারের অন্তরালে অর্দ্ধলুক্কায়িত হইয়া, হাসিতে হাসিতে, মাথার কাপড় টানিতে টানিতে, কুমুদিনী আসিয়া দাঁড়াইতেন। কিন্তু আজ কুমুদিনী কোথায়? গবাক্ষপ্রতি চাহিলেন। কুমুদিনী সেখানেও দাঁড়াইয়া নাই। ভগ্নপদে তাহার মাতার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কুমুদিনীর মাতা কাঁদিতে লাগিলেন। শরৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কেমন আছেন?" কুমুদিনীর মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা আমি মরি—আমার উপায় কর—তোমরা আমার ছেলে—রজনী আমায় ত্যাগ করে গিয়াছে, এখন তুমি ছেলের কাজ কর—আমায় কাশী পাঠাইয়া দাও।" শরৎকুমার গদগদ স্বরে বলিলেন, "কালই পাঠাইয়া দিব।" কুমুদিনীর মাতা বলিলেন, "কে নিয়ে যাবে? কর্ত্তা বৃদ্ধ, অপটু, আর আমায় কে নিয়ে যাবে—আর আমার কে আছে?" শরৎকুমার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "আমি লইয়া যাইব, কালই লইয়া যাইব।" কুমুদিনীর মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শরৎকুমার হরিনাথ বাবুকে সমুদায় পরিচয় দিলেন, স্থির হইল আগামী পরশ্ব কাশীযাত্রা করা হইবে। শরৎকুমার ইতিমধ্যে বিষয়ের একটা বন্দবস্ত করিয়া, কলিকাতায় তৎপরদিবসে তাঁহাদিগের সহিত একত্রিত হইয়া কাশী যাইবেন। হরিনাথ বাবু বড় সুখী হইলেন। কুমুদিনীর মাতা কাশী যাইবার উৎসাহে অনেক আরোগ্য বোধ করিলেন। শরৎকুমার সকলকে সুখী করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। কুমুদিনীকে চকিতের ন্যায় একবার দেখিতে পাইয়াছিলেন; আহার করিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিবার সময় দেখিয়াছিলেন দোতালার একটি কক্ষে, কুমুদিনী ঘর আলো করিয়া দাঁড়াইয়া, একটি পরিচারিকার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। শরৎ একবার চকিতের ন্যায় দেখিয়া চক্ষু মুদিলেন, আর সে দিকে চাহিতে পারিলেন না—লজ্জায় চাহিতে পারিলেন না। যাহাকে ভাল বাসা যায় সে যদি ভালবাসা প্রত্যর্পণ না করে তবে তাহার প্রতি প্রকাশ্যে চাহিতে লজ্জা করে। সেই

জন্য কুমুদিনীকে দ্বিতীয়বার দেখিতে লজ্জা করিল। শরৎকুমার বাটী ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু মন ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না—মন কুমুদিনীর নিকট রাখিয়া আসিলেন। যে দিবস গঙ্গাতীরে কুমুদিনীকে দেখিয়াছিলেন—স্নান করিয়া, আগুল্ফ পর্য্যন্ত কেশরাশি আলুলায়িত করিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই কুমুদিনী আজ তাঁহাকে চাহিয়া দেখিল না। শরতের মনে মনে কত দুঃখ হইল। কাহার জন্য চাহিয়া দেখিল না? রজনীর জন্য—আবার রজনী! রজনী—রজনী—রজনী—রজনী দিবারাত্র কি তাঁহাকে জ্বালাতন করিবে! দিবারাত্র কি তাঁহার হৃদয়ে কালসর্পের ন্যায় দংশন করিবে। রজনী তাঁহার পরম শত্রু—তাঁহাকে বিষয় ছাড়িয়া দিয়া পরম শত্রুর কাজ করিয়াছে। কুমুদিনী বলিয়াছিল "তুমি এখন ধনী, তোমায় যদি বিবাহ করি লোকে কি বলিবে?—বলিবে ধনলোভে কুমুদিনী বিবাহ করিয়াছে—আমি যদি কখন বিবাহ করি তবে দরিদ্রকে।" রজনী তাঁহাকে ধনী করিয়া আপনি দরিদ্র হইয়া কি বাদ সাধিয়াছে। তিনি ত মনে করিলেই আবার দরিদ্র হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি কুমুদিনীর দয়া জন্মিতে পারে। কাহাকে বিষয় ছাড়িয়া দিবেন, রজনীকে?—সে ত দেশে নাই—তবে কাহাকে—তবে আর কে এমন সম্পর্কীয় ব্যক্তি আছে?—আছে বই কি।

সেই দিবস রাত্রে জনরব হইল যে রতিকান্ত বাঁড়ুয্যের উত্তেজনায় শরৎকুমার তাহাকে তাহার প্রাপ্য অংশের পরিবর্ত্তে সমুদায় বিষয় ছাড়িয়া দিতেছেন। শুনিয়া হরিনাথ বাবু বড় দুঃখিত হইলেন। অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের নিকট সংবাদ দিলেন। বলিলেন, "আমি গিয়া একবার বুঝাইয়া আসি।" অনেক ক্ষণের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, "শরৎকুমার উন্মত্ত হইয়াছে, সমস্ত বিষয় রতিকান্তকে লিখিয়া দিয়া কলিকাতায় গিয়াছে।" কুমুদিনী ভাবিলেন, কেবল উন্মাদ নহে "প্রেমোন্মাদ।" হায়! শরৎকুমার তুমি কি দুর্ভাগ্য! তুমি কি এই কথাটির জন্য দরিদ্র হইলে? কি অদৃষ্ট।

সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদ।

কুমুদিনীর বিপদ।

পরশ্ব আসিল। হরিনাথ বাবু পূর্ব্বকথানুসারে সপরিবারে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। সঙ্গে কুমুদিনী ও ভ্রাতৃকন্যা বিনোদিনী ও দুই জন পরিচারিকা চলিল। সেই দিবস সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া এক স্থানে বাসা লইলেন। পরদিবস সন্ধ্যার গাড়িতে কাশী যাওয়া স্থির হইয়াছিল। অতি প্রত্যুষে হাবড়ায় যাইয়া হরিনাথ বাবু একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি সমুদায় ভাড়া

করিয়া আসিলেন। এই দিবসে শরৎকুমারের আসিবার কথা ছিল, কিন্তু বেলা দুইপ্রহর হইল, তথাচ তাঁহার দেখা নাই। বেলা একটার পর হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকার হইল এবং তৎপরেই মুষলধারে বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত আরম্ভ হইল। দুইটা, তিনটা, ক্রমে চারিটা বাজিল, তথাচ শরৎকুমারের দেখা নাই। অপরাহ্ণ হইল, এখনো মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু হরিনাথ বাবু আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। স্বপরিবারে একটি ঘোড়ার গাড়িতে উঠিলেন, স্ত্রীলোকেরা ভগ্নোৎসাহে উঠিলেন। শরৎকুমারের না আসাতে বড় নিরুৎসাহ হইল, গাড়ি অতি কষ্টে যাইতে লাগিল। সহর জলময়—অট্টালিকাশ্রেণী সকল জলেতে ভাসিতেছে। রাজপথে কোমর সমান জল হইয়াছে তথাপি অসংখ্য গাড়ি এবং পাল্কি যাতায়াত করিতেছে। ঘোড়াদিগের বুক পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে, শিবিকাবাহকদিগের কোমর পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাইতেছে, অসময়ে অন্ধকার হওয়াতে বিলাতি দোকানে, ও বড় বড় অট্টালিকাতে আলো জ্বালিয়াছে, সেই আলোর প্রতিবিম্ব রাস্তার জলে পড়িয়াছে। অবিরত গাড়ির যাতায়াতে রাস্তার জলে ছপ ছপ শব্দ হইতেছে। আজ সহরের নূতন প্রকার শোভা হইয়াছে। কুমুদিনী ও বিনোদিনী কখন কলিকাতা দেখেন নাই। গাড়ির কপাট ঈষৎ খুলিয়া সহরের শোভা দেখিতে দেখিতে কুমুদিনী হঠাৎ চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন "ঐ যে শরৎকুমার।" স্ত্রীলোকগণ মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, যে শরৎকুমার সেই মুষলধারে বৃষ্টিতে অতি দীন দুঃখীর ন্যায় ভিজিতেং হাবড়ার দিকে যাইতেছেন। বৃষ্টির জল তাঁহার মস্তক বহিয়া পড়িতেছে। তাঁহার অর্দ্ধেক শরীর রাস্তার জলে ডুবিয়া গিয়াছে, অতি কষ্টে গমন করিতেছেন। হরিনাথ বাবু "শরৎকুমার শরৎকুমার" বলিয়া ডাকিলেন। শরৎকুমার শুনিতে পাইলেন না—বায়ুসন্তাড়িত বৃষ্টিধারা তাঁহার মুখমণ্ডলে আঘাত করাতে মস্তক নত করিয়া যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। হরিনাথ বাবু গাড়ি থামাইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে ডাকাতে শরৎকুমার শুনিতে পাইয়া, তাঁহাদিগের নিকট হাসিতে হাসিতে আসিলেন। তাঁহার হাসি দেখিয়া, স্ত্রীলোকদিগের চক্ষে জল আসিল। হরিনাথ বাবু তাঁহার স্থান ত্যাগ করিয়া শরৎকুমারকে গাড়ির ভিতর বসিতে অনুরোধ করিলেন। শরৎকুমার কোনমতে স্বীকৃত হইলেন না—বলিলেন "আপনারা অগ্রসর হউন আমি ঠিক সময়ে আপনাদিগের সহিত মিলিব।" হরিনাথ বাবু অতি কষ্টে তাহাই স্বীকার করিলেন। শরৎকুমার পদব্রজে চলিলেন। ঝড় বৃষ্টি আর গ্রাহ্য নাই, সেই গাড়িপ্রতি দৃষ্টি করিয়া চলিলেন। দুই একবার দেখিলেন কে যেন মুখ

বাড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছে। শরৎ তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। ঠিক সময়ে হাবড়ায় পৌঁছিলেন। হরিনাথ বাবু স্ত্রীলোকদিগকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া, তাঁহার জন্য বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, শরৎকে গাড়ির ভিতর লইয়া গেলেন। গাড়ির ভিতরে গিয়া শরৎকুমারের কম্প ধরিল—শরীর অবশ হইল, হস্ত দ্বারা যে শরীর মুছেন এমন ক্ষমতা নাই। একখানি গামছা লইয়া কুমুদিনী ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া,ঈষৎ মুখাবরণ করিয়া, মস্তক নত করিয়া অগ্রসর হইলেন। শরৎকুমার তাঁহার নিকট হইতে গামছা চাহিয়া লইলেন,কিন্তু হস্ত কাঁপিতে লাগিল দেখিয়া হরিনাথ বাবু কুমুদিনীকে গা মুছাইয়া দিতে বলিলেন। কুমুদিনী আরো মাথায় কাপড় টানিলেন, বাম হস্ত দ্বারা সলজ্জে শরৎকুমারের হস্ত ধরিলেন; যেন প্রভাতপ্রফুল্ল পদ্মদল গুলির দ্বারা শরতের প্রকোষ্ঠ বেড়িল আর দক্ষিণ হস্তে গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা তাঁহার গা মুছাইতে লাগিলেন। মরি মরি, শরৎকুমার এ আবার তোমার কি সুখ! ক্রমে যখন বক্ষঃস্থল মুছাইতে হইল, যখন কুমুদিনীর মস্তক শরতের মস্তকের নিকট আনিতে হইল, তখন কুমুদিনীর ব্রীড়া বিকম্পিত ওষ্ঠে ঈষৎ হাসি আসিল, সে হাসি কেবল শরৎকুমার দেখিতে পাইলেন। দুই জনের মাথায় মাথায় এক হইল, দুই জনের নিশ্বাসে নিশ্বাসে মিশ্রিত হইল, নয়নে নয়ন পড়িল, লজ্জায় কুমুদিনী আবার ঈষৎ হাসিলেন। কুমুদিনী ঠিক বলিয়াছিলেন, যে "শরৎকুমার ছেলে মানুষ।" শরৎ সে হাসির প্রত্যুত্তরে আরো কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার কম্প দেখিয়া কুমুদিনী ব্যস্ত হইয়া দুই হস্ত দ্বারা শরতের দুই বাহু চাপিয়া ধরিলেন, যেন হৃদয়ে তুলিয়া লইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া শরৎকুমারের মুখমণ্ডল মলিন হইল, ক্রমে অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল এবং পরক্ষণেই অচেতনপ্রায় কুমুদিনীর ক্রোড়ে পতিত হইলেন। কুমুদিনী অতিযত্নে তাঁহাকে অন্য স্থানে শয়ন করাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শরতের মুখপানে চাহিয়া সে চেষ্টা দূর হইল, আপনার ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া রাখিলেন। ভাল কুমুদিনি, তোমার একি চরিত্র? তুমি রজনীকে দেশান্তরিত করিলে, শরতের মাথা ঘুরাইয়া ফেলিলে, ছিঃ একি দৌরাত্ম্য!—তুমি কি একদিনও ভাবিলে না যে মনুষ্যহৃদয় এক বস্তুতে নির্ম্মিত, বরং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির হৃদয় অধিক কোমল। তুমিও যে একদিন রজনী কি শরতের স্পর্শসুখে মরিবে,সে দিন যে তোমার অতি নিকট! ছি! আপনার হৃদয় আপনি বুঝিতে পার না।

বাঙ্গালা সাহিত্য।

বড় হাড জ্বালাতন হইযা উঠিল। বঙ্গদর্শনের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বোধ হয় কিছু বুদ্ধি লইযা ঘর করিতেন, বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা বন্ধ করিযা দিযাছিলেন। যে দিন তিনি বলিলেন যে, আর গ্রন্থসমালোচনা করিব না—সেই দিন হইতে বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে, আর সেই সকল হরিত কপিষ নীল পীত রক্ত আবরণে রঞ্জিত, বৃহৎ, ক্ষুদ্র, স্থূল, সূক্ষ্ম, লঘু, গুরু অবযবধারী পুস্তকসকলের আমদানি কমিল। ক্ষুদ্র গ্রন্থকারদিগের সঙ্গে বঙ্গদর্শনের আর বড সম্বন্ধ রহিল না। ক্রিযা বাড়ীতে লোকজনের ভোজনের পর স্থান পরিস্কার হইযা গেলে পর, গৃহের যেরূপ অবস্থা হয়, বঙ্গদর্শনপুস্তকালয়েরও সেই দশা হইল, ফলাহার সমাপ্ত হইযাছে জানিযা দুই একটি আহূত ভদ্রলোক ব্যতীত, অনাহূত, রবাহূত, ভদ্র অভদ্র প্রাঙ্গণে সম্মার্জ্জনীর ঘর্ষণ শব্দ শুনিয়া বিমুখ হইতে লাগিল—কেবল দুই একজন নাছোড় বান্দা ফকির দরওয়াজা ছাডে না। সাহিত্যসংসারের কাকের দল আলিসার উপর জুটিয়া অকালে ফলার বন্ধের পক্ষে ঘোরতর প্রটেষ্ট আরম্ভ করিল—আর যাঁহারা সাহিত্যসমাজের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র জীব তাঁহারা দংষ্ট্রা নির্গত করিয়া উৎসৃষ্ট কদলীপত্রের উপর ক্ষুদ্র রকম কুরুক্ষেত্র আরম্ভ করিলেন। শেষে শান্তি উপস্থিত হইল।

অদৃষ্টের বিপাকে পড়িযা বঙ্গদর্শনের বর্ত্তমান সম্পাদক আবার পত্রমধ্যে বাঙ্গালা গ্রন্থের সাধারণতঃ সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। অমনি বঙ্গসাহিত্য সমাজে ঘোষিত হইল—যে সে বাড়ীতে আবার ফলার। আবার দেখিতেছি, ন্যায়ালঙ্কার, তর্কালঙ্কার, বিদ্যারত্ন, বিদ্যাবাগীশ বিদ্যনিধি বিদ্যাকণ্ঠীশ, টিকির উপর চাঁপা ফুল ঝুলাইযা, নামাবলীর কোণে ভক্তিভাবে যাজ্ঞিক বিল্বপত্র দূর্ব্বাদল বাঁধিযা, সমালোচন ফলাহারে উপস্থিত। আবার দেখিতেছি সেই আহূত, অনাহূত, কাঙ্গালী ফকির, আম্রগরিমার জলে আশা কদলীপত্র খানি ধৌত করিযা, যশোরূপ লুচিমণ্ডার আশায় পাত পাতিয়া বসিযাছেন। তাই বলিতেছিলাম যে বড হাড় জ্বালাতন হইয়া উঠিল।

ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলা যাইতে পারে, যে সদ্গ্রন্থের সমালোচনার অপেক্ষা সুখ আর নাই। কিন্তু যে স্তূপাকার ছাই ভস্ম প্রতিদিনের ডাকে, আমাদিগের আপিসে আসিযা উপস্থিত হয়, তাহার সমালোচনা বড় দুঃখদায়ক—তাহার পঠন অপেক্ষা কষ্ট বুঝি আর নাই। আমাদিগকে যে জ্বালা পোহাইতে হয়, তাহার দুই একটা উদাহরণ দিলেই পাঠকের কিছু করুণা জন্মিতে পারে। কি শুভক্ষণে লর্ড লিটন ভারতেশ্বরীর

নাম ঘোষণা করিয়াছিলেন বলিতে পারি না—কিন্তু সেই ক্ষণ অবধি, কবিদিগের প্রাণ গেল। সেই অবধি "ভারতেশ্বরী" সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থে দেশ প্লাবিত হইয়া গেল। উচ্চশ্রেণীর কবিগণ মার্জ্জনা করিবেন, ক্ষুদ্রাশয় পাঠকদিগের জন্য আমরা একটি উপমা প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারি না। যে কেহ নৌকাপথে ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনিই চরস্থিত পক্ষিগণের চরিত্র অবগত আছেন। এক এক চরে বহুসহস্র পক্ষী পালে পালে বিচরণ করিতে থাকে। কোন শব্দ নাই —কোন গোল নাই। কিন্তু যদি কোন অসতর্ক নৌপথিক দৈবাৎ, লোভপরতন্ত্র হইয়া একটি বন্দুকের আওয়াজ করেন—তবে বড় বিপদ—সেই সহস্র সহস্রপক্ষী এককালীন উড্ডীন হইয়া কিচির মিচির চিচির ছিছি প্রভৃতি চীৎকার করিয়া একবারে কর্ণরন্ধ্র বিদীর্ণ করে। তখন চিচি কুচি ছিছির জালায় অস্থির হইয়া পথিক কোথায় পলাইবেন, পথ পান না। তেমনি, এই বঙ্গসাহিত্য মরুভূমিবিহারী কবিবিহঙ্গমণ্ডলীর শ্রুতিপথে, হঠাৎ লর্ড লিটন দিল্লীর কামান দাগিয়া, বড় কিচির মিচির রব তুলিয়া দিয়াছেন—আমাদের কর্ণ বধির হইয়া গেল।

এই কিচির মিচির কাকলী কললহরী মধ্য হইতে দুই একটি সুরতরঙ্গ পাঠক মহাশয়ের পদপ্রান্ত আছাড়িয়া পড়িয়াছে—পাঠক দেখুন—গায়ক শ্রীরাধাবল্লভ দে, কুমারখালি ছাত্র—

ভারতের জয়ধ্বনি,
শুভ আশীর্ব্বাদ বাণী,
ভীম বজ্রনাদে ওই উঠিল গগনে;
অমর অমরীগণ,
ত্রাসে জয়নাদ শুনে,
কাঁপিল সভয়ে তারা মনে ভয় গণে;
মর্ত্ত্যলোক কাঁপাইল,
কাঁপাইল রসাতল,
কাঁপাইল সর্ব্বস্থল সর্ব্ব রাজপুরী;—
ইংলণ্ড-ঈশ্বরী আজ ভারত-ঈশ্বরী!
গভীর গর্জ্জন করি,
অতি ভীম বেগ ধরি,
ব্রিটিসের জয়কারী কামান ছুটিল,
মহীধর হিমালয়,
মনানন্দ ঘোষণায়,
গঙ্গারূপে নয়নাশ্রু হরষে ত্যজিল;
সুখ-নীরে মগ্ন হয়ে,
সুখধ্বনি শব্দ পেয়ে,
প্রতিধ্বনি শব্দে বলে ওই বিন্ধ্যগিরি;—
"ইংলণ্ড-ঈশ্বরী আজ ভারত-ঈশ্বরী।"

অমর অমরীগণ যদি এমনই কথায় কথায় কাঁপিয়া উঠিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে কেহ বিশেষ আপত্তি করিবে না, কিন্তু মহীধর হিমালয় "মনানন্দ ঘোষণায়" এত কালের পর গঙ্গারূপে নয়নাশ্রু ত্যাগ করিবেন, ইহাতে বিশেষ আপত্তি। একান্ত পক্ষে কুমারখালী স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রের এত বিদ্যা দেখিয়া বিশেষ আপত্তি করিবেন আশঙ্কা করি।

এত গেল বীর রস। তার পর রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত চিত্তোন্মাদিনী নামে গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ আদিরসের পরীক্ষা করুন।

(সখি।) আইল শরদকাল কিবা সুখময় রে।
পৌর্ণমাসী নিশি শশী গগণে উদয় রে।
শরদেন্দু সুধাকরে,
লইয়া প্রকৃতি করে,
জীবন সঞ্চার করে,
মহীরুহকুলে রে।
আইল শরদকাল কিবা সুখময় রে।
পৌর্ণমাসী নিশি শশী গগণে উদয় রে॥
(সখি রে।) কহ্লার কুমুদ কত,
পদ্ম কোকনদ যত,
কিবা শোভে অবিরত,
জলজাত ফুলে রে॥
আইল শরদকাল কিবা সুখময় রে।
পৌর্ণমাসী নিশি শশী গগণে উদয় রে।
—ইত্যাদি।

দেখ কবির কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা।

"শরদেন্দু সুধাকরে,
লইয়া প্রকৃতি করে,
জীবন সঞ্চার করে,
মহীরুহ কুলেরে।"

শরদিন্দুকে পদচ্যুত করিয়া শরদেন্দু, পক্ষীর ন্যায় প্রকৃতির করে উঠিয়া, মহীরুহ কুলের জীবন সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শরদেন্দুর আশ্চর্য্য শক্তি বলিতে হইবে—এক বারে ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও বিজ্ঞানের মুণ্ডপাত করিয়াছেন। যাহাই হউক দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় চিত্ত-উন্মাদিনী পাঠকদিগের এমনি চিত্তের উন্মাদ জন্মিয়া দিবার সম্ভাবনা যে আমরা বিবেচনা করি, লেখক পথে ঘাটে সতর্ক হইয়া বাহির হইবেন। অনেকেই উন্মত্ত।

গীতিকাব্য ছাড়িয়া একবার নাটকে হাত দিয়া দেখা যাউক। যে নাটক খানি হাতে উঠিল তাহার নাম বীরেন্দ্র-বিনাশ। এটি বিরাট পর্ব্বান্তর্গত কীচক বধ বিষয়িনী অপূর্ব্ব কথা লইয়া রচিত হইয়াছে। নাটক কুলগুরু সেক্ষপীয়র দেশকালের প্রভেদ বড় মানেন না; হৃদয়াভ্যন্তরের চিত্রে একাগ্রচিত্ত হইয়া বাহ্যসংস্কারে অনেক সময়ে অমনোযোগী। প্রাচীন "গল" বা প্রাচীন রোমানের মুখে অনেক সময়ে আধুনিক ইংরেজের মত কথা বসাইয়াছেন। বাঙ্গালী নাটককার সকলেই মনে করেন আমরা একটি ক্ষুদ্র সেক্ষপীয়র আমরাও ঐরূপ করিলে ক্ষতি নাই। বীরেন্দ্রবিনাশের আরম্ভে বিরাটমহিষীর দুই পরিচারিকার যে কথোপকথন আছে, তাহা হইতে দুই চারি ছত্র উদ্ধৃত করিলেই আমাদের কথা প্রমাণীকৃত হইবে। কিন্তু পাঠকদিগকে সে দুঃখ দিতে পারি না, আমরা দয়ালু-চিত্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

তার পর আর একখানি নাটক হাতে তুলিলাম—নাম সুকুমারী নাটক। এক স্থানে দেখিলাম, কেশব বাবুর চরিত্র লইয়া বাদবিতণ্ডা--লেখক বোধ হয় মনে করিয়াছেন যে ইহাতে নাটক বিশিষ্ট প্রকারে নাটকত্ব প্রাপ্ত হইল। তার পর একস্থানে একটী কবিতা খুঁজিয়া পাইলাম। নায়িকা সুকুমারী আওড়াইতেছেন;—

দেখনা কেমন—শশী সুচিকন
জগত ভূষণ উঠেছে ঐ
উহার তুলনা, তুলনা তুল না
জগতে বলনা অমন কৈ।

পড়িতে পড়িতে বদন অধিকারীকে মনে পড়িল—"ছিই। ছিই! চাঁদের তুলনা।" আমাদিগের একটি বন্ধু কবিতাটি আর একটু বৃদ্ধি করিয়া দিলেন যথা—তুলনা তুল না, বল না ললনা, করোনা ছলনা, চিত্তচলনা, নলিনীললনা, ভোজন হলো না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহাকে বলে বাঙ্গালা সাহিত্য!

বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

পঞ্চম খণ্ড।

সর্পবিষ চিকিৎসা।

সমালোচনার্থ বিশ্ববিষ চিকিৎসা* নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। সর্পবিষচিকিৎসা এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়, অতএব কেবল সেই বিষ চিকিৎসা সম্বন্ধে আমরা দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

কয়েক বৎসর হইল সর্পবিষ লইয়া বহুল পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় একা ডাক্তার ফেরার সাহেব প্রায় পাঁচ শত প্রকার পরীক্ষা করেন† তদ্ভিন্ন ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার এবং মান্দ্রাজে ডাক্তার সর্ট সাহেব, অষ্ট্রেলিয়া দেশে ডাক্তার হেলফোর্ড সাহেব প্রভৃতি অনেকে অনেক রূপ পরীক্ষা করিয়াছেন। এই সকল পরীক্ষায় মাত্রাভেদে সর্পবিষ নানা জন্তুর শরীরে নানা প্রকারে প্রবিষ্ট করাইয়া বিষের ক্রিয়া দেখা হইয়াছে। কখন পিচকারি দ্বারা শিরামধ্যে বিষপ্রয়োগ করা হইয়াছে, কখন বা জন্তুকে সর্প দ্বারা দংশিত করাইয়া শরীরে বিষ প্রবিষ্ট করান হইয়াছে এবং অনেক সময়ে সঙ্গে সঙ্গে ঔষধও ব্যবহার করান হইয়াছে; কিন্তু ডাক্তার ফেরার সাহেবের পরীক্ষায় কোন ঔষধ অব্যর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। "নরবিষ" নামে এক গাছের পাতা অব্যর্থ বলিয়া মুঙ্গের অঞ্চলে কতক

* শ্রীহরিমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা ১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখানা আয়ুর্ব্বেদ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৵০ বার আনা।

† Thanatophidia of India by J. Fayrer M. D. C. S. I. F. R. S. E. 1872. price Rs. 80.

প্রসিদ্ধ, কিন্তু পরীক্ষায় তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সিংহল দ্বীপে দুই শত বৎসর অবধি একটি ঔষধ অব্যর্থ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ডাক্তার রিচার্ড ও ডাক্তার ফেরার সাহেব উভয়ে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এদেশীয় সর্পবিষে ঐ ঔষধ কোন উপকার করিতে পারে না। ঝাঁন্সির কমিসনর এডওয়ার্ডস্ সাহেব পরীক্ষার্থ পুরিয়া পারু (Pooreva Parn) নামে পশ্চিমাঞ্চলের এক বন্যগাছ ফেরার সাহেবের নিকট পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন যে, সর্পবিষে ইহার গুণ অতি আশ্চর্য্য, তিনি তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু পরীক্ষায় কোন গুণই প্রকাশ হইল না। হিগিন্স নামে জনৈক সাহেব লেখেন‡ যে, যে জাতির বিষ সেই জাতির পিত্ত তাহার অব্যর্থ ঔষধ কিন্তু পরীক্ষায় তাহাও সপ্রমাণিত হইল না। এইরূপে দেশী বিদেশী কোন ঔষধই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। শেষ এই প্রতিপন্ন হইল যে সর্পবিষের ঔষধ নাই।

কিন্তু সর্পবিষের ঔষধ নাই শুনিয়া কে নিশ্চেষ্ট বা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে? ঔষধ প্রকৃত হউক অপ্রকৃত হউক প্রচলিত থাকিবে, যে কারণে একাল-পর্য্যন্ত ঔষধ প্রচলিত আছে সেই কারণেই প্রচলিত থাকিবে। ফেরার সাহেবের পরীক্ষা সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র দেখিয়াছি যে, তিনি কেবল কুক্কুট, কুকুর, বিড়াল, ছাগ প্রভৃতির দেহে ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, মনুষ্যদেহে করেন নাই। অতএব মনুষ্যশরীরে ঐ সকল ঔষধ কিরূপ ক্রিয়া করিত তাহা ফেরার সাহেব জানিতে পারেন নাই। তিনি এই মাত্র অনুভব করিয়াছিলেন যে যদি সর্পদষ্ট ছাগাদি ঐ সকল ঔষধে রক্ষা পাইল না তবে মনুষ্যও রক্ষা পাইতে পারে না।

ফেরার সাহেব স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কুকুর প্রভৃতি জন্তুগণ

‡ Mr. S B. Higgins writing to the European Mail in 1870 says "all animal poisons have their specific antidotes in the gall of the animal or reptile in which these poisons exist. The bite of the Cobra or of any other poisonous snake or the reptile can be cured by administering a few drops of a preparation of the gall of the Cobra, which should be prepared as follows;—Pure spirit of wine of 95 per cent alcohal or the best high wines that can be procured 200 drops; of the pure gall 20 drops, in a clean two ounce phial, corked with a new cork; give the phial 150 or 200 shakes, so that the gall may be thoroughly mixed with the spirits and the preparation is ready for use. In case of bite put 5 drops (no more) of the preparation into half a tumblerful of pure water—pour the water from one tumbler into another backward and forwards several times that the preparation may be thoroughly mixed with the water and administer a large tablespoonfull of the mixture every three or five minutes until the whole has been given."

যে মাত্রা বিষে মরিয়া থাকে বিড়াল ও বেঁজি সেই মাত্রা বিষ সহ্য করিতে পারে। কুক্কুর ও বিড়াল মধ্যে যদি এরূপ প্রভেদ থাকে তবে মনুষ্যের সম্বন্ধে যে কিছুই প্রভেদ নাই ইহার নিশ্চয়তা কি? কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে সর্পবিষে লবণাক্ত এক প্রকার দ্রব্য আছে (Sulphocyanide of potassium) এই দ্রব্য মনুষ্যনিষ্ঠীবনে পাওয়া যায়। যদি এ কথা সত্য হয় তাহা হইলে সর্পবিষের ক্রম ছাগাদির শরীর অপেক্ষা আমাদের দেহে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব। কেন না পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে সবিষ সর্প দংশনে সবিষ সর্প সচরাচর মরে না। কেউটিয়ার দংশনে কেউটিয়া কখন মরে না কিন্তু কেউটিয়ার দংশনে গোখুরা কখন কখন মরে। যাহার নিজের বিষ আছে সে জন্তু অন্যের বিষ কতক সহ্য করিতে পারে। আমরা এমন বলিতেছি না যে মনুষ্যের বিষ আছে বা সেই জন্য মনুষ্য সর্পবিষ সহ্য করিতে পারে, আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে যদি মনুষ্যমুখে পূর্ব্বোক্ত লবণাক্ত দ্রব্য থাকে তাহা হইলে ছাগাদির দেহে বিষক্রিয়া যেরূপ হয় আমাদের শরীরে সেরূপ না হইতে পারে। ডাক্তার ফেরার সাহেব ছাগাদির শরীরে বিষক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া আমাদের শরীরে যে সেই ক্রিয়া অনুভব করিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত না হইলে না হইতে পারে। বিশেষতঃ, মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা অহিফেণ বা আফিং ব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহাদের শরীরে বিষক্রিয়া স্বতন্ত্র। তাঁহারা অনায়াসে কিয়দংশ বিষ সহ্য করিতে পারেন, এমন কি শুনা যায় তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জন সন্ন্যাসী কৌটার মধ্যে সর্প পালন করিয়া থাকেন, যে দিবস আফিং সংগ্রহ করিতে না পারেন সেই দিবস সর্পকে উত্তেজনা করিয়া আপন শরীরে বিষ গ্রহণ করেন বিষের দ্বারা তাঁহাদের কেবল অহিফেনের অভাব পূরণ হয় মাত্র কোন অনিষ্ট হয় না। এই সকল কারণে বলিতেছিলাম ছাগাদির শরীরে বিষ পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যদেহে তাহার ফল অনুভব করা অনুচিত।

এ স্থলে সর্প-ঔষধের সাপক্ষে এইতর্ক করা যাইতে পারে যে, যে ঔষধে ছাগ বাঁচিল না সে ঔষধে মনুষ্যও যে বাঁচিবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? দ্রব্যগুণ সকল জন্তুর প্রতি সমভাবে খাটে না, যে দ্রব্যের কোন ক্রিয়া ছাগশরীরে লক্ষিত হয় না সেই দ্রব্য হয় ত কুক্কুর শরীরে বিষতুল্য, মনুষ্যদেহে ঔষধ হইতে পারে।

আর এক কথা আছে। সর্পদষ্ট হইলে কুক্কুট যত শীঘ্র মরে কুক্কুর তত শীঘ্র মরে না, আবার কুক্কুর অপেক্ষা ঘোটক আরও বিলম্বে মরে। অর্থাৎ বৃহৎ দেহের রক্ত বিষাক্ত হইতে বিলম্ব হয়, যে স্থলে রক্ত অধিক এবং বিষ অল্প সে স্থলে ঔষধের ফল কি হয় তাহা পরীক্ষা করিতে বাঁকি আছে। ফেরার সাহেবের পরীক্ষায় এ বিষয়ে গুরুতর দোষ আছে। কুক্কুর ও

ছাগ যে মাত্রা বিষে বিনষ্ট হইয়াছে ফেবাব সাহেব অনেক সময় সেই মাত্রা বিষ ক্ষুদ্র কুক্কুটের শরীরে প্রবেশ করাইয়া ঔষধ পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে যে ঔষধের যথার্থ পরীক্ষা হইয়াছে এমত বলা যায় না। সর্পদষ্ট কুক্কুট বিনা ঔষধে সচরাচর ১৫ কি ২০ মিনিটে মরে কিন্তু দেখা গিয়াছে বিশেষ ঔষধ প্রয়োগ হইলে কুক্কুট ঐসময়ের দুই তিনগুণ বিলম্বে মরিয়াছে। এস্থলে বলিতে হইবে ঔষধের কিছু ক্রিয়া থাকিলে থাকিতে পারে।

টাঞ্জোর প্রদেশে এক প্রকার বটিকা প্রচলিত আছে। ডাক্তার রসল সাহেব আপনার গ্রন্থে তাহার প্রকরণ লিখিয়াছেন* এই বটিকা অতি প্রসিদ্ধ। কলিকাতার স্কট টমসন ঔষধ বিক্রেতাদিগের মধ্যে একজন সাহেব এই বটিকা প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষার্থ ডাক্তার ফেরার সাহেবের নিকট পাঠাইয়াছিলেন ও ফেরার সাহেব তাহা পরীক্ষা করিয়া অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু ডাক্তার রিচার্ড সাহেব ঐ ঔষধ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বন হইতে প্রকাণ্ড কালীয় (কেউটা) সর্প আনাইয়া তাহার ফণা একটি ষাঁড়ের অঙ্গে সংলগ্ন করাইয়া দেন। সর্প অতি রাগভরে ষাঁড়কে এমত দংশন করে যে শেষ বলদ্বারা সর্পকে ছাড়াইয়া লইতে হয়। কিন্তু এ প্রকার দংশনেও ষাঁড় মরে নাই, টাঞ্জোর বটিকা পুনঃ পুনঃ সেবন করাইয়া ষাঁড় রক্ষা পাইয়াছিল। আর একটী ছাগ আনাইয়া ঐরূপ পরীক্ষা করা হইয়াছিল। টাঞ্জোর বটিকাদ্বারা ছাগও রক্ষা পাইয়াছিল। পরে একটী কুক্কুটকে ঐ ঔষধ সেবন করান হয় কিন্তু কুক্কুট ৪৫ মিনিটের মধ্যে মরিয়া যায়।

এই সকল বৃত্তান্ত সর্প-ঔষধের সাপক্ষে আছে কিন্তু বাস্তবিক ইহা গ্রাহ্য কি না সে বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। যে ঔষধ খাওয়াইতে হয়, তাহা বোধ হয় সর্পাঘাতের কোন উপকার করিতে পারে না। ঔষধ পাক-

---

* The following recepi of Tanjore Pills is given in Dr. P. Russells work on Indian serpants.

Take white arsenic
,, roots of velle-navi
,, roots of Neri-vishana
,, roots of Nervelum
,, black pepper
,, quick silver
of each equal quantities
,, Juice of the wild cotton (Madur) sufficient to make into a mass and divide into five grain pills, each pill contains a little over half grain of quicksilver and arsenic these pills are given in doses of one or two; and at intervals of an hour in some cases not so frequently. A fowl's liver also to be applied directly to the bite which is to be scarified.

স্থলী হইতে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে যে বিলম্ব হয়, সর্পাঘাতে তাহার সময় থাকে না। রক্তের সহিত বিষ ছুটিতে থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ না ছুটিলে কোন ফল হইতে পারে না এ জন্য সর্পাঘাতে ঔষধ সেবন বৃথা। তবে যে এই মাদ্রাজি বটিকা দ্বারা ষাঁড় ও ছাগ রক্ষা পাইয়াছিল তাহার প্রকৃত কারণ যে দংশনের পূর্ব্বে উভয়কেই ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল, ঔষধ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার সময় পাইয়াছিল। নতুবা বৃথা হইত।

"মালবৈদ্যের মতে সর্পাঘাতের চিকিৎসা" নামে যে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক দশ বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে তাহার এক স্থানে লিখিত আছে যে সর্পৌষধ যত প্রকার প্রচলিত থাকুক মালবৈদ্যেরা তাহার কিছুই বিশ্বাস করে না। ডাক্তার ফেরার সাহেবও সেই কথা লিখিয়াছেন। "All the snakemen that I have seen admit that they have little or no belief in any medicines" সর্পব্যবসায়ীরা ঔষধ মানে না, অব্যবসায়ীরা তাহা মানেন। তাঁহারা পরস্পর সকলেই দুই একটী ঔষধ শিক্ষা করিয়া রাখিয়াছেন। পল্লীগ্রামে যাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন তিনি একটা না একটা ঔষধ বলিয়া দিবেন; কেহ বলিবেন, "গোয়ালিয়া" লতা অতি আশ্চর্য্য ঔষধ; কেহ বলিবেন শিমুখার মূল অব্যর্থ ঔষধ। এইরূপে তুলাটাপারি, আস্‌সেওড়া, হুড় হুড়ে প্রভৃতি বাঙ্গালার সমুদায় বৃক্ষ সমুদায় লতা সর্পাঘাতের ঔষধ বলিয়া বর্ণিত হইবে। আবার অনেকে বলিবেন তাঁহাদের ঔষধ বিশেষ পরীক্ষিত। তাহা সত্য হইতে পারে, সর্পাঘাত মাত্রেই মারাত্মক নহে; সকল দংশনে দন্ত বিদ্ধ হয় না, বিদ্ধ হইলেও সকল বার বিষস্খলন হইতে পায় না, হয় ত বিষকোষে পূর্ণ মাত্রা বিষ থাকে না। এ অবস্থায় মৃত্যুর আশঙ্কা নাই, ঔষধ ব্যবহার করা না করা তুল্য। এ অবস্থায় ঔষধ ব্যবহার করিলে রোগীর উপকার যত হউক না হউক, রোজার উপকার হয়। ঔষধ বা মন্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি হয়; লোকে মনে করে ঔষধে প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

মালবৈদ্যের মতে সর্প চিকিৎসার যে গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে কেবল একটী ঔষধের কথা আছে; সর্ষপ তৈলে তেতুল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হইবে। তৈল এবং তেতুল উভয়ই বিষঘ্ন সত্য, কিন্তু মাল বৈদ্যেরা কেবল বমন করাইবার নিমিত্ত এই ঔষধ ব্যবহার করে। ইহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

বিশ্ববিষ চিকিৎসা গ্রন্থে, সেবন করিবার নিমিত্ত নয় প্রকার দেশীয় ঔষধ লিখিত হইয়াছে। যথা—

১। জিয়াল গাছের ছাল বা পত্রের রস।

২। কাঁটানটের রস লবণ ও চিনির সহিত।

৩। দশটি রক্তজবার তাজা পাতা ও ধুতুরার মূল একত্র মর্দ্দন করিয়া ঘৃত বা পানের রস অথবা দুগ্ধের সহিত।

৪। সেওড়ার পাতা, ডাঁটা, মূল।

৫। আমকলের রস।

৬। সজিনার মূলের ছাল।

৭। তেলাকুচের পাতা গোলমরিচের সহিত।

৮। কুঁচের পাতা গোলমরিচের সহিত।

৯। ছোট শিমুল গাছের পাতার রস।

এই সকল ঔষধের উপর কেন নির্ভর করা যাইবে এবং ইহা কিরূপ পরীক্ষিত হইয়াছে তাহা গ্রন্থকার একেবারে লিখেন নাই। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে বিশেষ পারদর্শিগণ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে সর্পবিষের ঔষধ নাই। তাঁহাদের পরীক্ষার পর বিশ্ববিষ চিকিৎসা লিখিত হওয়ায় আমরা মনে করিয়াছিলাম গ্রন্থকার তাঁহাদের মতখণ্ডন করিয়াছেন এবং সর্পবিষের যে ঔষধ আছে ইহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন কিন্তু সে বিষয়ে আমরা নিরাশ হইলাম। গ্রন্থকার বোধ হয় পূর্ব্ব পরীক্ষার কথা অবগত নহেন। অথবা তিনি মনে করিয়া থাকিবেন যে তাঁহার লিখিত ঔষধ পূর্ব্বে পরীক্ষিত হয় নাই এই জন্য তাঁহার এ বিষয়ে গ্রন্থ লিখিবার অধিকার আছে। কিন্তু থানাটোফিডিয়া গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে "To concieve of an antidote, in the true sense of the term, to snake-poison one must imagine a substance so subtle as to follow, overtake and neutralize the venom in the blood, or that shall have the power of counteracting and neutralizing the deadly influence, it has exerted on the vital forces Such a substance has still to be found and our present experience of the action of drugs does not lead to hopeful anticipation that we shall find it." বিশ্ববিষ চিকিৎসা লেখক কি মনে করেন যে, এই সকল গুণ তাঁহার লিখিত ঔষধে পাওয়া যাইতে পারে, অথবা এ সকল গুণ সর্পৌষধে অনাবশ্যক?

ডোরবন্ধন, রক্তমোক্ষণ এবং বিষশোষণ সর্পাঘাতের প্রকৃত চিকিৎসা।

বিশ্ববিষ চিকিৎসা লেখক ক্ষতস্থানের নিমিত্ত এক প্রলেপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে এই প্রলেপ ব্যবহার করিলে বিষ ক্ষতমুখে আইসে; কিন্তু তাহা কতদূর সত্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। লেখক তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। কোন শক্তি দ্বারা প্রলেপ রক্তের স্রোত হইতে বিষকে ফিরাইয়া আনিবে তাহা প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবিক প্রলেপ দ্বারা বিষ যদি ক্ষতমুখে আসিবার সম্ভব হয় তাহা হইলে চিকিৎসা অতি সহজ হইবে সন্দেহ নাই;

ক্ষতমুখে বিষ আনীত হইলে রক্তমোক্ষণ করিলে রোগী আরোগ্যলাভ করিবে অথবা সেই সময় বিষশোষণ করিলেও হইতে পারে। কিন্তু বিষশোষণ নিতান্ত সহজ নহে; মুখ দ্বারা শোষণ করিলে অনেক সময় বিপদ সম্ভব। আবার শুনা যায় মুখে তৈল রাখিয়া বিষশোষণ করিলে বিপদের আর বড় আশঙ্কা থাকে না। বিষশোষণের নিমিত্ত একরূপ চুম্বক প্রস্তর ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাকে সচরাচর ইংরেজীতে snakestone বলে, বাঙ্গালায় বিষপ্রস্তর বলে। বাস্তবিক ইহা প্রস্তর নহে দগ্ধ অস্থি মাত্র, ইহা কিরূপে প্রস্তুত হয় তাহা হাড়ি সাহেব সবিস্তারে লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে, সিংহল দ্বীপে, মেক্সিকো রাজ্য প্রভৃতি অনেক দেশে এই প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়া থাকে; অনেক স্থানে ইহা উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। অনেকের বিশ্বাস আছে বিষপ্রস্তর বিষশোষণ করে। বাস্তবিক দেখা যায় ক্ষতস্থানে স্পর্শ করাইলেই বিষপ্রস্তর তথায় দুই তিন মিনিট পর্য্যন্ত সংলগ্ন থাকে, পরে রক্ত শোষণ করিলে রক্ত ভরে পড়িয়া যায়। ডাক্তার ফেরার সাহেব ইহার কতক সাপক্ষ, তিনি লিখিয়াছেন যে "There is a germ of possible truth in the idea, that these stones can be of use, for, if they absorb as they are said to do, no doubt some blood and poison mixed are taken by their pores." বিশ্ববিষ চিকিৎসা লেখক এই প্রস্তরসম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ করেন নাই, বোধ হয় বিষপ্রস্তরের কোন বিশেষ গুণ আছে কি না এ বিষয় সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় নাই বলিয়াই ইহার উল্লেখ না করিয়া থাকিবেন। তিনি শোষণ বাটী বা শিঙ্গা বসাইয়া রক্তমোক্ষণ করিতে বলেন তাহা মন্দ নহে।

সর্পদংশনে প্রলেপের কথা বলিতেছিলাম। প্রলেপ যে একেবারে অগ্রাহ্য এমত কথা আমরা বলি না, অনেক দ্রব্য বিষঘ্ন আছে সন্দেহ নাই, বোধ হয় অম্ল মাত্রেই বিষঘ্ন, সামান্য বিষে ব্যবহার করিবা মাত্র উপকার করিতে পারে। অনেক কবিরাজ ঔষধে সর্পবিষ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে লেবুর রস দ্বারা তাহা সংশোধন করিয়া লন। আমরুলের রস অম্লাক্ত এবং তাহা বোল্‌তাবিষে উপকার করে, অম আচারভিমরুলের বিষে বিশেষ উপকার করে। কিন্তু তাহা বলিয়া অম্লরস, সর্পবিষ একেবারে নষ্ট করিতে পারে না অথবা যে পরিমাণ নষ্ট করিতে পারে তাহাতে প্রাণরক্ষা হয় না। তৈলও বিষঘ্ন, তুলসী বিষঘ্ন, এইরূপ অনেক দ্রব্য বিষঘ্ন আছে। বিশ্ববিষ চিকিৎসা লেখক তুলসীর উল্লেখ করেন নাই কিন্তু কবিরাজেরা তুলসীর দ্বারা সর্পবিষ শোধন করেন। সর্পাঘাত প্রতিকার নামে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে লিখিত আছে যে দুই আনা পরিমিত কৃষ্ণতুলসীর শিকড় শীতল জলের সহিত বাটিয়া সর্পদষ্ট

ব্যক্তির ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। যাঁহারা সর্পবিষে তুলসীর পরীক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট শুনা যায় যে তুলসীপত্রের রস চক্ষে, নাসারন্ধ্রে এবং ওষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করাইলে মৃতবৎ ব্যক্তিরও চেতন হয় কিন্তু একথা কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না ফলতঃ তুলসী যে আমাদের বিশেষ উপকারী তাহা বহুকালাবধি লোকের বিশ্বাস আছে। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে স্বয়ং বিষ্ণুর তুলসীপত্রে বিশেষ অনুরাগ। বিষ্ণু এই সৃষ্টির রক্ষাকর্ত্তা, সকল ঔষধ বাছিয়া তুলসীকে প্রধান স্থান দিয়াছেন। তুলসী বিষঘ্ন, ও জ্বরঘ্ন ইহা অনেকেই জানেন, ইহার রসে দদ্রু প্রভৃতি অনেক প্রকার চর্ম্মরোগ ভাল হয়। আবার শুনা যায় তুলসী বাটীতে রোপণ করিলে বায়ুর দোষ নষ্ট করে। তুলসীর মালা শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ফলতঃ বোধ হয় অন্য অপেক্ষা তুলসীভক্ত বৈষ্ণবের স্বাস্থ্যরক্ষা ভাল হয়। কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের দ্বারা তুলসীর গুণাগুণ এ পর্য্যন্ত পরীক্ষিত হয় নাই, যতদিন তাহা না হয় ততদিন আমরা সাহস করিয়া তুলসীসম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি না। পূর্ব্বে তুলসী অনেক গৃহে পূজ্য ছিল এক্ষণেও তুলসীর প্রতি কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে কতক শ্রদ্ধা আছে। সর্পবিষে তুলসী উপকারী না হউক অন্য বিষয়ে বটে।

এদেশে যে বৃক্ষকে মনসা বলিয়া লোকে পূজা করে তাহা সর্পবিষ সম্বন্ধে বিশেষ উপকারী বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকার এ বিষয় অনুসন্ধান করেন নাই, কেবল মাত্র এক স্থানে লিখিয়াছেন "যখন দেখিবে কাস খিল ধরিয়া মুখ বন্ধ হইতেছে তখন মনসা সিজের অর্থাৎ মনসা পাতা গরম করিয়া তাহার রস নাসিকা ও কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে।" সর্পঘাত প্রতিকার নামক গ্রন্থে মনসা বৃক্ষ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, "পুরাণে মনসা নাম্নী নাগিনীকে আস্তিক মুনির মাতা, বাসুকী সর্পিণীর ভগিনী ও জরৎকারু মুনির পত্নী বলিয়া উল্লেখ আছে এবং সেই দেবী সর্পগণের প্রধান মান্যা এ জন্যই এতদ্দেশীয়ের নিকট মনসাবৃক্ষের এতদূর মান। কিন্তু অনেকেই ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করেন নাই। এক্ষণে পরীক্ষিত হইয়াছে যে মনসাবৃক্ষের বিলক্ষণ বিষনাশিকা শক্তি আছে। সর্পদষ্ট স্থানে উত্তমরূপে মনসাবৃক্ষের আটা লাগাইয়া দিয়া উক্ত বৃক্ষপত্রের একছটাক রস রোগীকে পান করাইলে তাহাতেই সর্পদষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিবে।"

সর্পাঘাত প্রতিকার নামক গ্রন্থলেখক ঔষধমধ্যে আম্রুলী অর্থাৎ আমরুলের রসের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। আমরাও অনেক সর্পবৈদ্যের নিকট ঐ ঔষধের বিশেষ প্রশংসা শুনিয়াছি; বিশ্ববিষ চিকিৎসালেখকও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। মালবৈদ্যের মতে চিকিৎসার লেখক বলেন যে মালবৈদ্যের মতে সর্প-

বিষের একমাত্র ঔষধ উদ্ভিদম্ল, যথা— তেঁতুল লেবু আমরুল। অতএব বোধ হয় ঔষধের মধ্যে আমরুলের রসই বাঙ্গালায় বিশেষ প্রচলিত। মন্ত্রও বাঙ্গালায় বিশেষ প্রচলিত। তাহার মূল কারণ "ধুলাপড়া"। অনেকেই দেখিয়াছেন তেজস্বী সর্প ফণা বিস্তার করিয়া হেলিয়া দুলিয়া ফুৎকার করিতেছে, এমত সময় কেহ ধুলা পড়িয়া সর্পের মস্তকে নিক্ষেপ করিলে সর্প তৎক্ষণাৎ নতশির হইয়া পড়ে, আর রাগ থাকে না, গর্জ্জন থাকে না, সর্প মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া থাকে। ইহা দেখিলে কে "ধুলা পড়ায়" বিশ্বাস না করিবে? সকলেই বিবেচনা করিবে মন্ত্রের অসীম ক্ষমতা। অদ্যাপি অন্যান্য বিষয়ে মন্ত্রের প্রতি সাধারণ লোকের যে এত বিশ্বাস তাহার মূল কারণ এই 'ধুলাপড়া।' ইহা প্রত্যক্ষ। কিন্তু সাধারণ লোকেরা যদি অনুগ্রহ করিয়া বিনামন্ত্রে সর্পমস্তকে ধুলা নিক্ষেপ করেন সর্প তৎক্ষণাৎ নতশির হইবে। আসল কথা সর্পচক্ষে কোন আবরণ নাই, সর্প চক্ষু মুদিত করিতে পারে না, ধুলা পড়িলে ক্ষণকালের নিমিত্ত অন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু কঠিন মৃত্তিকা নিঃক্ষেপ করিলে তাহা হইবে না, মৃত্তিকা বিশেষ করিয়া চূর্ণ করিতে হইবে। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন ওঝারা মন্ত্র পড়িবার সময় হস্তে মৃত্তিকা বিশেষ করিয়া চূর্ণ করিতে থাকে।

চিকিৎসা সম্বন্ধে এক কথা বলিতে আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। "অসারে জল সার" আমাদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ আছে। সর্পদষ্ট ব্যক্তি মৃতবৎ হইয়া পড়িলে, তাহার মস্তকে অনবরত জল ঢালিতে পারিলে প্রাণরক্ষা অসম্ভব নহে। মালবৈদ্যের মতে সর্পাঘাতের চিকিৎসা লেখক বলিয়াছেন "সর্পাঘাতে মৃত্যু হইলেও মালবৈদ্যেরা কিছু মাত্র হতাশ হয় না। বাহ্য পরীক্ষায় জীবনের কিছুমাত্র লক্ষণ পাওয়া যায় না, শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইয়াছে তাহারা বলে, এরূপ রোগীও তাহারা অনেক আরাম করিয়াছে। আমরা এ সম্বন্ধে যত ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না। যাহা হউক রোগীকে এরূপ অবস্থায় হঠাৎ সমাধি দেওয়া কি দাহ করা কর্ত্তব্য নহে।" লেখক যাহা বলিয়াছেন আমাদের মধ্যে সেই প্রথা বহুকালাবধি প্রচলিত ছিল। সর্পাঘাতে দাহ বহুকালাবধি নিষিদ্ধ আছে। বোধ হয় পূর্ব্বকালের লোকেরা বিবেচনা করিতেন যে, সর্পাঘাতে মরিলেও বাঁচিতে পারে, এজন্য মৃতদেহ জলে ভাসাইয়া দিবার প্রথা ছিল, বোধ হয় বিশ্বাস ছিল সর্পাঘাতে একেবারে মনুষ্য মরে না, জলে দেহ অনেকক্ষণ থাকিলে বিষ নষ্ট হইলে হইতে পারে, বেহুলার গল্প হইতে হয় ত এই প্রথাটি প্রচলিত হইয়া থাকিবে। সে যাহাই হউক জলসেবন যে সর্পাঘাতের শেষ চিকিৎসা এ বিষয়ে বহুকা-

লাবধি বাঙ্গালির বিশ্বাস আছে। ফেরার সাহেব এ বিষয়ের কোন বিশেষ পরীক্ষা করেন নাই। কিন্তু রোগীর মস্তকে জলধারা দিতে তিনি ব্যবস্থা করিয়াছেন।

গৃহে সর্প প্রবিষ্ট হইতে না পায় এ বিষয়ে বিশ্ববিষ চিকিৎসা লেখক কয়েকটি উপদেশ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে "প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে নির্ধূম অগ্নিতে কিছু হলুদ কয়েকটা লঙ্কামরিচ পোড়াইয়া, সেই ধূম গৃহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া উচিত। বাটী ঘর প্রভৃতি সাজাইতে হইলে, বকুল ফুলের মালা বা পাতার দ্বারা সাজাইলে সর্প, বৃশ্চিক, প্রভৃতি আসিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে গৃহে কিছু ধুনা ও গন্ধক জ্বালাও।" হরিদ্রা ও লঙ্কা পোড়াইলে কি ফল হয় তাহা আমরা জানি না কিন্তু ধুনার প্রতি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। কোন রাগান্ধ ব্যক্তি বিশেষ বৈরক্তি প্রকাশ করিলে আমরা বলিয়া থাকি যেন ধুনার গন্ধে মনসা নাচিয়া উঠিল। ধুনার গন্ধে সর্প বিরক্ত হয় এ কথা বহুকালাবধি প্রচলিত আছে, এই জন্য মনসার পূজায় ধুনা দেওয়া হয় না। ধুনার গন্ধ পাইলে সর্প পলায়। আসাম অঞ্চলে কোন নগরে বিলক্ষণ সর্পভীতি আছে, তথায় অতি দীনহীন লোকেরাও সর্পভয়ে মাচা বাঁধিয়া বাস করে; সকল গৃহে সর্ব্বদা সর্প দেখা যায়। কিন্তু একজন প্রাচীন মুন্সেফের গৃহে কখন কেহ সর্প দেখে নাই। তাঁহার কোন বিশেষ বন্ধুর নিকট আমরা শুনিয়াছি তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গৃহে ধুনা দিতেন এবং ধুনার সহিত দুই একটি শুষ্ক পাটপাতা পোড়াইতেন। এক দিবসের নিমিত্ত ইহার অনিয়ম ঘটে নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ধুনা দিলে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহার ক্রম থাকে, এই সময় মধ্যে কদাচ সর্প আসিবে না।

ছোট নাগপুরে আমরা যখন প্রথম যাই তৎকালে মনে করিয়াছিলাম সর্প হইতে নাগপুর নাম হইয়াছে অতএব তথায় কতই সর্প দেখিতে পাইব। কিন্তু গিয়া শুনিলাম সেখানে সর্প একেবারে নাই, তথায় কেহ কখন সবিষ সর্প দেখে নাই। আমরা বহুতর বৃদ্ধ লোকদিগের নিকট ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়াছিলাম, কেবল তাঁহাদের মধ্যে একজন মাত্র বলিয়াছিলেন যে, তিনি বাল্যকালে একটি গোখুরা সর্পের কথা শুনিয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্বয়ং তাহা দেখেন নাই। তিনি এই কথা বলেন যে, রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যু হইলে পর তক্ষক মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া এই স্থানে বাস করিলে, অন্য সর্পেরা তাহাকে দেখিয়া এস্থান হইতে পলায়ন করে, সেই অবধি আর এখানে সর্প নাই। বৃদ্ধকে এই সময় একজন জিজ্ঞাসা করিল, এক্ষণে তক্ষক নাই তবে অন্য সর্প কেন আইসে না? বৃদ্ধ অতি গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন "এক্ষণে শীতলার নিমিত্ত সর্প আইসে না।" নাগপুরে বসন্ত রোগ প্রায় বার মাস সমান। বসন্ত রোগের নিমিত্ত প্রতি দিন প্রতি

ঘরে ঘরে ধুনা পুড়িতেছে সর্প আর কাজেই আসিতে পারে না। আমরা হাসিয়া বৃদ্ধের নিকট বিদায় লইলাম।

গোময় সর্প অবরোধক বলিয়া কতক প্রবাদ আছে। দশহরা অর্থাৎ মনসা পূজার দিবসে গৃহস্থেরা গৃহ বেড়িয়া গোময় লেপন করে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যেপর্য্যন্ত গোময়ের গন্ধ থাকে সেই পর্য্যন্ত সর্প সেস্থান ত্যাগ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সকল জাতীয় সর্পে তাহাও করে না।

ইসের মূল সর্প শাসন করে বলিয়া বড় প্রবাদ ছিল কিন্তু এক্ষণে তাহার কথা আর শুনা যায় না। কেহ আর বড় পরীক্ষাও করেন না।

বেলের মূল আমরা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহার গন্ধে সর্প একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই মূল নিকটে লইয়া গেলে সর্প মস্তক তুলে না, গৃহে রাখিলে সর্প গৃহপ্রবেশ করে না কিন্তু দেখা গিয়াছে বেলের মূল শুষ্ক হইয়া গেলে আর কোন ফল দর্শে না। শিবের স্কন্ধে সর্প আর মস্তকে বিল্বপত্র দিয়া শৈবেরা উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এই সম্বন্ধটি নানা প্রকারে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

সর্প নিবারণ করিবার নিমিত্ত ইংরেজী কারবলিক আসিড Carbolic acid ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা মধ্যে মধ্যে গৃহের চতুষ্পার্শ্বে সিঞ্চন করিয়া দিলে প্রায়ই সর্পভয় থাকে না, বিষময় সর্পের পক্ষে কারবলিক এসিড মহা বিষ। উহা সর্পের মুখে স্পর্শ করাইলে অতি অল্প ক্ষণের মধ্যে সর্প মরিয়া যায়। যেখানে ইহার লেশ মাত্র গন্ধ পায় সর্প তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে পলায়।

বোম্বাই ও বাঙ্গালা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে দুটি প্রবলতর প্রতিবন্ধক বিদ্যমান। প্রথম, বাল্যবিবাহ, দ্বিতীয়, অবরোধ প্রথা। ৮।১০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বালিকাগণ পাঠশালায় শিক্ষালাভ করে; তাহাতে বোধোদয় বা চারুপাঠ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত বয়সেই প্রায় উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলিয়া শিক্ষোন্নতির আশা ভরসাও প্রায় সেই সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মূল হইয়া যায়। প্রথম প্রতিবন্ধকটি বঙ্গদেশের ন্যায় বোম্বাই প্রদেশেও বর্ত্তমান। এই উভয় প্রদেশেই বালিকাগণ নিতান্ত অল্পবয়সে সন্তানবতী হইয়া সংসারের সহিত এমনি জড়িত হইয়া পড়ে যে, তাহাদের জ্ঞানোন্নতিবিধান সুদূরপরাহত হইয়া উঠে। দ্বিতীয় প্রতি-

বন্ধকটি বোম্বাই প্রদেশে বিদ্যমান নাই। সেই জন্য বঙ্গদেশ অপেক্ষা বোম্বাই প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির পথ অপেক্ষাকৃত নিষ্কণ্টক। মিস কার্পেণ্টর বঙ্গভূমিতে বয়ঃস্থা ভদ্রমহিলাগণের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত রাখিতে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন কেন? অবরোধ প্রথাই তাহার মুখ্য কারণ। তিনি বোম্বাই প্রদেশে উক্তরূপ বিদ্যালয় সংস্থাপনে সফলপ্রযত্ন হইলেনই বা কেন? তথায় অবরোধ প্রথার অভাবই উহার প্রকৃত কারণ।

আর একপ্রকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলেও সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, অবরোধ প্রথা স্ত্রীজাতির শিক্ষোন্নতিসম্বন্ধে অতি গুরুতর প্রতিবন্ধক। আমরা সকলেই জানি যে, অপরাপর বিদ্যার্থীর সহিত বিদ্যালয়ে একত্রে শিক্ষা করিলে, পরস্পরের উন্নতি দেখিয়া এমন একটি প্রতিযোগিতার ভাব হৃদয়ে উদ্দীপিত হয় যে, তদ্দ্বারা শিক্ষাসম্বন্ধে উৎসাহ, আগ্রহ, ও অনুচিকীর্ষা শতগুণ প্রবলতর আকার ধারণ করে। এতদ্ভিন্ন জনসমাজের চতুর্দ্দিকের উন্নতির ব্যাপার সকল সন্দর্শন করিলে, চিত্ত সহজেই উন্নতির অভিমুখে প্রধাবিত হইতে থাকে। অন্তঃপুরনিরুদ্ধ রমণীকুলের পক্ষে উন্নতির এই অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান নাই বলিয়া তাঁহাদের শিক্ষাবিষয়ে আশানুরূপ উন্নতি দৃষ্ট হয় না। অথবা তাঁহাদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রতিবন্ধকের মধ্যে উহা একটি প্রধান। বোম্বাই অঞ্চলে অবরোধ প্রথা বিদ্যমান না থাকাতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় এই প্রতিবন্ধকটিও নাই। সেখানকার যে সকল ভদ্রমহিলা অন্যান্য বিদ্যার্থিনী রমণীগণের সহিত এক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন, সহজেই তাঁহাদের হৃদয়ে প্রতিযোগিতার ভাব উদ্দীপিত হইবার সম্ভাবনা, এতদ্ভিন্ন জনসমাজে বহির্গত হইবার অধিকার থাকাতে চতুষ্পার্শ্ববাহী উন্নতিস্রোতের সঙ্গে স্বভাবতঃই তাঁহাদের মন ভাসমান হইতে থাকে। এ স্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি বাস্তবিকই বোম্বাই অঞ্চলে বঙ্গদেশ অপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে প্রতিবন্ধক অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহা হইলে এতদিনে বোম্বাই কেন বঙ্গদেশকে উক্ত বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিতে পারিল না? উত্তর—এ বিষয় মীমাংসা করিবার এখনও সময় হয় নাই। প্রতিবন্ধক যখন একপ্রদেশে অপেক্ষাকৃত অল্প, তখন মানসিক শক্তিসম্বন্ধে স্বাভাবিক তারতম্য না থাকিলে নিশ্চয়ই এক প্রদেশের স্ত্রীশিক্ষা, সময়ে অপরপ্রদেশ হইতে অধিকতর উন্নতিলাভ করিবে। বোম্বাই নগরে অবস্থিতি কালে জনৈক সুশিক্ষিত মহারাষ্ট্রীয় আমাদিগকে বলিলেন, "দেখুন, এখন আমরা আপনাদের অপেক্ষা শিক্ষা ও অন্যান্যবিধ উন্নতিসম্বন্ধে নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকিতে পারি, কিন্তু নিশ্চয়ই সময়ে আপনাদিগকে আমরা হারাইয়া দিব। আমাদের স্ত্রীস্বাধীনতা তাহার

কারণ।” বাস্তবিক স্ত্রীশিক্ষার আশানুরূপ উন্নতি হইলে পুরুষদিগের শিক্ষা ও তৎসহকারে অন্যান্যবিধ সামাজিক উন্নতি সকলও সহজেই সংসিদ্ধ হইতে পারে।

বোম্বাই প্রদেশে পুরুষজাতির শিক্ষা বিলক্ষণ উন্নতিলাভ করিয়াছে। তথাচ পাশ্চাত্য জ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বঙ্গভূমি প্রথম স্থানীয়। বোম্বাই দ্বিতীয় স্থানীয়; এবং বোধ হয় পঞ্জাব তৃতীয় স্থানীয়।

ইংরেজীশিক্ষা, বঙ্গভূমিতে যেমন, বোম্বাই প্রদেশেও তেমনই বা তদনুরূপ ফল প্রসব করিয়াছে। কেবল বোম্বাই কেন, ভারতের যে খানে পাশ্চাত্য জ্ঞান প্রবিষ্ট হইয়াছে সে খানেই কতকগুলি সমপ্রকৃতিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছে। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নরপতিগণের প্রবল পরাক্রম যাহা সম্পন্ন করিতে পুনঃ পুনঃ বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিল, পাশ্চাত্য জ্ঞান তাহা অতি নিঃশব্দে ও অবলীলাক্রমে সংসাধন করিতেছে। প্রকৃতির সূক্ষ্ম শক্তি সকল যেরূপ জনসমাজের অজ্ঞাতসারে বিনা আড়ম্বরে কার্য্য করিয়া অদ্ভুত ব্যাপার সকল সম্পাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত অতি আশ্চর্য্যরূপে অথচ নিঃশব্দে সুমহৎ ক্রিয়া সকল সমুৎপাদন করিতেছে।

ইংরেজী শিক্ষার ফল ত্রিবিধ। ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, সামাজিক, ও রাজনৈতিক। আমাদের এখানে ইংরেজী শিক্ষার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ফল যেমন ব্রাহ্মসমাজ, বোম্বাই প্রদেশে ভিন্ন নামে অবিকল সেই প্রকার সমাজ সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানকার নাম “প্রার্থনা সমাজ।” ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মসমাজ শব্দ সেখানে প্রচলিত নাই। বোম্বাই নগর, পুনা, আহম্মেদাবাদ প্রভৃতি অনেক স্থানে প্রার্থনাসমাজ সকল সংস্থাপিত হইয়াছে। নব্যসম্প্রদায়ের অনেকে এই সকল সমাজে গিয়া যোগ দিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় প্রার্থনা-সমাজের কার্য্য দ্বিবিধ; একেশ্বরের উপাসনা ও সমাজসংস্কার।

এতদ্ভিন্ন বোম্বাই প্রদেশে আর এক প্রকার সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহার নাম “আর্য্যসমাজ।” বোম্বাই নগরে, ও পুনা প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের আর্য্যসমাজে অনেক লোক জুটিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী এই নূতন বিধ সমাজের মূল। বোম্বাই প্রদেশ পরিভ্রমণ কালে দেখিলাম, দয়ানন্দ তথায় মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। অনেক উৎসাহী ভদ্রলোক তাঁহার দলভুক্ত হইয়াছেন। যেখানে সেখানে দয়ানন্দের কথা হইতেছে। দয়ানন্দের বক্তৃতাশক্তি, দয়ানন্দের সামাজিক মত, দয়ানন্দের নূতন প্রকার বেদের ব্যাখ্যা এই সকল লইয়া সর্ব্বত্র আলোচনা চলিতেছে।

দয়ানন্দ বোম্বাই প্রদেশেরই লোক। তিনি একজন গুজরাটি। তিনি বারানসী ও মথুরায় তাঁহার জীবনের কিছু কাল

যাপন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার জীবনীসম্বন্ধে প্রায় আর কিছুই অবগত হওয়া যায় নাই। দয়ানন্দ সবল ও দীর্ঘকায় পুরুষ। তাঁহার সহিত আলাপ করিলে ও তাঁহার বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত হইলে তাঁহাকে যথার্থই একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। তাঁহার বাগ্মিতা অসাধারণ, তাঁহার তর্কশক্তি অসাধারণ, এবং স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উৎসাহ ও চেষ্টাও অসাধারণ।

পূর্ব্বেই বলা হইযাছে যে, আমরা বোম্বাই প্রদেশে দেখিলাম, তথায় দয়ানন্দ মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। বাস্তবিক তিনি যেখানে গমন করেন, সেইখানেই তাঁহাকে লইয়া যার পর নাই আন্দোলন উপস্থিত হয়। নব্য কি প্রাচীন সকলেই দয়ানন্দের বিষয় লইয়া কথাবার্ত্তা করিতে থাকে।

এরূপ হইবার বিশেষ কারণ আছে। একজন হিন্দু পণ্ডিত প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিতেছেন, এক জন হিন্দু সন্ন্যাসী পৌরাণিক উপাসনার অসারত্ব ঘোষণা করিতেছেন; একজন সুপ্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ ব্যক্তি বেদকে সনাতন শাস্ত্র বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক তাহা হইতে উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চতম মত সকল প্রতিপাদন করিতেছেন; ইহাতে যদি হিন্দু সমাজের চিত্ত আকৃষ্ট না হইবে ত আর কিসে হইবে? দয়ানন্দ ইংরেজীর বিন্দু বিসর্গ জানেন না। উহা তাঁহার পক্ষে এক প্রকার ভালই হইয়াছে। ইংরেজী জানিলে লোকে বলিত যে, ইনি যদিও বেদজ্ঞ সন্ন্যাসী বটেন, তথাচ ইংরেজী পড়িয়া ইঁহার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে; ইনি ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছেন।

একজন ইংরেজীশিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের লোক ইংরেজীপ্রণালীতে বক্তৃতাদি করিলে নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হয় সত্য, কিন্তু সে আন্দোলন প্রাচীন সম্প্রদায়ের অন্তর স্পর্শ করে না,—দয়ানন্দ যাহা কিছু করিতেছেন সকলই দেশীয় ভাবের অনুযায়ী। তিনি নিজে ইংরেজী অনভিজ্ঞ বেদজ্ঞ পণ্ডিত; তিনি যে সকল বক্তৃতা করেন তাহাতে হিন্দুদিগের চিরপূজ্য বেদাদি শাস্ত্রেরই ব্যাখ্যা থাকে; কোন মত সমর্থন করিতে হইলে তিনি কখনই শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তি অবলম্বন করেন না;—সকল সময়েই তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সুতরাং প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইবারই কথা।

জাতীয় আকারে কোন আন্দোলন উপস্থিত করিলে তাহা যেমন সহজে দেশের লোকের খবরে আইসে;—সহজে সাধারণ লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে, বিজাতীয় আকার করিলে কোন ক্রমেই সে প্রকার হইবার সম্ভাবনা নাই। শাক্যসিংহ, ঈশা, মহম্মদ, লুথর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও সমাজসংস্কারকগণ যদিও নূতন ভাব ও মত সকল প্রচার করিয়াছিলেন, তথাচ

যতদূর সম্ভব তাঁহারা স্বজাতীয় ভাব ও রুচির অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং সে প্রকার না করিলে তাঁহাদের সফলতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই দুরতিক্রমণীয় ব্যাঘাত উপস্থিত হইত। সেন্টপল প্রাচীন আথেন্স নগরে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তথাকার একটি দেবমন্দিরের উপর লিখিত রহিয়াছে "এই মন্দির অজ্ঞাত দেবতাকে উৎসর্গ করা হইল।" ("Dedicated to the unknown god") উহা হইতে সেন্টপল একটি সুবিধা পাইলেন, তিনি নগরবাসীদিগের নিকট এই বলিয়া প্রচার আরম্ভ করিলেন যে, আপনাদের মন্দিরের উপর যে অজ্ঞাত দেবতার কথা লিখিত রহিয়াছে, আমি আপনাদিগকে তাঁহার বিষয় জ্ঞাত করিতে আসিয়াছি। একথা শুনিয়া অতি সহজেই আথেন্সবাসিগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। আবার অপর দিকে আমাদের দেশের খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিদিগের বিষয় দেখুন। খ্রীষ্টধর্ম্মকে যে এদেশের লোক সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিতেছে তাহার প্রধান কারণ কি ইহাই নহে যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম আমাদের দেশে অতি ভয়ানক বিজাতীয় ভাবে প্রচারিত হইয়াছে? কোন নূতন মত দেশীয় আকারে দেশের লোকের নিকট উপস্থিত করিলে তাহা গৃহীত হইবার সম্ভাবনা; এ বিষয়ে যতই অধিক চিন্তা করা যায়, ততই এ কথার যাথার্থ্য অধিকতর রূপে অনুভব করা যায়। রাজা রামমোহন রায় যখন সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের প্রমাণসম্বলিত একেশ্বরবাদ প্রচার করিলেন, হিন্দুসমাজে হুলস্থুল পড়িয়া গেল; কেন না তিনি জাতীয় আকারে উক্ত আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। বহুকাল হইতে বিধবাবিবাহের কথা লইয়া আলোচনা হইতেছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, ইংরেজী সংবাদপত্রাদিতে, প্রকাশ্য বক্তৃতায় এবিষয়ে অনেক কথা চলিতেছিল। কিন্তু উহা ইংরেজী শিক্ষিত নব্যদলের মধ্যেই বদ্ধ ছিল। যখনই বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রের দোহাই দিয়া উক্ত বিষয়ে বিচার উপস্থিত করিলেন, তখনই উক্ত কথা দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকের চিত্তকে আন্দোলিত করিল; নিতান্ত পল্লীগ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে পর্য্যন্ত উক্ত সংবাদ পৌছিল। পল্লীগ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে পর্য্যন্ত যে আন্দোলন পৌছে না তাহাকে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আন্দোলন বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। মনে করুন যদি বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েক খানি ইংরেজী পুস্তক হইতে কয়েকটি সদ্যুক্তি সংগ্রহ করিয়া বিধবার পুনঃপরিণয়সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে কি যে প্রকার আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার শতাংশের একাংশও সংঘটিত হইত? ইহা একপ্রকার নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, উক্তরূপ পুস্তক প্রাচীন হিন্দুসমাজের খবরেও আসিত না। এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রণালীতে

বিধবাবিবাহের বিচার উপস্থিত করিয়া ছিলেন, তাহাতে লোকব্যাপী অন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু উদ্দেশ্য-সিদ্ধিবিষয়ে তিনি কৃতকার্য্য হইলেন কই? কিয়ৎপরিমাণে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এ কথাটির উত্তর দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে, এ কথা কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না। তিনি যে মহৎ ব্যাপারের সূত্রসঞ্চার করিয়াছেন তাহা এক দিন কি দশদিন কি দশ বৎসর বা বিংশতি বৎসরের কার্য্য নহে। গুরুতর সমাজসংস্কারের কার্য্য সকল দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বীজ বপন করিয়াছেন উহা অঙ্কুরিত ও ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হইবে, এবং সময়ে সমগ্র ভারতভূমিকে উহার অমৃত ফল প্রদান করিবে তাহাতে আর সংশয় নাই। যাঁহারা মনে করেন যে, একখানি পুস্তক লিখিয়া বা একটি বক্তৃতা করিয়া সুখে নিদ্রা যাইব; নিদ্রাহইতে উঠিয়া দেখিব যে,ভারতবর্ষ সকল সামাজিক অমঙ্গলের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছে, তাঁহাদের কথায় কোন ক্রমেই সায় দিতে পারি না।

আর একটি কথা এই এতদিনে বাস্তবিক যতদূর কার্য্য হইতে পারিত, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় বন্ধুহীন ও সহায়হীন হইয়া একাকী সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিবেন, ইহা কি সম্ভব? যে সকল বুদ্ধিমান্ বাবুরা বড় বড় বক্তৃতা করিতে অথবা অপরের কার্য্যের সমালোচনা করিতে বড় ভাল বাসেন, তাঁহারা কেন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাহায্য করুন না? প্রকৃত কথা এই, আমাদের দেশের অনেকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তির এই এক রোগ হইয়াছে যে, তাঁহারা নিজে কিছু করিবেন না কিন্তু অন্যে কোন মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাহার কঠিন সমালোচনা করিতে বিলক্ষণ অগ্রসর।

আমরা প্রকৃত বিষয় ছাড়িয়া কিছু অধিক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। দয়ানন্দ একদা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার কার্য্য এক্ষণে দ্বিবিধ। প্রথম স্থানে স্থানে আর্য্যসমাজ সংস্থাপিত করা, দ্বিতীয় বেদের একটি নূতন ভাষ্য লেখা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বোম্বাই, ও পুনানগরে আর্য্যসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের আর্য্যসমাজ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে অনেকগুলি ভদ্রলোক একত্র হইয়া ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে বক্তৃতা ও তর্কবিতর্ক করিয়া থাকেন। দেখিলাম অনেক লোক দয়ানন্দের শিষ্য হইয়াছেন। তন্মধ্যে সুশিক্ষিত লোক হইতে, অশিক্ষিত সামান্য লোক পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইল। একদিবস দয়ানন্দের পুনা হইতে বোম্বাই নগরে আসিবার কথা ছিল। দেখিলাম বোম্বাইয়ের বাজারের একজন সামান্য দোকানদার দোকানপাট বন্ধ করিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গমন করিল।

সে ব্যক্তি দয়ানন্দের শিষ্য। শুনিলাম বেলওয়ে ষ্টেসনে প্রায় পঞ্চাশত জন লোক গিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিল। ইহা ত সামান্য কথা। দয়ানন্দের অভ্যর্থনা লইয়া পুনায় অতি অদ্ভুত কাণ্ড হইয়াছিল। দয়ানন্দের পুনার অনুচরগণ তাঁহাকে বেলওয়ে ষ্টেসন হইতে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক লইয়া যাইবার জন্য একটা হাতীর উপর হাওদা বসাইয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক আগমন করিলেন। প্রাচীন সম্প্রদায়ের যে সকল লোক দয়ানন্দের বিরোধী, তাঁহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ ও অপমান করিবার জন্য একটা গর্দ্দভকে সজ্জিত করিয়া দল বল লইয়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলেন। দয়ানন্দ পুনায় উত্তীর্ণ হইয়া দেখেন যে তাঁহার জন্য বহুসংখ্যক লোক প্রতীক্ষা করিতেছে; এবং তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য দুটি বাহন আনা হইয়াছে, একটি হস্তী ও একটি গর্দ্দভ। যাঁহারা হস্তী আনিয়াছিলেন তাঁহারা দয়ানন্দকে তাহাতে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন "দেখুন, আমি দরিদ্র সন্ন্যাসী। হস্তীতে আরোহণ করা আমার উচিত নহে। আমি পদব্রজেই গমন করিব। এত লোক যখন রাজপথ দিয়া পদব্রজে যাইতেছেন তখন আমি কি তাঁহাদের অপেক্ষা বড় হইয়াছি যে, আমি হাতীতে চড়িয়া যাইব। বিশেষতঃ উচ্চস্থানে বসিলেই যদি মান্য হওয়া হইত, তাহা হইলে ঊর্দ্ধে বৃক্ষের উপর যে সকল কাক বসিয়া আছে উহারা ত আমাদের সকলের অপেক্ষা মান্য।" দয়ানন্দ হস্তীতে উঠিলেন না। তিনি সামান্য ভাবে পদব্রজে চলিলেন। এই উপলক্ষে দয়ানন্দের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয়দলে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়াছিল। বিরুদ্ধ দলের কয়েক ব্যক্তি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

দয়ানন্দের মতসম্বন্ধে কয়েকটি কথা অতি সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। তিনি পৌত্তলিকতার বিরোধী, একেশ্বরবাদী। বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া মনে করেন, সুতরাং জন্মান্তরের মত বিশ্বাস করেন। তাঁহার সামাজিক মত সকল অতি বিশুদ্ধ ও উন্নত। তিনি বালক ও বালিকা উভয় সম্বন্ধেই বাল্যবিবাহের পরম শত্রু। স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী। তাঁহার মতে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের শিক্ষার অধিকার সমান। উভয়েরই সমান পরিমাণ শিক্ষা হওয়া উচিত। জাতিভেদের প্রতি তিনি সর্ব্বদা খড়্গহস্ত। পাতঞ্জল দর্শনসম্মত প্রাণায়াম যোগ তাঁহার উপাসনা। পূর্ব্বে দয়ানন্দের, বেদের নূতন প্রকার ব্যাখ্যার কথা বলা হইয়াছে। তিনি সায়নাচার্য্য প্রভৃতি কোন ভাষ্যকারের কথাই মানেন না। তিনি নূতন ভাষ্য প্রকাশ করিতেছেন। এ ভাষ্য যে সদ্বিদ্বান্ লোকে গ্রহণ করিবেন, এমন বোধ হয় না। তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা কোনক্রমেই বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য

বলিয়া বোধ হয় না। তিনি ব্যাকরণের সূত্র সকলের সাহায্য লইয়া বেদের ভৌতিক উপাসনাপ্রতিপাদক শ্লোক সকল নিরাকার ঈশ্বরপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহার মতে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি বেদোক্ত শব্দ সকল পরব্রহ্মের এক একটি নাম মাত্র। বেদের একস্থানে ধান্যের স্তব আছে, হে ধান্য! তুমি আমার গৃহে আইস, ইত্যাদি। এস্থলে দয়ানন্দ ধা ধাতু হইতে যিনি ধারণ করেন এই অর্থ করিয়া ধান্যের স্তবকে পরমেশ্বরের স্তব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এপ্রকার ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপার্য্য প্রকাশ পায় না। একজন শাক্ত সমুদয় শ্রীমদ্ভাগবত কালীপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া ছিলেন। দয়ানন্দ বেদব্যাখ্যা সম্বন্ধে যাহা করিতেছেন ইহা কিছু নূতন ব্যাপার নহে। যে শাস্ত্রকে লোকে আপ্ত-বাক্য বলিয়া বহুকালহইতে ভক্তি করিয়া আইসেন, উন্নত বিজ্ঞানের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা স্বভাবতঃই উক্ত উভয়ের সমন্বয় বিধানের চেষ্টা করিয়া থাকেন। যে অবস্থায় উন্নত বিজ্ঞান ও প্রাচীন শাস্ত্র এ উভয়ের কাহাকেও তাঁহারা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না, সেই সময়েই এই প্রকার সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা হইয়া থাকে। খ্রীষ্টধর্ম্মের দৃষ্টান্ত দেখুন। খ্রীষ্টিয়ান্-ইউরোপে অতি আশ্চর্য্যরূপ বিজ্ঞানের উন্নতি হইল। কিন্তু দেখা গেল যে অনেক স্থলেই বিজ্ঞানের কথা ও প্রাচীন বাইবেলের কথা পরস্পর বিরোধী। ভূতত্ত্ববিদ্যার মতের সহিত বাইবেলের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মিল নাই। সুতরাং খ্রীষ্টীয় পুরোহিতগণ এতদুভয়ের সমন্বয় রক্ষা জন্য বাইবেল গ্রন্থের নূতন প্রকার অর্থ করিতে লাগিলেন। বাইবেল শাস্ত্রের সাতদিনের সৃষ্টির সহিত ভূতত্ত্ববিদ্যার যুগযুগান্তর ব্যাপী সৃষ্টিক্রিয়ার সামঞ্জস্য করিবার জন্য তাঁহারা একদিনের অর্থ এক যুগ করিলেন। এইরূপে সাত দিনে সৃষ্টির অর্থ সাতযুগের সৃষ্টি হইল। ব্যবস্থাশাস্ত্রের অর্থের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রের কত প্রকারই টীকা হইয়াছে। নবদ্বীপের রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ইচ্ছা করিলেন, আর এক নূতন মত চালাইয়া গেলেন।

বঙ্গদেশে যে সকল সামাজিক বিষয় লইয়া আলোচনা ও আন্দোলন হইতেছে, দুইটি বিষয় ভিন্ন বোম্বাই প্রদেশেও অবিকল তাহাই হইতেছে। বিষ্ণুরাম শাস্ত্রী নামক জনৈক সুপণ্ডিত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বোম্বাই প্রদেশের বিদ্যাসাগর। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া তিনি প্রথমে তথায় বিধবা-বিবাহ প্রচার আরম্ভ করেন। উহার জন্য তিনি বহুলপরিমাণে স্বার্থত্যাগ, ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন; এবং অটল অধ্যবসায় সহকারে বোম্বাই প্রদেশের নানা স্থানে বিধবাবিবাহ প্রচারের যত্ন করিয়াছিলেন। কতকগুলি বিধবার

বিবাহ দিতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। প্রায় একবৎসর হইল তিনি লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। এখানকার ন্যায় বোম্বাই প্রদেশে যাঁহারা বিধবাবিবাহ করিয়াছেন সকলকেই সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছে।

একটি বিষয়ের জন্য পার্সিদিগের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহারা তাঁহাদের সমাজহইতে বাল্যবিবাহ প্রথা একবারে রহিত করিয়াছেন। হিন্দুদিগের পক্ষে এ প্রকার করিতে পারা সম্ভবপর নহে; কেন না তাঁহাদের সমাজ ও ধর্ম্ম পরস্পর অখণ্ডনীয় বন্ধনে বদ্ধ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে,মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে এখানকার ন্যায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত। কিন্তু একটি বিষয়ে প্রভেদ আছে। যতদিন কন্যা যৌবন দশায় পদবিক্ষেপ না করে—স্বামিসহবাসের উপযুক্ত না হয় তত দিন কখনই তাহাকে স্বামীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে দেওয়া হয় না। কেবল বোম্বাই বলিয়া কেন? কি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল কি পঞ্জাব ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই উক্তরূপ প্রথা প্রচলিত। কেবল আমাদের সুচতুর বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালি ভ্রাতারাই উক্ত শুভকর প্রথার উপকারিতা বুঝিতে পারেন না। প্রসিদ্ধনামা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে উক্ত প্রথার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বঙ্গভূমিতেও পূর্ব্বে উহা প্রচলিত ছিল; দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রমে ক্রমে তাহার লোপ হইয়াছে। বালিকা নব বধূকে স্বামীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করাইলে তাহার এই ফল হয়, যে বালিকার শরীরে অস্বাভাবিক ও অপরিপক্ক ভাবে যৌবনচিহ্ন সকল শীঘ্রই দৃষ্ট হয়, ও নিতান্ত অল্পবয়সে সন্তানবতী হইয়া চিরজীবনের জন্য স্বাস্থ্যসুখে জলাঞ্জলি দিতে হয়।

বঙ্গদেশে জাতিবন্ধন অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া গিয়াছে। অনেক সময় অনেক দেশাচারবিগর্হিত কার্য্য চলিয়া যায়, তাহাতে সমাজচ্যুত হইতে হয় না। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে হিন্দুসমাজের শাসন আমাদের এখান অপেক্ষা অনেক গুণে প্রবল রহিয়াছে। জাতিবন্ধন অদ্যাবধি এখানকার ন্যায় এত শিথিল হয় নাই। সেইজন্য তথাকার ইংরেজী-শিক্ষিত নব্যদলকে আমাদের অপেক্ষা অনেকগুণে সমাজকে অধিক ভয় করিয়া চলিতে হয়। গুরুতর বিষয় সকলের কথা ছাড়িয়া দিন। একটা সামান্য বিষয় দেখুন। সকলকে মস্তক মুণ্ডন করিতে ও শিক্ষা রাখিতে হইবেই হইবে। কাহার সাধ্য সমাজের এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করে।

বোম্বাইবাসী অনেক লোক বিলাত গিয়াছিলেন ও এখনও যাইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পার্সিই অধিকাংশ; হিন্দু অতি অল্প। পার্সিদের সমুদ্রযাত্রা নিষেধ নাই সুতরাং তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই বিলাত যাইতে পারেন; কিন্তু হিন্দুদিগের পক্ষে উহা সহজ কার্য্য নহে।

বিলাতগমনের অবশ্যম্ভাবী ফল জাতি চ্যুতি। কোন কোন হিন্দুসন্তান ইউরোপ হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া সুপ্রসিদ্ধ জাতিপ্রদায়িনী বটিকা গোময়পিণ্ড সেবন করাতে সমাজ গৃহীত হইয়াছেন। কিন্তু সকল লোকে ঐকামতে তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করিতেছেন না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বোম্বাই ও বঙ্গদেশের সামাজিক আন্দোলনের বিষয় ইচুটি ভিন্ন অন্য সকল গুলিই এক প্রকার। পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, দুইটির মধ্যে একটি অবরোধ প্রথা। আর একটি বল্লালপ্রচারিত কৌলীন্যজনিত বহুবিব হ। ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবাহ ব্যবসায় বঙ্গভূমি ভিন্ন ভারতের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

আমাদের কলিকাতায় তিনটি রাজনৈতিক সভা। তিনটি মিলিয়া একটি করিবার উপায় নাই,—মিলিবে না, বিরোধ উপস্থিত হইবে। একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন যে, "আমাদের রাজনীতি কেবল ক্রন্দন।" হায়! আমরা একত্র মিলিয়া কাঁদিব, ইহাতেও ব্যাঘাত। বোম্বাই প্রদেশে এ প্রকার রাজনৈতিক অসম্মিলন নাই। পুনা-সর্ব্বজনিক সভায় সকল শ্রেণীর লোক মিলিয়া অতি সুন্দররূপে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারা দেশের প্রভূত মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। সর্ব্বজনিক সভাসম্বন্ধে একটি আহ্লাদের কথা এই যে, কয়েকজন সুশিক্ষিত যুবা পুরুষ সভার মঙ্গলের জন্য সম্পূর্ণরূপে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। সভার উন্নতি সাধন ব্যতীত তাঁহাদের জীবনের অন্য কার্য্য নাই, অন্য উদ্দেশ্য নাই। তাঁহারা সকলেই একপরিবারের লোক, সকলেই ভ্রাতা। তাঁহাদিগকে জোসি পরিবার বলে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসমাজে এ প্রকার সাধু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন রাজনৈতিক সভা অদ্যাবধি সে প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক কোন মহৎ কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ না করিলে কখনই তদ্বিষয়ে পূর্ণ সফলতা লাভের আশা করা যায় না। স্বার্থ ও দেশের মঙ্গল দুই লইয়া কোন ক্রমেই প্রকৃত কাজ হয় না। হয় আল্লা বল, নয় রাম বল, দুই বলিলে নৌকা ডুবিবে।

পুনা রাজনৈতিক আন্দোলনের স্থান। বোম্বাই নগরে রাজনৈতিক ভাব অপেক্ষাকৃত অল্প। কিন্তু বোম্বাই আর এক বিষয়ে মহদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছে। আমি বোম্বাইয়ের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির কথা বলিতেছি। বাঙ্গালি যেমন সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে বোম্বাইবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বোম্বাইবাসী সেই প্রকার শিল্প বাণিজ্যে বাঙ্গালি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এক পুরাতন গল্প মনে পড়িল। একটি ব্রাহ্মণপালিত হৃষ্টপুষ্ট গোবৎসের সহিত এক গোপপালিত শীর্ণ, দুর্ব্বলকায় গোবৎসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণপালিত গোবৎস

গোপপালিত গোবৎসকে বলিল, "আয় না ভাই আমরা দৌড়াদৌড়ি করি।" গোপপালিত গোবৎস বলিল, "আয় না ভাই আমরা বসিয়া বসিয়া লেজ নাড়ি।" সেইরূপ মনে করুন যেন বোম্বাইবাসী বলিতেছেন, আয় না ভাই আমরা শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন করি, বঙ্গবাসী উত্তর করিতেছেন আয় না ভাই আমরা লম্বা লম্বা বক্তৃতা করি। (বচনে পুড়িয়ে মারি।)

বোম্বাইয়ে অন্যূন ৩২টি দেশীয়দিগের সূতা ও বস্ত্রের কল। পাঠকবর্গ জানেন যে, এই সকল কলের জন্য মাঞ্চেষ্টরের ঈর্ষ্যানল ধুধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মাঞ্চেষ্টর বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে এই কলগুলির অনিষ্টসাধন করিতে পারেন। একবার বলিলেন যে, বোম্বাইয়ের কলে বালকগণকে সমস্তদিন পরিশ্রম করিতে দেওয়া হয় ইহা বড় অন্যায়। ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে পারে। অতএব তাহাদের পরিশ্রমের সময় হ্রাস করিয়া দেওয়া হউক। আবার ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট গিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহাদের জন্য ভারতবর্ষের বস্ত্রের শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হউক। আমাদের বোম্বাই অবস্থিতি কালে মিস্ কার্পেণ্টর তথায় আসিয়া প্রথমোক্ত প্রস্তাব লইয়া অনেক গোলযোগ করিয়াছিলেন। বোম্বাইবাসিগণ তাঁহাকে সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, মাঞ্চেষ্টরের পরামর্শমতে কার্য্য করিলে কারখানার শ্রমজীবিগণের প্রতিই অন্যায় করা হইবে। তাহারা মাসিক বেতন লইয়া কার্য্য করে না, তাহারা দৈনিক বেতন পাইয়া থাকে, সুতরাং কারখানার অধিকারিগণ যদি তাহাদের পরিশ্রমের সময় কমাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাহাদের বেতনও কমাইয়া দিবেন; যেমন কাজ, তেমনি বেতন ইহাই সার্ব্বজনিক নিয়ম। কিন্তু শ্রমজীবিগণ নিজেই সে প্রকার বন্দোবস্তে সম্মত হইবে না। অধিক পরিশ্রম করিয়া অধিক পয়সা লইবে ইহাই তাহাদের ইচ্ছা। বিশেষতঃ আর একটি কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সকল কথা পরিষ্কার হইয়া যায়। কারখানায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শ্রমজীবীদিগের যে প্রকার অবস্থা ছিল, কারখানার কাজ পাইয়া অবধি কি শারীরিক কি সাংসারিক সকল বিষয়েই তাহাদের উন্নতি হইয়াছে। আমরা একদিন বোম্বাইয়ের একটি কল দেখিতে গেলাম। উহার নাম গোকুল দাসের কল। একটি প্রকাণ্ড বাষ্পীয় যন্ত্র চলিতেছে, কোন স্থানে তুলা পিজা হইতেছে, কোন স্থানে তুলা পাকাইয়া লম্বা লম্বা করা হইতেছে, কোন স্থানে তুলা হইতে সূতা হইতেছে, কোন স্থানে বস্ত্রের টানাপড়েন হইতেছে, কোন স্থানে কাপড়ের পাড় হইতেছে,। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। এই সমস্ত কার্য্য সেই একটি মাত্র বাষ্পযন্ত্রের সাহায্যে চলি-

তেছে। কোন স্থানে কেবল দুই তিন শত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ কার্য্য করিতেছে, কোন স্থানে কেবল দুই তিন শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক কার্য্য করিতেছে, এবং একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থানে প্রায় পাঁচ ছয় শত স্ত্রীলোক কাজ করিতেছে। কল হওয়াতে এই সকল দুঃখী লোকের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে বলিয়া শেষ করা যায় না। কলে ধনী দরিদ্র উভয়েরই সমান উপকার। গোকুল দাসের কারখানায় একটি বিষয় দেখিয়া যার পর নাই সুখী হইলাম, উহাতে একজনও ইউরোপীয় নাই সমস্ত কার্য্য দেশীয়দিগের দ্বারা চলিতেছে।

কোন ইংরেজীগ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, সমুদ্রকূলবর্ত্তী জাতিদিগের স্বভাবতঃই ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে প্রবৃত্তি ধাবিত হয়। বোম্বাইয়ে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির নিশ্চয়ই উহা একটি কারণ। কিন্তু আর একটি কারণ আছে; তথায় ভূমির চির স্থায়ী বন্দোবস্তের অভাব। বাঙ্গালার জমিদারগণ চিরস্থায়ী আয় থাকাতে কোন প্রকার শিল্পবাণিজ্যের দিকে মন দিতে তাদৃশ ইচ্ছা করেন না। মন দিলে যে তাঁহাদের এক গুণ সম্পত্তি দশ গুণ হয়, ইহা তাঁহারা বুঝেন না। বোম্বাই বাসিগণ সে প্রকার নিশ্চিন্তচিত্তে সময়ক্ষেপ করিতে পারেন না। এখানে যেমন কোন ব্যক্তির কিছু অর্থ হইলে তিনি জমিদারি ক্রয় করিবার জন্য ব্যস্ত হন, বোম্বাইয়ে সেইরূপ লোকের অর্থ হইলে বাণিজ্যে খাটাইতে ইচ্ছা করে। আমাদের ধনীদিগকে কে বুঝাইয়া দিবে, যে শিল্পবাণিজ্যে নিযুক্ত হইলে তাঁহারা তাঁহাদের নিজের উপকার, মধ্যবিত্ত লোকের উপকার, ও নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্রদিগের মহোপকার সাধন করিতে পারেন। অর্থের সদ্ব্যবহার না করা নিশ্চয়ই মহা পাপ। আমাদের একজন বাঙ্গালি রাজা বানরের বিবাহ দিতে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি উক্ত বিবাহের সময় তিনি তাঁহার এক সুরসিক সভাসদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কেমন হে, এমন বিবাহ পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছিলে?" সভাসদ উত্তর করিলেন, "মহারাজ! দেখিব না কেন, আপনার বিবাহের সময়ই দেখা হইয়াছিল।"

সম্প্রতি কলিকাতার নিকট একটি সূতার কল হইয়াছে। বোম্বাইয়ের পার্সিরা আসিয়া এই কলটি সংস্থাপন করিয়াছেন, ইহা কলিকাতার ধনশালী মহাশয়গণ দেখুন।

শ্রী ন না।

কৃষ্ণকান্তের উইল।

চতুর্ব্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

যাহাকে ভাল বাস তাহাকে নয়নের আড় করিও না। যদি প্রেমবন্ধন দৃঢ় রাখিবে,তবে সূতা ছোট করিও। বাঞ্ছিতকে চোখে চোখে রাখিও। অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে। যাহাকে বিদায় দিবার সময়ে কত কাঁদিয়াছ, মনে করিয়াছ, বুঝি তাহাকে ছাড়িয়া দিন কাটিবে না,—কয় বৎসর পরে তাহার সহিত আবার যখন দেখা হইয়াছে,তখন কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছ—" ভাল আছ ত ?" হয় ত সে কথাও হয় নাই—কথাই হয় নাই—আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। হয় ত রাগে, অভিমানে আর দেখাই হয় নাই। তত নাই হউক, একবার চক্ষের বাহির হইলেই,যা ছিল তা আর হয় না। —যা যায়, তা আর আসে না। যা ভাঙ্গে, আর তা গড়ে না। মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী কোথায় দেখিয়াছ ?

ভ্রমর গোবিন্দলালকে বিদেশ যাইতে দিয়া ভাল করেন নাই। এ সময় দুই জনে একত্রে থাকিলে, এ মনের মালিন্য বুঝি ঘটিত না। বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ পাইত। ভ্রমরের এত ভ্রম ঘটিত না। এত রাগ হইত না। রাগে এত সর্ব্বনাশ হইত না।

গোবিন্দলাল গৃহযাত্রা করিলে, নাএব কৃষ্ণকান্তের নিকট এক এত্তেলা পাঠাইল যে, মধ্যম বাবু অদ্য প্রাতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সে পত্র ডাকে আসিল। নৌকার অপেক্ষা ডাক আগে আসে। গোবিন্দলাল স্বদেশে পৌঁছিবার চারি পাঁচ দিন আগে, কৃষ্ণকান্তের নিকট নায়েবের পত্র পৌঁছিল। ভ্রমর শুনিলেন স্বামী আসিতেছেন। ভ্রমর তখনই আবার পত্র লিখিতে বসিলেন। খান চারি পাঁচ কাগজ কালিতে পুরাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, ঘণ্টা দুই চারি মধ্যে একখানা পত্র লিখিয়া খাড়া করিলেন। এ পত্র মাতাকে। লিখিলেন,যে "আমার বড় পীড়া হইয়াছে। শ্বশুর শাশুড়ী আমার পীড়ার কথায় মনোযোগ করেন না। কোন চিকিৎসা পত্র করেন না—পীড়ার কথা স্বীকারই করেন না। তোমরা যদি একবার আমাকে লইয়া যাও, তবে আরাম হইয়া আসিতে পারি। বিলম্ব করিও না; পীড়া বৃদ্ধি হইলে আর আরাম হইবে না। পার যদি, কালি লোক পাঠাইও। এখানে পীড়ার কথা বলিও না, তাহা হইলে আমাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।" এই পত্র লিখিয়া গোপনে ক্ষীরি চাকরাণীর দ্বারা লোক ঠিক করিয়া, ভ্রমর তাহা পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল।

যদি মা না হইয়া, আর কেহ হইত, তবে ভ্রমরের পত্র পড়িয়াই বুঝিতে পারিত

যে ইহার ভিতর কিছু জুয়াচুরি আছে। কিন্তু মা, সন্তানের পীড়ার কথা শুনিয়া একেবারে কাতরা হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশে ভ্রমরের শাশুড়ীকে একলক্ষ গালি দিয়া পত্র স্বামীকে দেখাইলেন, এবং কাঁদিয়া কাটিয়া স্থির করিলেন যে, আগামী কল্য বেহারা পাল্কী লইয়া চাকর চাকরাণী ভ্রমরকে আনিতে যাইবে। ভ্রমরের পিতা, কৃষ্ণকান্তকে পত্র লিখিলেন। কৌশল করিয়া, ভ্রমরের পীড়ার কোন কথা না লিখিয়া, লিখিলেন, যে "ভ্রমরের মাতা অত্যন্ত পীড়িতা হইয়াছেন—ভ্রমরকে একবার দেখিতে পাঠাইয়া দিবেন।" দাস দাসীদিগকে সেই মত শিক্ষা দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বড় বিপদে পড়িলেন। এদিকে গোবিন্দলাল আসিতেছে, এ সময় ভ্রমরকে পিত্রালয়ে পাঠান অকর্ত্তব্য। ওদিকে ভ্রমরের মাতা পীড়িতা, না পাঠাইলেও নয়। সাত পাঁচ ভাবিয়া চারিদিনের করারে ভ্রমরকে পাঠাইয়া দিলেন।

চারিদিনের দিন গোবিন্দলাল আসিয়া পৌঁছিলেন। শুনিলেন যে ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছে, আজি তাহাকে আনিতে পাল্কী যাইবে। গোবিন্দলাল সকলই বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বড় অভিমান হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "আমি কেবল ভ্রমরের জন্য এ তুষার দগ্ধ হইতেছি, নিবারণ করি না। তবু ভ্রমরের এই ব্যবহার?—এই অবিশ্বাস! না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল। আমিও আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণধারণ করিতে পারে না?"

এই ভাবিয়া গোবিন্দলাল, ভ্রমরকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে মাতাকে নিষেধ করিলেন। কেন নিষেধ করিলেন, তাহা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার সম্মতি পাইয়া, কৃষ্ণকান্ত বধূ আনিবার জন্য আর কোন উদ্যোগ করিলেন না।

গোবিন্দলালের প্রধান ভ্রম যাহা, তাহা উপরে দেখাইয়াছি। তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস, সৎপথে থাকা ভ্রমরের জন্য, তাঁহার আপনার জন্য নহে। ধর্ম্ম পরের সুখের জন্য, আপনার চিত্তের নির্ম্মলতা সাধনজন্য নহে, ধর্ম্মাচরণ ধর্ম্মের জন্য নহে, ইহা ভয়ানক ভ্রান্তি। যে পবিত্রতার জন্য পবিত্র হইতে চাহে না, অন্য কোন কারণে পবিত্র, সে বস্তুতঃ পবিত্র নহে। তাহাতে এবং পাপিষ্ঠে বড় অধিক তফাৎ নহে। এই ভ্রমেই গোবিন্দলালের অধঃপতন হইল।

পঞ্চবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

এইরূপে দুই চারি দিন গেল। ভ্রমরকে কেহ আনিল না, ভ্রমরও আসিল না। গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরের বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে, তাহাকে একটু কাঁদাইব। মনে করিলেন, ভ্রমর

বড় অবিচার করিয়াছে, একটু কাঁদাইব। এক একবার শূন্য গৃহ দেখিয়া আপনি একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের অবিশ্বাস, মনে করিয়া এক একবার একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের সঙ্গে কলহ, এ কথা ভাবিয়া কান্না আসিল। আবার চোখের জল মুছিয়া, রাগ করিলেন। রাগ করিয়া ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেন। ভুলিবার সাধ্য কি? সুখ যায়, স্মৃতি যায় না। ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় না। মানুষ যায়, নাম থাকে।

শেষ দুর্ব্বুদ্ধি গোবিন্দলাল, মনে করিলেন, ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায়, রোহিণীর চিন্তা। রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা, একদিনও গোবিন্দলালের হৃদয় পরিত্যাগ করে নাই। গোবিন্দলাল জোর করিয়া তাহাকে স্থান দিতেন না, কিন্তু সে ছাড়িত না। উপন্যাসে শুনা যায়, কোন গৃহে ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে, ভূত দিবারাত্র উকি ঝুকি মারে, কিন্তু ওঝা তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। রোহিণী প্রেতিনী তেমনি দিবারাত্র গোবিন্দলালের হৃদয়মন্দিরে উকি ঝুকি মারে, গোবিন্দলাল তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। যেমন জলতলে চন্দ্র সূর্য্যের ছায়া আছে, চন্দ্রসূর্য্য নাই, তেমনি গোবিন্দলালের হৃদয়ে অহরহঃ রোহিণীর ছায়া আছে, রোহিণী নাই। গোবিন্দলাল ভাবিলেন, যদি ভ্রমরকে আপাততঃ ভুলিতে হইবে, তবে রোহিণীর কথাই ভাবি—নহিলে এ দুঃখ ভুলা যায় না। অনেক কুচিকিৎসক ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগ করেন। গোবিন্দলালও ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দলাল আপন ইচ্ছায় আপন অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রোহিণীর কথা প্রথমে স্মৃতি মাত্র ছিল, পরে দুঃখে পরিণত হইল। দুঃখ হইতে বাসনায় পরিণত হইল। গোবিন্দলাল বারুণীতটে, পুষ্পবৃক্ষপরিবেষ্টিত মণ্ডপমধ্যে উপবেশন করিয়া, সেই বাসনার জন্য অনুতাপ করিতেছিলেন। বর্ষাকাল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বাদল হইয়াছে—বৃষ্টি কখন২ জোরে আসিতেছে—কখন মৃদু হইতেছে। কিন্তু বৃষ্টি ছাড়া নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। প্রায়াগতা যামিনীর অন্ধকার, তাহার উপর বাদলের অন্ধকার। বারুণীর ঘাট স্পষ্ট দেখা যায় না। গোবিন্দলাল অস্পষ্টরূপে দেখিলেন যে একজন স্ত্রীলোক নামিতেছে। রোহিণীর সেই সোপানাবতরণ গোবিন্দলালের মনে হইল। বাদলে ঘাট বড় পিছল হইয়াছে—পাছে পিছলে পা পিছলাইয়া স্ত্রীলোকটি জলে পড়িয়া গিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, ভাবিয়া, গোবিন্দলাল কিছু ব্যস্ত হইলেন। পুষ্পমণ্ডপ হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "কে গা তুমি, আজ ঘাটে নামিও না—বড় পিছল, পড়িয়া যাইবে।"

স্ত্রীলোকটি তাঁহার কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল কি না বলিতে পারি না। বৃষ্টি পড়িতেছিল—বোধ হয় বৃষ্টির শব্দে

সে ভাল করিয়া শুনিতে পায় নাই। সে কক্ষস্থ কলসী ঘাটে নামাইল। সোপান পুনরারোহণ করিল। ধীরেং গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান অভিমুখে চলিল। উদ্যানদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। গোবিন্দলালের কাছে,মণ্ডপতলে গিয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দলাল দেখিলেন,সম্মুখে রোহিণী।

গোবিন্দলাল বলিলেন,

"ভিজিতে ভিজিতে এখানে কেন রোহিণি?"

রো। আপনি কি আমাকে ডাকিলেন?

গো। ডাকি নাই। ঘাটে বড় পিছল নামিতে বারণ করিতেছিলাম। দাঁড়াইয়া ভিজিতেছ কেন?

রোহিণী সাহস পাইয়া মণ্ডপমধ্যে উঠিল। গোবিন্দলাল বলিলেন, "লোকে দেখিলে কি বলিবে?"

রো। যা বলিবার তা বলিতেছে। সে কথা আপনার কাছে একদিন বলিব, বলিয়া অনেক যত্ন করিতেছি।

গো। আমারও সে সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। কে এ কথা রটাইল? তোমরা ভ্রমরের দোষ দাও কেন?

রো। সকল বলিতেছি। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া বলিব কি?

গো। না। আমার সঙ্গে আইস।

এই বলিয়া গোবিন্দলাল, রোহিণীকে ডাকিয়া বাগানের বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন।

সেখানে উভয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহার পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। কেবল এই মাত্র বলিব, যে সে রাত্রে রোহিণী, গৃহে যাইবার পূর্ব্বে গোবিন্দলালের মুখে শুনিয়া গেলেন যে গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজাপতিটির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনীশাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপ ত মোহের জন্যই হইয়াছিল।

গোবিন্দলাল প্রথমে এইরূপ ভাবিলেন। পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, পাপিষ্ঠ এইরূপ ভাবে। কিন্তু যেমন বাহ্যজগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্তর্জ্জগতে পাপের আকর্ষণে, প্রতি পদে পতনশীলের গতি বর্দ্ধিত হয়। গোবিন্দলালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল—কেন না, রূপতৃষ্ণা অনেক দিন হইতে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে। আমরা কেবল কাঁদিতে পারি, অধঃপতন বর্ণনা করিতে পারি না।

ক্রমে কৃষ্ণকান্তের কাণে রোহিণী ও গোবিন্দলালের নাম একত্রিত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকান্ত দুঃখিত হইলেন গোবিন্দলালের চরিত্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক ঘটিলে তাঁহার বড় কষ্ট। মনে মনে ইচ্ছা হইল গোবিন্দলালকে কিছু অনুযোগ

করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি কিছু পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শয়নমন্দির ত্যাগ করিতে পারিতেন না। সেখানে গোবিন্দলাল তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিত, কিন্তু সর্ব্বদা তিনি সেবকগণপরিবেষ্টিত থাকিতেন, গোবিন্দলালকে সকলের সাক্ষাতে কিছু বলিতে পারিতেন না। কিন্তু পীড়া বড় বৃদ্ধি পাইল। হঠাৎ কৃষ্ণকান্তের মনে হইল যে, বুঝি চিত্রগুপ্তের হিসাব নিকাশ হইয়া আসিল—এ জীবনের সাগরসঙ্গম বুঝি সম্মুখে। আর বিলম্ব করিলে কথা বুঝি বলা হইবে না। এক দিন গোবিন্দলাল অনেক রাত্রে বাগান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিন কৃষ্ণকান্ত মনের কথা বলিবেন মনে করিলেন। গোবিন্দলাল দেখিতে আসিলেন। কৃষ্ণকান্ত পার্শ্ববর্ত্তিগণকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন। পার্শ্ববর্ত্তিগণ সকলে উঠিয়া গেল। তখন গোবিন্দলাল কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আপনি আজি কেমন আছেন?" কৃষ্ণকান্ত ক্ষীণস্বরে বলিলেন,

"আজি বড় ভাল নই। তোমার এত রাত্রি হইল কেন?"

গোবিন্দলাল সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, কৃষ্ণকান্তের প্রকোষ্ঠ হস্তমধ্যে লইয়া নাড়ি টিপিয়া দেখিলেন। অকস্মাৎ গোবিন্দলালের মুখ শুকাইয়া গেল। কৃষ্ণকান্তের জীবনপ্রবাহ অতি ধীরে, ধীরে, ধীরে বহিতেছে। গোবিন্দলাল কেবল বলিলেন, "আমি আসিতেছি।" কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহ হইতে নির্গত হইয়া গোবিন্দলাল একবারে, স্বয়ং বৈদ্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈদ্য বিস্মিত হইল। গোবিন্দলাল বলিলেন, মহাশয় শীঘ্র ঔষধ লইয়া আসুন, জ্যেষ্ঠ তাতের অবস্থা বড় ভাল বোধ হইতেছে না। বৈদ্য শশব্যস্তে একরাশি বটিকা লইয়া তাঁহার সঙ্গে ছুটিলেন।—মনে মনে স্থিরসংকল্প অদ্য কৃষ্ণকান্তকে সংহার করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। কৃষ্ণকান্তের গৃহে গোবিন্দলাল বৈদ্যসহিত উপস্থিত হইলেন, কৃষ্ণকান্ত কিছু ভীত হইলেন। কবিরাজ হাত দেখিলেন। কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কেমন কিছু শঙ্কা হইতেছে কি?" বৈদ্য বলিলেন, "মনুষ্যশরীরে শঙ্কা কখন নাই?"

কৃষ্ণকান্ত বুঝিলেন। বলিলেন, "কতক্ষণ মিয়াদ?"

বৈদ্য বলিলেন, "ঔষধ খাওয়াইয়া পশ্চাৎ বলিতে পারিব।" বৈদ্য ঔষধ মাড়িয়া সেবন জন্য কৃষ্ণকান্তের নিকট উপস্থিত করিলেন। কৃষ্ণকান্ত ঔষধের খল হাতে লইয়া, একবার মাথায় স্পর্শ করাইলেন। তাহার পর ঔষধটুকু সমুদায় পিকদানিতে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

বৈদ্য বিষণ্ণ হইল। কৃষ্ণকান্ত দেখিয়া বলিলেন, "বিষণ্ণ হইবেন না। ঔষধ খাইয়া বাঁচিবার বয়স আমার নহে। ঔষধের অপেক্ষা হরিনামে আমার উপকার। তোমরা হরিনাম কর, আমি শুনি।"

কৃষ্ণকান্ত ভিন্ন কেহই হরিনাম করিল না, কিন্তু সকলেই স্তম্ভিত, ভীত, বিস্মিত হইল। কৃষ্ণকান্ত একাই ভয়শূন্য। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালকে বলিলেন,

"আমার শিওরে দেরাজের চাবি আছে, বাহির কর।"

গোবিন্দলাল বালিশের নীচে হইতে চাবি লইলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দেরাজ খুলিয়া আমার উইল বাহির কর।"

গোবিন্দলাল দেরাজ খুলিয়া উইল বাহির করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমার আমলা মুহুরি ও দশজন গ্রামস্থ ভদ্র লোক ডাকাও।"

তখনই নাএব মুহুরি গোমস্তা কারকুনে, চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যে, ঘোষ বসু মিত্র দত্তে ঘর পূরিয়া গেল!

কৃষ্ণকান্ত একজন মুহুরিকে আজ্ঞা করিলেন "আমার উইল পড়।"

মুহুরি পড়িয়া সমাপ্ত করিল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "ও উইল ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। নূতন উইল লেখ।"

মুহুরি জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপ লিখিব।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "যেমন আছে সব সেইরূপ, কেবল—"

"কেবল কি?"

"কেবল গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া দিয়া তাহার স্থানে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ ভ্রমরের নাম লেখ। ভ্রমরের অবর্ত্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অর্দ্ধাংশ পাইবে লেখ।"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কেহ কোন কথা কহিল না। মুহুরি গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিল। গোবিন্দলাল ইঙ্গিত করিলেন, লেখ।

মুহুরি লিখিতে আরম্ভ করিল। লেখা সমাপন হইলে কৃষ্ণকান্ত স্বাক্ষর করিলেন। সাক্ষিগণ স্বাক্ষর করিল। গোবিন্দলাল আপনি উপযাচক হইয়া, উইলখানি লইয়া তাহাতে সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করিলেন।

উইলে গোবিন্দলালের এক কপর্দ্দকও নাই—ভ্রমরের অর্দ্ধাংশ।

সেই রাত্রে হরিনাম করিতে করিতে তুলসীতলায় কৃষ্ণকান্ত পরলোক গমন করিলেন।

সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুসম্বাদে দেশের লোক ক্ষোভ করিতে লাগিল। কেহ বলিল একটা ইন্দ্রপাত হইয়াছে, কেহ বলিল, একটা দিক্‌পাল মরিয়াছে, কেহ বলিল পর্ব্বতের চূড়া ভাঙ্গিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত বিষয়ী লোক, কিন্তু খাটি লোক ছিলেন। এবং দরিদ্র ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে যথেষ্ট দান করিতেন। সুতরাং অনেকেই তাঁহার জন্য কাতর হইল।

সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রমর। এখন কাজে

কাজেই ভ্রমরকে আনিতে হইল। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পরদিনেই গোবিন্দলালের মাতা উদ্যোগী হইয়া পুত্রবধূকে আনিতে পাঠাইলেন। ভ্রমর আসিয়া কৃষ্ণকান্তের জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

গোবিন্দলালের সঙ্গে ভ্রমরের প্রথম সাক্ষাতে, রোহিণীর কথা লইয়া কোন মহাপ্রলয় ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল কি না, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের শোকে সে সকল কথা এখন চাপা পড়িয়া গেল। ভ্রমরের সঙ্গে গোবিন্দলালের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন ভ্রমর জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের জন্য কাঁদিতেছে। গোবিন্দলালকে দেখিয়া আরও কাঁদিতে লাগিল। গোবিন্দলালও অশ্রুবর্ষণ করিলেন।

অতএব যে বড় হাঙ্গামার আশঙ্কা ছিল, সেটা গোলেমালে মিটিয়া গেল। দুই জনেই তাহা বুঝিল। দুইজনেই মনে মনে স্থির করিল যে, যখন প্রথম দেখায় কোন কথাই হইল না, তবে আর গোলযোগ করিয়া কাজ নাই—গোলযোগের এ সময় নহে, মানে মানে কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া যাক্—তাহার পরে যাহার মনে যা থাকে তাহা হইবে। তাই ভাবিয়া গোবিন্দলাল, একদা উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ভ্রমরকে বলিয়া রাখিলেন,

"ভ্রমর, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে। কথাগুলি বলিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে। পিতৃশোকের অধিক যে শোক আমি সেই শোকে এক্ষণে কাতর। এখন আমি সে সকল কথা তোমায় বলিতে পারিব না। শ্রাদ্ধের পর যাহা বলিবার আছে তাহা বলিব। ইহার মধ্যে সে সকল কথার কোন প্রসঙ্গে কাজ নাই।"

ভ্রমর, অতি কষ্টে নয়নাশ্রু সম্বরণ করিয়া বাল্যপরিচিত দেবতা, কালী, দুর্গা, শিব, হরি স্মরণ করিয়া বলিল, "আমারও কিছু বলিবার আছে। তোমার যখন অবকাশ হইবে, জিজ্ঞাসা করিও।"

আর কোন কথা হইল না। দিন যেমন কাটিত, তেমনি কাটিতে লাগিল—দেখিতে, তেমনি দিন কাটিতে লাগিল; দাস দাসী, গৃহিণী, পৌরস্ত্রী, আত্মীয় স্বজন কেহ জানিতে পারিল না, যে আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে, এ চারু প্রেমপ্রতিমায় ঘুন লাগিয়াছে। কিন্তু ঘুন লাগিয়াছে ত সত্য। যাহা ছিল, তাহা আর নাই। যে হাসি ছিল, সে হাসি আর নাই। ভ্রমর কি হাসে না? গোবিন্দলাল কি হাসে না? হাসে, কিন্তু সে হাসি আর নাই। নয়নে নয়নে মিলিতে মিলিতে যে হাসি আপনি উছলিয়া উঠে, সে হাসি আর নাই; যে হাসি আধ হাসি আধ প্রীতি, সে হাসি আর নাই; যে হাসি অর্দ্ধেক বলে, সংসার সুখময়, অর্দ্ধেক বলে, সুখের আকাঙ্ক্ষা পুরিল না—সে হাসি আর নাই। সে চাহনি নাই—যে চাহনি দেখিয়া, ভ্রমর ভাবিত, "এত রূপ!"—যে চাহনি দেখিয়া গোবিন্দলাল

ভাবিত, "এত গুণ!" সে চাহনি আর নাই। যে চাহনিতে স্নেহপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি প্রমত্ত গোবিন্দলালের চক্ষু দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত বুঝি এ সমুদ্র আমার ইহজীবন সাঁতার দিয়া পার হইতে পারিব না,—যে চাহনি দেখিয়া, গোবিন্দলাল ভাবিয়া, ভাবিয়া, ইহসংসার সকল ভুলিয়া যাইত, সে চাহনি আর নাই। সে সকল প্রিয়-সম্বোধন আর নাই—সে "ভ্রমর," "ভোমরা," "ভোমর" "ভোম্" "ভ্রমরি," "ভ্রমি," "ভ্রম্,"—সে সব নিত্য নূতন, নিত্য স্নেহপূর্ণ, রঙ্গপূর্ণ, সুখপূর্ণ, সম্বোধন আর নাই। সে কালো, কালা, কালাচাঁদ, কেলে সোনা, কালো মাণিক, কালিন্দী, কালীয়ে— সে প্রিয় সম্বোধন আর নাই। সে ও, ওগো ওহে, ওলো,—সে প্রিয়সম্বোধন আর নাই। সে মিছামিছি ডাকাডাকি আর নাই। সে মিছা মিছি বকাবকি আর নাই। সে কথা কহার প্রণালী আর নাই। আগে কথা কুলাইত না—এখন তাহা খুঁজিয়া আনিতে হয়। যে কথা, অৰ্দ্ধেক ভাষায়, অৰ্দ্ধেক নয়নে নয়নে, অধরে অধরে, প্রকাশ পাইত, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। যে কথা অৰ্দ্ধেক মাত্র বলিতে হইত, আর অৰ্দ্ধেক না বলিতেই বুঝা-যাইত, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। যে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, কেবল উত্তরে কণ্ঠস্বর শুনিবার প্রয়োজন, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। আগে যখন গোবিন্দলাল ভ্রমর একত্রে থাকিত, তখন গোবিন্দলালকে ডাকিলে কেহ সহজে পাইত না—ভ্রমরকে ডাকিলে একেবারে পাইত না। এখন ডাকিতে হয় না—হয় "বড় গরমি," নয়, "কে ডাকিতেছে," বলিয়া একজন উঠিয়া যায়। এ সুন্দর পূর্ণিমা মেঘে ঢাকিয়াছে। কার্ত্তিকী রাকায় গ্রহণ লাগিয়াছে। কে খাটি সোনায় দস্তার খাদ মিশাইয়াছে—কে সুরবাঁধা যন্ত্রের তার কাটিয়াছে।

আর সেই মধ্যাহ্ন রবিকরপ্রফুল্ল হৃদয় মধ্যে অন্ধকার হইয়াছে। গোবিন্দলাল সে অন্ধকারে আলো করিবার জন্য, ভাবিত রোহিণী—ভ্রমর সে ঘোর, মহা ঘোরান্ধকারে, আলো করিবার জন্য—ভাবিত যম! নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, প্রেমশূন্যের প্রীতিস্থান তুমি, যম! চিত্তবিনোদন, দুঃখবিনাশন, বিপদভঞ্জন, দীনরঞ্জন তুমি যম! আশাশূন্যের আশা, ভালবাসাশূন্যের ভাল বাসা, তুমি যম! ভ্রমরকে গ্রহণ কর, হে যম!

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

তার পর কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভারি শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। শক্রপক্ষও বলিল যে হাঁ ঘটা হইয়াছে বটে, পাঁচ সাত দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। মিত্রপক্ষ বলিল লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উত্তরাধিকারিগণ মিত্র পক্ষের নিকট গোপনে বলিল, আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার

টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমরা খাতা দেখিয়াছি। মোট ব্যয়, ৩২৩৫৬।/১২॥

যাহা হউক, দিনকতক বড় হাঙ্গামা গেল। হরলাল, শ্রাদ্ধাধিকারী, আসিয়া শ্রাদ্ধ করিল। দিনকতক মাছির ভনভনানিতে, তৈজসের ঝনঝনানিতে, কাঙ্গালির কোলাহলে, নৈয়ায়িকের বিচারে, গ্রামে কান পাতা গেল না। সন্দেশ মিঠাইয়ের আমদানি, কাঙ্গালির আমদানি, টিকির নামাবলীর আমদানি, কুটুম্বের কুটুম্ব, তস্য কুটুম্ব তস্য কুটুম্বের আমদানি। ছেলে গুলা. মিহিদানা সীতাভোগ লইয়া ভাঁটা খেলাইতে আরম্ভ করিল, মাগীগুলা নারিকেল তৈল মহার্ঘ দেখিয়া, মাথায় লুচিভাজা ঘি মাখিতে আরম্ভ করিল, গুলির দোকান বন্ধ হইল, সব গুলিখোর ফলাহারে, মদের দোকান বন্ধ হইল, সব মাতাল, টিকি রাখিয়া নামাবলী কিনিয়া, উপস্থিত পত্রে বিদায় লইতে গিয়াছে। চাল মহার্ঘ হইল. কেন না কেবল অন্নব্যয় নয়, এত ময়দা খরচ, যে আর চালের গুঁড়িতে কুলান যায় না, এত ঘৃতের খরচ, যে রোগীরা আর কাষ্টর অয়েল পায় না, গোয়ালার কাছে ঘোল কিনিতে গেলে তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল, আমার ঘোল টুকু ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে দই হইয়া গিয়াছে।

কোনমতে শ্রাদ্ধের গোল থামিল, শেষ উইল পড়ার যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। উইল পড়িয়া, হরলাল দেখিলেন, উইলে বিস্তর সাক্ষী—কোন গোল করিবার সম্ভাবনা নাই। হরলাল শ্রাদ্ধান্তে স্বস্থানে গমন করিলেন।

উইল পড়িয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিলেন, "উইলের কথা শুনিয়াছ?"

ভ্র। কি?

গো। তোমার অর্দ্ধাংশ।

ভ্র। আমার না তোমার?

গো। এখন আমার তোমার একটু প্রভেদ হইয়াছে। আমার নয়, তোমার।

ভ্র। তাহা হইলেই তোমার।

গো। না। তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না।

ভ্রমরের বড়ই কান্না আসিল, কিন্তু ভ্রমর অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল, "তবে কি করিবে?"

গো। যাহাতে দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারি, তাহাই করিব।

ভ্র। সে কি?

গো। দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া চাকরির চেষ্টা করিব।

ভ্র। বিষয় আমার জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের নহে, আমার শ্বশুরের। তুমিই তাঁহার উত্তরাধিকারী, আমি নহি। জ্যেঠার উইল করিবার কোন শক্তিই ছিল না। উইল অসিদ্ধ। আমার পিতা শ্রাদ্ধের সময়ে নিমন্ত্রণে আসিয়া এই কথা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বিষয় তোমার, আমার নহে।

গো। আমার জ্যেষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী

ছিলেন না। বিষয় তোমার, আমার নহে। তিনি যখন তোমাকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তখন বিষয় তোমার, আমার নহে।

ভ্র। যদি সেই সন্দেহই থাকে, আমি না হয় তোমাকে লিখিয়া দিতেছি।

গো। তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে ?

ভ্র। তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? আমি তোমার দাসানুদাসী বই ত নই ?

গো। আজি কালি ও কথা সাজে না ভ্রমর।

ভ্র। কি করিয়াছি ? আমি তোমা ভিন্ন এ জগৎসংসারে আর কিছু জানি না। আট বৎসরের সময়ে আমার বিবাহ হইয়াছে—আমি সতের বৎসরে পড়িয়াছি। আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রতিপালিত, তোমার খেলিবার পুত্তল—আমার কি অপরাধ হইল ?

গো। মনে করিয়া দেখ।

ভ্র। অসময়ে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—ঘাট হইয়াছে, আমার শত সহস্র অপরাধ হইয়াছে—আমায় ক্ষমা কর। আমি আর কিছু জানি না, কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম।

গোবিন্দলাল কথা কহিল না। তাহার অগ্রে, আলুলায়িতকুন্তলা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা, কাতরা, মুগ্ধা, পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতা। গোবিন্দলাল কথা কহিল না। গোবিন্দলাল তখন ভাবিতেছিল, "এ কালো! রোহিণী কত সুন্দরী! এর গুণ আছে, তার রূপ আছে। এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব।—আমার এ অসার, আশাশূন্য, প্রয়োজন শূন্য জীবন যথেচ্ছ কাটাইব। মাটীর ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা সেই দিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

ভ্রমর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছে—ক্ষমা কর। ক্ষমা কর। আমি বালিকা।

যিনি অনন্ত সুখদুঃখের বিধাতা, অন্তর্যামী, কাতরের বন্ধু, অবশ্যই তিনি এ কথাগুলি শুনিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা শুনিল না। নীরব হইয়া রহিল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভাবিতেছিল। তীব্রজ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্ত প্রভাশালিনী প্রভাত শুক্র নক্ষত্ররূপিণী রূপতরঙ্গিণী চঞ্চলা রোহিণীকে ভাবিতেছিল।

ভ্রমর উত্তর না পাইয়া বলিল, "কি বল ?"

গোবিন্দলাল বলিল,

"আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।"

ভ্রমর পদত্যাগ করিল। উঠিল। বাহিরে যাইতেছিল। দ্বারদেশে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

বঙ্গে উন্নতি।

আজি কালি বঙ্গ লইয়া অনেক আন্দোলন হইতেছে। আমরাও এই সময় দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু প্রাচীন কালে এ দেশের যে সীমা ছিল এক্ষণে তাহাই আছে কি না, অগ্রে জানা কর্ত্তব্য, নতুবা ঐতিহাসিক সমালোচনা কিম্বা তুলনা করিতে গেলে ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

বৈদিক সময়ে বঙ্গদেশ ছিল কি না জানি না। তখন হয় ত ভগবতী ভাগীরথী এতদূর না আসিয়াই কল্লোলিনীবল্লভের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গ তখন সাগরগর্ভে কি জঙ্গলময় চরভূমি মাত্র ছিল।* ফলতঃ তখন বঙ্গের বড় নাম গন্ধ পাওয়া যাইত না। আদিধর্ম্ম শাস্ত্রপ্রণেতা মনুর সময়েও বঙ্গ অনার্য্যপ্রদেশ। তখন আদিম শূদ্র ও চণ্ডাল আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া এই নূতন জঙ্গলে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে বঙ্গ প্রথমে পশু পক্ষী উরগের আবাসভূমি, পরে বন্য জাতির; মধ্যে মধ্যে বর্ষা কালে জলপ্লাবনে ডুবিয়া যাইত এবং শীতের প্রারম্ভে দারুণ রোগের জ্বালায় তত্রত্য লোকে অস্থির হইত, সুতরাং বঙ্গ তৎকালে বিজেতা তেজস্বী প্রভুপদাভিষিক্ত আর্য্যজাতির অলোভনীয় ছিল। মগধরাজ্যের প্রথম উন্নতির সময় বঙ্গে আর্য্যসমাগম। তখন প্রাগ্জ্যোতিষ পর্য্যন্ত আর্য্যধ্বজা উড়িতেছিল অর্থাৎ বর্ত্তমান আসাম প্রদেশ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং তখন ভাগীরথীর ও পদ্মার উত্তরাঞ্চল আর্য্যদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছিল। বঙ্গের এই দিকে প্রথম আর্য্যনিবাস। মিথিলা ও মগধ ইহার অব্যবহিত পশ্চিমে। এই খানে কোন কোন মতে মৎস্যদেশ,— এক্ষণে দিনাজপুর। ইহার পূর্ব্ব বঙ্গপুরের সান্নিধ্য মহাস্থানে বাণরাজার বাস। কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পদ্মার তটে পৌণ্ড্র। মৎস্যের দক্ষিণে ভাগীরথীকূলে গৌড়। তৎকালে বর্ত্তমান বঙ্গের এই ভাগ বঙ্গ বলিয়া অভিহিত হয় নাই।

ভাগীরথীর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে তাম্রলিপ্তী, অঙ্গরাজ্য ও মগধের কিয়দংশ। কোন কোন মতে আধুনিক বর্দ্ধমান প্রাচীন পৌণ্ড্র বর্দ্ধন।† মেদিনী-

* পুরাণে আছে মন্দর ভূধরকে মন্থনদণ্ড করিয়া দেবাসুরে সমুদ্রমন্থন করিয়াছিলেন। পরে চক্রপাণির চক্রে অসুরেরা অমৃত ভোজনে বঞ্চিত ও অদিতিসুত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। মন্দর গিরি রাজমহলের দক্ষিণ পশ্চিম গিরিসঙ্কটের একটী শিখর। অতএব বোধ হয় ঐ শৈলরাজের পদতলে বঙ্গোপসাগর তরঙ্গ রঙ্গে খেলাকরিত। উহার এক পার্শ্বে আর্য্য দেবগণ অপর পার্শ্বে অনার্য্য অসুরগণ অবস্থিতি করিতেন। পরে ক্রমে ক্রমে সগারোদ্ভূত দেশ সমুদয় দেবতাদিগের অধীন হইয়াছিল।

† Cunningham's Geography of Ancient Iudia.

পুরের নিকট গোপনামা একটী স্থান আছে—কিম্বদন্তীতে শুনা যায় ঐ স্থানে বিরাটরাজের দক্ষিণ গোগৃহ ছিল। যাহা হউক ইহা একপ্রকার স্থির করা যায় যে, মহাভারতের যুদ্ধের সময় এই সকল স্থান বঙ্গের অন্তর্গত ছিল না।

ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার সঙ্গমস্থানের কিছু উত্তরে লাঙ্গলবন্ধ নামক স্থান। প্রবাদ আছে যে ঐখানে ভগবান্ বলদেব হল পরিত্যাগ করিয়া স্নান করিয়াছিলেন। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কহেন অর শব্দে হল বুঝায় সুতরাং আর্য্যজাতি হলধর, অতএব হলধরের বিরামস্থান আর্য্যরাজ্যের সীমা। ইহার পূর্ব্ব পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ বলিয়া গণিত। কিন্তু কেহ কেহ কহেন বর্ত্তমান পার্ব্বতীয় অনার্য্য গারো জাতি হিড়িম্বার বংশীয় ও মণিপুর বাসীরা ইরাবানের সন্তান, যদ্যপি তাহা হয় তবে ইহারা পাণ্ডবের বংশ—কি পাপে বর্জ্জিত বলিতে পারি না। ত্রিপুরপ্রদেশ পৌরাণিক মতে দৈত্যদেশ,অতএব আর্য্যভূমি নহে। এতা বতা স্থির হইতেছে যে, পৌরাণিক সময়ে বাঙ্গালার পূর্ব্বাংশে বহুল প্রদেশ বঙ্গান্তর্গত ছিল না কেবল মাত্র নদীমাতৃক গঙ্গা পদ্মাবেষ্টিত গাঙ্গ্য ভূমিই বঙ্গ ভূমি। আধুনিক বঙ্গভূমি যে ভাগীরথীপ্রসূত, নব্য নবদ্বীপ ও চক্রদ্বীপ তাহার সাক্ষী। অর্থাৎ আর্য্যভারতের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা, বর্ত্তমান বাঙ্গালার পশ্চিমোত্তর প্রদেশাপেক্ষা, প্রকৃত বঙ্গদেশ আধুনিক। আর দেখিতেছি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বঙ্গজশ্রেণী নাই, কায়স্থদিগের আছে, অন্য জাতির শ্রেণীবিভাগ নাই। ইহাতেই বোধ হয় ভাগীরথীর পূর্ব্ববঙ্গ প্রথমে ব্রাহ্মণের আবাসযোগ্য ছিল না। আদিশূরের সময় (খৃ ৯৫০-১০০০) যে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন করেন তাঁহারা রাজা কর্তৃক পাঁচ খানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর পাইয়াছিলেন। কিন্তু তদ্বংশজাত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা বঙ্গ ব্যাপিয়া আছেন। অতএব বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাস অল্পদিন, খ্রীষ্টীয় সহস্র বৎসরেরও পরে।* আরও দেখা যায় পুরাণাদিতে যে সকল তীর্থস্থানের উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে বঙ্গে একটিও নাই। কালীঘাট সন্দেহ স্থল। এজন্য বিবেচনা হয় বঙ্গ বহুদিন পর্য্যন্ত আর্য্যের বাসস্থান হয় নাই।

এক্ষণে দেখা গেল যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা ও প্রাচীন বঙ্গ এক নহে। প্রকৃত বঙ্গ বাঙ্গালার সামান্য অংশ মাত্র এবং ঐ অংশও অপেক্ষাকৃত অল্প দিন ভিন্নদেশাগত আর্য্যসন্তান দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন মহাভারতে কেবল বঙ্গাধিপ হস্তীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন উল্লেখ আছে এই মাত্র,আর কোন কথা নাই। পুরাণেও বাঙ্গালির যুদ্ধবিগ্রহ লেখা নাই—কোন অমানুষিক কি গৌরবের কার্য্যের উল্লেখ নাই; তাহাতেই সিদ্ধান্ত হইতেছে বাঙ্গালিরা কোন কালে যুদ্ধাদি করেন নাই ও

* সপ্তশতি ব্রাহ্মণেরা কোথায় ছিলেন স্থির নাই।

ইতিহাসের সমালোচ্য কিছুই তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই। এইটী সমূহ ভ্রম। আদৌ এক্ষণকার বাঙ্গালিরা প্রাচীন বঙ্গবাসীর সন্তান নহেন। কান্যকুব্জের, মৎস্যের, অঙ্গের শৌর্য্যাদি অপরিচিত ছিল না। পৌরাণিক সময় ছাড়িয়া দিই। কেন না তখনকার ইতিহাস আধুনিক জ্ঞানদৃষ্টিতে অপ্রামাণ্য। প্রকৃত ইতিহাসে বিজয়সিংহের সিংহলবিজয় উল্লেখ আছে। তৎকালে বাঙ্গালার লোকের সাহস ও কার্য্যকারিতা ছিল। নৌচালন ও বাণিজ্য বহুল প্রচলিত ছিল। বঙ্গীয় কার্পাস বস্ত্র রোমনগরবাসিনী কুলীন কন্যারা ব্যবহার করিতেন। জগদ্বিজেতা বিভবপূর্ণ গর্ব্বিত সুখসম্ভোগী রোমানজাতি ঢাকাই সূক্ষ্ম ঊর্ণনাভবিনিন্দ্য বিচিত্র বসনকে সমাদর করাতেই বঙ্গীয় তন্তুবায়ের বিশিষ্ট গৌরব ছিল। বোধ হয় তৎকালে পৃথিবীমধ্যে তাহারা এসকলে অতুল্য ছিল। অদ্যাপিও চট্টগ্রাম প্রদেশের লোকেরা নৌচালনতৎপর। খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে বঙ্গীয় নাবিকেরা বঙ্গোপসাগরে অর্ণবযান দ্বারা পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জের সমস্ত বাণিজ্য বহন করিত। বিখ্যাত ফা হিয়ান নামক চীন পরিব্রাজক অস্মদ্দেশীয় তাম্রলিপ্তী (তমলুক) বন্দরের বিশেষ সমৃদ্ধি দেখিয়াছিলেন এবং হুএন সাঙ্গ নামক বৌদ্ধ চীনও হিন্দু নাবিকচালিত জাহাজে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। রোমান্ জাতিও সপ্তগ্রামের বণিক্দিগের পরিচয় পাইয়াছিলেন। অতএব বাঙ্গালায় পূর্ব্বকালে বাণিজ্য, নৌচালন বিদ্যার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। আধুনিক বাঙ্গালার পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বিদ্যার চর্চা বহুকাল হইতে হইয়াছিল। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের টীকাকার কুল্লূকভট্ট রাজসাহী নিবাসী ছিলেন। আদিশূরের সময় বেণীসংহার রচয়িতা ভট্টনারায়ণ ও নৈষধকার শ্রীহর্ষ জীবিত ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের সময় জয়দেব, উমাপতিধর, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি কবিরা বঙ্গে বিরাজ করিতেছিলেন। হলায়ুধ নামক বিখ্যাত পণ্ডিত এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। অতএব মুসলমানদিগের বাঙ্গালা জয়ের পূর্ব্বে এ প্রদেশে সংস্কৃতশাস্ত্রে অনেকে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ, অলঙ্কার মহাকাব্য নাটক ও গীতিকাব্যে ইঁহাদের সমকক্ষ সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তামধ্যে অল্পই আছে। পৃথিবীমধ্যে যে কোন ভাষায় ইঁহাদের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। মুসলমানদিগের আগমনের পর বাঙ্গালা সাহিত্যে ক্রমান্বয়ে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কীর্ত্তনরচয়িতা, বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যগুণকীর্ত্তনরচয়িতা, রামায়ণ অনুবাদক কীর্ত্তিবাস ও তৎপরে মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কবিগণও বাঙ্গালা সাহিত্যকে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইঁহারা ভিন্ন জাতির সাহায্য

না লইয়া প্রকৃত বাঙ্গালি কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধন করেন।

ইহাদের ভাব, চিন্তা, ভাষা, এই দেশসম্ভূত। ইহা তাঁহাদের নিজের না হইলেও সংস্কৃতানুযায়ী, সুতরাং স্বজাতিভাবাপন্ন। এই কালমধ্যে অর্থাৎ (খ্রী ১০০০ হইতে ১৬০০) পর্য্যন্ত কবিকর্ণপূর, মধুবেশ প্রভৃতি কবি, রঘুনাথ ভট্ট দার্শনিক, রঘুনন্দন স্মার্ত্ত প্রভৃতি সংস্কৃতশাস্ত্রে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালার সাহিত্য উদ্যানে আম্রপণস, নারিকেল থাকিত, লিচু, পিচ, গোলাপযাম ছিল না। সেফালিকা, মালতী, গন্ধরাজ ছিল, ডালিয়া, গোলাপ, লিলাক ছিল না।* আধুনিক যুবার মনোহরণের উপযোগী না হইতে পারে, নূতন রসাস্বাদনী রুচির, নূতন গন্ধানুসারী ঘ্রাণের তৃপ্তিকর না হইতে পারে কিন্তু দ্রব্যগুলি স্বদেশজাত, সহজউপলব্ধ, সাধারণভোগ্য এবং সুলভ ছিল। এক্ষণকার ন্যায় কৃত্রিম স্বাদের ও বিজাতীয় রুচির অভাব থাকায় তৎকালে তাহাতে কাহারও কষ্ট হয় নাই। তখন গিল্টী করা অলঙ্কার ছিল না। চুয়া, চন্দন, কর্পূর, কস্তূরী, একাঙ্গী ছিল, গোলাপ ল্যাভেণ্ডার ছিল না। কেবল সাহিত্যে ছিল না এমত নহে আচারে বেশভূষায় গৃহোপকরণে সাধারণ সভ্যতায় সর্ব্বাঙ্গীণ দেশী ভাব ছিল। বিলাতীজড়িত দেশী কি বিলাতী মাখা হয় নাই। বাঙ্গালা সম্পূর্ণ বাঙ্গালির ছিল।

এই সময় বেশভূষায় বাঙ্গালিরা কিরূপ ছিলেন নিশ্চয় বলা যায় না। মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালির ধুতি, উত্তরীয়, অঙ্গরাখা ছিল উষ্ণীষও থাকা সম্ভব।† বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব হইবার পূর্ব্বে ভট্টাচার্য্যেরা মস্তকমুণ্ডন করিয়া শিখা ধারণ করিতেন না। বৌদ্ধ শ্রমণেরা প্রথমে একবারে মস্তক মুণ্ডন করিতেন, তাহা হইতে ব্রাহ্মণেরা ক্রমে তদনুরূপ করিতে শিখেন। বোধ হয় পূর্ব্বে জটাজূট গুম্ফ সকলই থাকিত, ক্রমে বৌদ্ধদিগের দেখাদেখি সকলই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বিনামা ব্যবহার হইত কি না বলা যায় না কিন্তু কাষ্ঠপাদুকা ছিল অথবা কাষ্ঠ ও চর্ম্মে নির্ম্মিত এক প্রকার পাদুকা ছিল। ছত্র, শিবিকা গোযান ছিল। এক্ষণকার ন্যায় ঘোটকযানাদি ছিল না। মুসলমানদিগের সময়ে পাশ্চাত্য প্রদেশীয় বেশ বাহনাদি প্রচলিত হইয়াছে।

ভোজনে এই কালমধ্যে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। অন্ন ব্যঞ্জন প্রায় একরূপ ছিল। খিচুড়ী ছিল না,

---

* মালীরা জোড়কলম বান্ধিতে শিখে নাই এবং পরের সামগ্রী গুলি লইয়া গৃহ সাজাইতে কাহারও প্রবৃত্তি ছিল না। এখন ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক প্রকাশ্যে কি অপ্রকাশ্যে পরের দ্রব্য কিছু রঙ্গ বদলাইয়া চালাইয়া দিই।

† কার্পাস ও পট্টবস্ত্র উভয়ই প্রচলিত ছিল। মুসলমানদিগের অধিকারে শালের ব্যবহার হয়।

পলান্ন ও পায়স* ছিল। চৈতন্য চরিতামৃত ও কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে রন্ধনের কথা আছে, তাহাতে বোধ হয় মুসলমানদিগের সময় আহারাদির পদ্ধতি এক্ষণকার ন্যায় ছিল। অতি প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণেরা মাংসভোজী ছিলেন কিন্তু বৌদ্ধাধিকার হইতে নিরামিষ ভোজন আরম্ভ হয়। এক্ষণে যে প্রকার ঘৃত ও তৈলপক্ক জলপানীয় দ্রব্য ব্যবহার আছে তাহা পূর্ব্বে ছিল না। মিষ্টান্নের মধ্যে মোদক সন্দেশ ও পিষ্টক ছিল। এতদ্ব্যতীত সকলই মুসলমানদিগের দ্বারা শিক্ষিত হইয়াছি। কিন্তু জলপানীয়ের পদ্ধতি পূর্ব্বে এ প্রকার ছিল না কেন না উক্ত জাতিরা প্রায় দ্বিভোজন করিতেন না। ব্যঞ্জনের দ্রব্যমধ্যে কপি, আলু, সালগাম, গাজর ছিল না, অন্যান্য ফল মূল মধ্যে পেঁপিয়া, বাতাবি নেবু, ও বিলাতী ফল মাত্র ছিল না।

বাটী ঘর প্রায় এক্ষণকার ন্যায় ছিল। ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাসাদ বিরল ছিল। তুষারধবলকায় কবাটযুক্ত বিচিত্র হর্ম্ম্যরাজি কোথাও নয়নগোচর হইত না। গ্রাম, নগর, বিপণী, নদী ও সরোবরতটে, পুষ্পোদ্যানে অমরাবতী তুল্য কবি কল্পনাসম্ভূত সমা অট্টালিকা কেহ দেখেন নাই। সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্তী, গৌড়, নবদ্বীপ প্রভৃতি কয়েকটি নগর ছিল তথায় প্রশস্ত স্থূল স্থূল ইষ্টক ও প্রস্তরময় প্রাসাদ ছিল কিন্তু তাহাতে অল্প প্রকার কারুকার্য্য ও হস্তচাতুর্য্য ছিল। কাচের দ্বার কি চূর্ণের আবরণ, কি বিনিসীয় ঝিলমিল ছিল না। বর্ত্তমান সভ্যতার প্রধান উপকরণ বাষ্পীয় যন্ত্র ইংরেজরাজের সহিত এদেশে অবতীর্ণ হইয়াছে। মাদকদ্রব্য তুরিতানন্দ ও সিদ্ধি ছিল—মুসলমানেরা চরস তামাক প্রচলিত করেন। কেহ কেহ অনুভব করেন মোগলদিগের সময় তামাক এ দেশে আনীত হয়। কেহ বলেন "তাম্রকূট" অনেক দিন পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়াছিল। সোমরস ও একপ্রকার ফুলের দ্বারা প্রস্তুত সুরার ব্যবহার ছিল; কিন্তু বৈষ্ণবচূড়ামণি ভক্তিমার্গপ্রদর্শক ভগবান্ চৈতন্যদেব হইতে সুরানিবারণী সভার সৃষ্টি হয়। চৈতন্য দেব (খৃ অঃ ১৯৯৭-১৫৪০) মোগল সাম্রাজ্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তাঁহার কিছু পূর্ব্বে তন্ত্রের প্রাদুর্ভাব হয়; ঐ সময় পঞ্চ মকারের বৃদ্ধি, অতএব পাঠান রাজাদিগের সময়ে প্রথমে সুরার আধিপত্য, মধ্যে লোপ পাইয়া আবার প্রবল হইয়াছে। এখানে আর একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তন্ত্র শাস্ত্র বাঙ্গালায় অধিক ও অগ্রে প্রচারিত হইয়াছিল।

বোধ হয় গীত বাদ্য বহুদিন হইতে এ প্রদেশে প্রচলিত আছে। দুর্গোৎসব

---

* পায়স এক্ষণকার ন্যায় ছিল কি না বলা যায় না। ঋগ্বেদের সময় পায়সে দধি দেওয়া পদ্ধতি ছিল। (See Aitaryea Brahmana by Dr. M. Haug) কিন্তু বাঙ্গালিরা এরূপ পায়স খাইতেন কি না ঠিক নাই।

পদ্ধতি মধ্যে রাগাদির সহিত মন্ত্রোচ্চারণের বিধি আছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে গীতসমূহে রাগের উল্লেখ আছে এবং তদ্দ্বারা জয়দেবগোস্বামী সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন বলিয়া বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। গীতাভিনয় ও কৃষ্ণলীলাসঙ্কীর্ত্তন জয়দেবের সময়ে কি কিছু পরে আরম্ভ হয়। উভয়ই মুসলমানদিগের পূর্ব্বে। চণ্ডীর গান কবিকঙ্কণের পর ও তৎপরে কবির গান। এতদুভয় অপেক্ষাকৃত নূতন। নর্ত্তকীও ঐরূপ। বাঙ্গালার মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রথম গীতবাদ্যের আলোচনা। তথায় গীতবাদ্য অনেক উন্নতিপ্রাপ্ত ও বৈঠকী গানের সৃষ্টি হইয়াছিল।

উত্তর ভারত অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যে বাঙ্গালা প্রদেশে সর্ব্বশেষে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল। তখন আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া দলভুক্ত করিতেছিলেন। ইহারাই নীচ জাতি অথবা অন্ত্যজ যথা বাগ্‌দী দুলিয়া প্রভৃতি। বাঙ্গালায় ইহাদের সংখ্যা আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা অধিক ছিল। বাঙ্গালায় হিন্দুধর্ম্ম দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইতে না হইতে শাক্যমুনি মগধে ধর্ম্মধ্বজা উত্তোলন করিয়াছিলেন। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম প্রচার হইতে না হইতেই বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয়। প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত ঐ ধর্ম্ম অপ্রতিহত ছিল। সেনবংশীয় রাজাদিগের সময় পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপিত হয় ও মুসলমানদিগের প্রথমাধিকারে তন্ত্রের প্রাদুর্ভাব হয়। অতএব পৌরাণিক মতও অনেক বৎসর প্রচলিত ছিল। চৈতন্যদেবের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তান্ত্রিক ও চৈতন্য সম্প্রদায়ে জাতিভেদ শিথিল ছিল। ফলতঃ ভগবান্ চৈতন্য বুদ্ধদেবের প্রদর্শিত পথে ধর্ম্মসংস্করণের চেষ্টা করেন। বিশেষ এই বৌদ্ধধর্ম্ম নীরস ও তর্কসম্ভূত, বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ কিন্তু উভয়ই পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মবিরোধী। এইরূপে ক্রমশঃ বাঙ্গালায় মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম ও সমাজবিপ্লব ঘটিয়া ধর্ম্মভাব অনেকাংশে শিথিল হইয়াছে। এই জন্যই বাঙ্গালায় ইতর লোকেরা শীঘ্র শীঘ্র মুসলমান ও খ্রীষ্টান হইয়াছে।

মুসলমানদিগের দ্বারা (১২০৩ হইতে ১৭৫৭ খৃ অ পর্য্যন্ত) বাঙ্গালায় অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সাহিত্যে পারস্যভাষার চর্চ্চা ও বাঙ্গালা ভাষায় পারস্য শব্দের বহুল ব্যবহার। ধর্ম্ম ও সমাজে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি। আচার ব্যবহার ও বেশভূষায় মুসলমানের অনুকরণ। আহারে মাংসের প্রাচুর্য্য ও খিচুড়ি প্রভৃতির নূতন ব্যবহার। নগরাদি নূতন নূতন নির্ম্মাণ মুরসিদাবাদ, ঢাকা হুগলী রাজমহল প্রভৃতি। বাণিজ্যে উন্নতি কিন্তু চাকরিরও বৃদ্ধি। হিন্দুদিগের স্বাধীনাবস্থায় লোকে প্রায় স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন। মুসলমানদিগের সময় তাহা ক্রমশঃ কমিয়া একণে চাকরি প্রায় সাধারণবৃত্তি হইয়াছে। মুসলমানেরা বাঙ্গালি হিন্দুদিগকে উচ্চপদ

দিতেন। নবাবের রায় রেঁযে, ঢাকা ও পাটনার ডিপুটী গবর্ণরী পদ ইঁহাদের প্রাপ্য ছিল। কমিসনরের পদাপেক্ষা এ সকল মর্য্যাদাবান্ পদ ছিল।

এই সকল পরিবর্ত্তন মধ্যে সাহিত্যের বিষয় বিশেষ অনুধাবনীয়। কবিওয়ালার গান, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, রামপ্রসাদ সেনের পদাবলী মুসলমানাধিকারের শেষে হইয়াছিল। এইসকলের মধ্যে মধ্যে পারস্যভাষার ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু পারস্য কি কোনরূপ বিজাতীয় ভাবের বহুল অনুকরণ দৃষ্ট হয় না, ভাষার উন্নতিও দৃষ্ট হয়। একাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় গদ্য গ্রন্থ ছিল না বলিলেই হয়।

ইংরেজাধিকারে বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। এক্ষণকার উন্নতি সকলেই দেখিতেছেন অতএব তাহা বর্ণন বাহুল্য। তবে বাঙ্গালিরা ইংরেজের সম্পূর্ণ অনুকরণে প্রবৃত্ত— আহার, ব্যবহার, বসন, গৃহ, আমোদ প্রমোদ সকলই ইংরেজী। শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজীতে চিন্তা করিয়া বাঙ্গালায় প্রকাশ করেন। ষ্টুয়ার্ট নামক বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিশারদ কহিয়াছেন যে, অন্য কোন লোককে মনের ভাব জ্ঞাপনার্থ ভাষার প্রয়োজন নহে, মনোমধ্যে ভাবিতে গেলেও ভাষার আবশ্যক; অতএব ইংরেজিতে ভাবিলে ইংরেজি বাঙ্গালার ভাব প্রকাশ হয় এই জন্যই ইংরেজি শিক্ষিতেরা উভয় জড়িত ভাষা সর্ব্বদা ব্যবহার করেন। যাঁহারা বড় বড় লেখক তাঁহারা কথায় কথায় মিল, স্পেন্সর, বেন্থাম প্রভৃতির দোহাই দেন। এই জন্যই বিশুদ্ধ বাঙ্গালাভাষায় ইংরেজি ভাবপরিপূর্ণ। নাটক, কাব্য, নবন্যাস যে কিছু সাহিত্য দেখ ইংরেজি ভাব, ইংরেজি ভাষার অনুবাদ মাত্র। ফলতঃ বাঙ্গালার বর্ত্তমান সাহিত্য ধুতি চাদর পরা ইংরেজ।* ইংরেজি না জানিলে এক্ষণকার বাঙ্গালা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যাঁহারা নূতন পদ্ধতির বাঙ্গালা শিখিতেছেন তাঁহারা ক্রমে বুঝিতে পারেন কিন্তু পূর্ব্বকালের বাঙ্গালিরা তাহা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতেন সন্দেহ নাই। তাহা হইলেও এক্ষণকার উন্নতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। গদ্যলেখক পূর্ব্বে ছিল না। পদ্যও অনেকাংশে বিশুদ্ধ ভাবের অনুমোদিত ও উৎকৃষ্ট ভাবসম্পন্ন হইয়াছে। নূতন নূতন কৌশল ভাষার লালিত্য ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি হইয়াছে। ভরসা করি ক্রমে দোষগুলি বিলুপ্ত হইয়া গুণের আধিক্য হইবে।

* বাঙ্গালির অনুকরণপ্রিয়তা ডারউইন সাহেবের মতের আনুষঙ্গিক প্রমাণ। লাঙ্গুল থাকিলেও যা না থাকিলেও তা। ফলতঃ ডারউইন সাহেবের মতটী নূতন নহে, আমাদের প্রাচীন হিন্দুমতে অশীতিলক্ষযোণি ভ্রমণ করিয়া শেষে "নর বানর"—বা বাঙ্গালি। কবি গে সাহেবের (Gay's) সভ্য বানর!

শৈশব সহচরী।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুমুদিনীর ভাল বাসা।

"আমি কি তোমাকে দরিদ্র হইতে বলিয়াছিলাম।" অতি ধীরে, অতি মৃদু, অতি মধুর এবং কাতরস্বরে একটি দ্বাবিংশতি বর্ষীয়া সুন্দরী নিকটস্থ একটি যুবককে এই কথা বলিতেছিলেন। আগরা সহরে যমুনা তীরে একটি ক্ষুদ্র গৃহের বারেণ্ডায় বসিয়া কুমুদিনী আর শরৎ কুমার, দুই জনে কথোপকথন হইতেছিল। শরৎকুমার কিঞ্চিৎ শীর্ণ—যেন সম্প্রতি কোন উৎকট রোগহইতে শান্তিলাভ করিয়াছেন। দুইজনে দুইজনের বড় অনুগত—সর্ব্বদা একত্রিত, ক্ষণিক বিচ্ছেদ হইলে, উভয়ে বড় কাতর হইতেন, একের পীড়া হইলে, অপরে কাতর হইতেন, উভয়ে যেন কোন স্নেহরজ্জুতে আবদ্ধ। শরৎকুমারের মলিন মুখমণ্ডল দেখিয়া কুমুদিনী মধ্যে মধ্যে বড় কাতর হইতেন। কুমুদিনীর শুশ্রূষা এবং যত্নেই শরৎকুমার সে উৎকট পীড়াহইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। এক দিন কুমুদিনী অতি যত্নে শরতের হস্তধারণ করিয়া, তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া, অতি কাতর স্বরে বলিল, "আমি কি তোমাকে দরিদ্র হইতে বলিয়াছিলাম।" শরৎকুমার কম্পিতস্বরে বলিলেন, "কুমুদিনি, আমি কাহার জন্য এ অতুল ঐশ্বর্য্য অন্যকে বিতরণ করিয়া দরিদ্র হইলাম, তোমার জন্য না? তুমিই না আমায় দরিদ্র হইতে বলিয়াছিলে? মনে পড়ে কি না পড়ে দেখ, তুমি বলিয়াছিলে আমি যদি কখন কাহকেও বিবাহ করি তবে সে দরিদ্রকে, এখন সে কথার অন্যথা কর কেন?" কুমুদিনী আবার মনে মনে ভাবিলেন, যে শরৎকুমার বড় ছেলে মানুষ—এখনই এইরূপ ছেলেমানুষের ন্যায় দাবি করিতেছে—যেন বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই তিনি তাহার কেনা গোলাম হইয়াছেন, না জানি বিবাহ হইলে কত অসঙ্গত দাবি করিবে। এই ভাবিতে ভাবিতে উত্তর করিলেন, "কি অদৃষ্ট করিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছি।—শরৎকুমার। যে দরিদ্র হইবে তাহাকেই বিবাহ করিতে হইবে? যদি বিধাতা তাহাই আমার অদৃষ্টে লিখিয়া থাকেন, তবে তোমা অপেক্ষা শতসহস্র লোক দরিদ্র আছে, তাহারা সকলে আমার স্বামী হইবে—তুমি কেমন করে হবে—তুমি ত দরিদ্র নও—" এই বলিয়া কুমুদিনী অন্যমনস্ক হইয়া নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। শরৎকুমার বালকের ন্যায় "সে কি, সে কি কুমুদিনি," বলিতে লাগিলেন। কুমুদিনী সে সকল কিছুই শুনিতেছিলেন না, অনন্যমনে যমুনার দিকে যাইয়া কি ভাবিতেছিলেন। অনেক ক্ষণের পর হঠাৎ শরৎকুমারের দুই হস্ত ধারণকরিয়া তাহার মুখপ্রতি

একদৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন, " শরৎকুমার, আমায় ভাল বাস ?" শরৎকুমার উন্মত্তের ন্যায় বলিতে লাগিলেন ' সে কি কথা কুমুদিনি ? তোমায় ভাল বাসিনে ? তবে কাহাকে বাসি ?"

কুমু। যদি ভাল বাস তবে তাহার পরীক্ষা দাও।

শরৎ। কি পরীক্ষা কুমুদিনি ? বল আমি প্রস্তুত আছি. প্রাণ দিতে হবে কি ?

কু। না প্রাণ নহে, একে আমার আপনার এই ক্ষুদ্র প্রাণ আমি রাখিতে পারিতেছি না—তাতে আবার তোমার অত বড় প্রাণ লইয়া এ বোঝা কি ডুবাইব ?

শরৎকুমার এই মর্ম্মভেদী উপহাসে বড় দুঃখিত হইলেন; তাঁহার যে আশাটুকুর উদ্দীপন হইয়াছিল, তাহা একেবারে নিবিয়া গেল—বলিলেন " তবে কি পরীক্ষা কুমুদিনি ?"

কু। তুমি আমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া একটি কথা স্বীকার কর।

আবার যেন শরৎকুমারের আশা জন্মিল।

শ। তোমার সম্মুখে স্বীকার করিলেই আমার শপথ হইল।

কু। না—তুমি আমায় স্পর্শ করিয়া স্বীকার কর।

শ। তবে বল।

শরৎকুমারের হৃদয় কম্পিত হইল, শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল—ওষ্ঠ শুষ্ক হইল।

কু। আমায় স্পর্শ করিয়া শপথ কর যে, আর কখন কাহাকেও তোমার বিষয় দান করিবে না।

শরৎকুমার প্রস্তরবৎ কুমুদিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কুমুদিনী বারম্বার জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর করিলেন, "আমার ত আর কিছু বিষয় নাই, সকল বিষয় দান করিয়া তোমার জন্য ভিখারী হইয়াছি।"

কু। যদিই আবার কোন বিষয় পাও?

"যদিই কোন বিষয় পাই, এ কি কথা —কুমুদিনী সে জন্য এত ব্যস্ত কেন, কুমুদিনীর সহিত আমার বিবাহ হইলে, পাছে ভবিষ্যতে আমি সমুদায় উড়াইয়া দিয়া তাহার সন্তানদিগকে দরিদ্র করি, সেই ভয়ে কি এই শপথ করাইতেছে। তাই কি ?—বোধ হয় তাই,—নিশ্চয় তাই — তবে কুমুদিনী আমায় নিশ্চয় বিবাহ করিবে —" এই ভাবিয়া শরৎকুমার ব্যগ্র ভাবে বলিলেন,

' কুমুদিনি, আমি তোমায় স্পর্শ করিয়া বলিতেছি যে, আর কখন আমার বিষয় কাহাকেও দান করিব না।"

কুমুদিনী শরৎকুমারের হস্তত্যাগ করিয়া তাহার প্রতি চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

" কেমন করে তোমায় বিবাহ করি শরৎকুমার—তুমি ত দরিদ্র নও—যদি দরিদ্র হইতে তবে বিবাহ করিতাম। তোমার বিষয় ত তুমি দান করিতে পার নাই।"

শ। বেশ, আমি দানপত্র লিখিয়া রতিকান্তকে পাঠাইয়া দিয়াছি—আমার বিষয় আমি জানিলাম না, তুমি জানিলে?

কুমুদিনী হাসিতে হাসিতে বলিল, "সে দানপত্র কোথায়?"

শ। কেন, রতিকান্তকে পাঠাইয়া দিয়াছি।

কু। বটে, কেমন করে পাঠাইলে বল দেখি?

শ। কলিকাতায় উকিলের বাড়ীতে দানপত্র লেখাইয়া মনে করিয়াছিলাম কলিকাতার ডাকে স্বহস্তে রওয়ানা করিব, কিন্তু সময় না পাওয়ায় রওয়ানা করিতে পারি নাই। তার পর গাড়ীতে মূর্চ্ছা হইল—জ্বর হইল, জ্বরে যে কাশী পৌঁছিলাম—কিছু মনে ছিল না—উহা পিরাণের পকেটে ছিল—তৎপরে আরোগ্য হইয়া স্বহস্তে ডাকে পাঠাইয়াছি।

কু। তাহাতে কি ছিল?

শ। কেন, দানপত্র।

কু। খুলে দেখিয়াছিলে কি?

শ। দেখিবার আবশ্যক কি, আমি স্বহস্তে কলিকাতায় খামের ভিতর পুরিয়াছিলাম।

কু। খাম কি কেহ খুলিয়া, দানপত্র বাহির করিয়া লইয়া অন্য কাগজ তাহার ভিতর পুরিয়া রাখিতে পারে না।

শরৎকুমার চমকিত হইয়া অতি কঠিন কটাক্ষে কুমুদিনীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে অতি পরুষভাবে বলিলেন,

"কাহার আবশ্যক, কে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে?"

"শরৎকুমার তুমি যাহাকে ভাল বাস, যাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে উদ্যত ছিলে, সে কি তোমার রক্ষার জন্য চুরি করিতে পারে না?"

শরৎকুমার "কুমুদিনি, তবে তুমি চোর" এই বলিয়া অতি রুষ্টভাবে তাঁহার দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইয়া নদীপ্রতি চাহিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কুমুদিনী এই রূঢ়বাক্যে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন, শরতের ভালবাসার সহিত রজনীর ভালবাসার কত প্রভেদ! দুইজনেই তাঁহার কথায় বিষয়ত্যাগ করিয়াছে—একজন রূপে বশীভূত হইয়া, অপর তাঁহার গুণে। তাঁহার প্রতি রজনীর এতই বিশ্বাস যে, তাঁহার একটি কথায় বিষয় ত্যাগ করিল। রজনী দেবতার ন্যায় ভক্তি করে ও ভাল বাসে, শরৎকুমার পুত্তলের ন্যায় ভাল বাসে। যত দিন তাঁহার রূপ থাকিবে, ততদিন তাহার ভাল বাসা। কিন্তু রজনীর ভাল বাসা?—রজনী কি আর তাঁহাকে ভাল বাসে?—এইবার বিষম সমস্যা—কুমুদিনী সকল ভুলিয়া গেলেন, চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

শরৎকুমার কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া, নিকটের একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ রতিকান্ত মুখোপাধ্যায়কে একখানি পত্র লিখিলেন; সমুদায় বৃত্তান্ত তাহাকে অবগত করাইলেন। আরও লিখিলেন, যে "সেই দানপত্র খানি তোমার ভ্রাতৃজায়া কুমুদিনীর নিকট আছে। যদি পারেন তবে তাহার নিকট হইতে

কৌশলে বাহির করিয়া লইবেন। তা হলে বিষয় এখনও আপনার, তিনি চেষ্টা করিলে সফল হইবেন না—কুমুদিনী বড় কৌশলময়ী—”

তৎপরে রাগের শমতা হইলে শরৎকুমার বালকের ন্যায় পুনরায় কুমুদিনীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কুমুদিনী হাসিতে হাসিতে বলিল,

“তোমার ভাল বাসা আবার কি ফিরে এলো—”

শরৎকুমার লজ্জিত হইয়া মৃত্তিকার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কুমুদিনী তাঁহার কষ্ট দেখিয়া অনেক প্রকার আদর করিতে লাগিলেন। শরৎকুমার সাহস পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “আচ্ছা, কুমুদিনি! রতিকান্ত তোমার দেবর, আর আমি ত তোমার কেহ নহি বলিলে হয়—আমি রতিকান্তকে বিষয় দান করিলাম তোমার তাহাতে আহ্লাদ হইবার কথা, তা না হইয়া তুমি আমায় বিষয় ফিরিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছ কেন?”

“কেন? তবে শুন।” বলিয়া কুমুদিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া শরৎকুমারের কাণের কাছে মুখ লইয়া যাইলেন। তাঁহার অলকাগুচ্ছ শরতের গণ্ডদেশে পড়িল, শরৎকুমার শিহরিয়া উঠিলেন। অতি মৃদুস্বরে কাণে কাণে কুমুদিনী বলিলেন যে “তোমায় যেমন ভাল বাসি, পৃথিবীতে তেমন আর কাহাকেও নহে; আমার সহোদর নাই—তুমিই আমার সহোদর। তোমার বিষয় তোমার থাকিলে আমি বড় সুখী হই।”

শরৎকুমারের মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল, রোদনোন্মুখ হইয়া হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অনেক দিনের পর।

আগরাসহরে যে বাড়ীটি হরিনাথ বাবু ভাড়া করিয়াছিলেন, তাহার দক্ষিণের বাতায়নে বসিলে সহরের শোভা সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। নিম্নে রাজপথ সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত জনাকীর্ণ, দিবারাত্র নানাপ্রকারের গাড়ি পাল্কী যাতায়াত করিতেছে। দূরে বৃহৎ বৃহৎ শ্বেত অট্টালিকাশ্রেণী অপরাহ্নের সূর্য্যকিরণে হরিদ্বর্ণ দেখাইতেছে এবং তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যমদমত্ত যবনরাজদিগের ঐশ্বর্য্যের সুবর্ণ পতাকাস্বরূপ তাজমহলের সুবর্ণ কলস সূর্য্যকিরণে জ্বলিতেছিল। সম্মুখে যমুনা নদী নীলাম্বু বিস্তৃত করিয়া দূরে অদৃশ্য হইতেছে—তদুপরি একপার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যপোতের অতি উচ্চ মাস্তুলের শ্রেণী দৃষ্ট হইতেছে। অপর পার্শ্বে মহাকালের ন্যায় বৃহৎ দুর্গ ইংরেজের গৌরব রক্ষা করিতেছে।

একদিবস অপরাহ্নে যখন সান্ধ্যতিমির ক্ষণে ক্ষণে মহানগরীতে গাঢ়তর হইতেছিল, তখন এই বাড়ীর দক্ষিণের বাতায়নে বসিয়া কুমুদিনী ও বিনোদিনী রাজপথ নিরীক্ষণ করিতেছিল। সন্ধ্যার

স্নিগ্ধকর বায়ুস্পর্শ লালসায় নাগরিকগণ নানাবিধ পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া কেহ রাজপথে কেহ বা নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন—কেহ বা পদব্রজে কেহ বা অশ্বারোহণে কেহ বা শকটারোহণে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ঘোড়ার টাপে ও অসংখ্য এক্কার দূরনিঃসৃত ঝন ঝন শব্দে একত্রিত হইয়া মহানগরীর এক ভাগে অতি মধুর কোলাহল তুলিল। অন্যভাগে যে স্থানে হিন্দুদিগের বাস,সন্ধ্যাসমাগমে সে স্থানের দেবার্চ্চনাজনিত শঙ্খ ঘণ্টা ও বাদ্যোদ্যমের গভীর নিনাদে সহর পরিপূরিত হইল। ভগিনীদ্বয় কখন, সেই শব্দ শুনিতেছেন, কখন দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সহরের সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন, কখন অশ্বারূঢ়া বিলাতী অবলাদিগের পরিচ্ছদ ও অশ্বচালনা দেখিয়া এবং সাহেবদিগের সহিত নিঃশঙ্কোচে তাহাদিগকে আলাপ করিতে দেখিয়া কত প্রকার ব্যঙ্গ করিতেছেন। বালিকাস্বভাবা বিনোদিনী তাহাদিগের গবাক্ষনিম্নে রাজপথে গাড়ির শ্রেণী দেখিয়া বলিল "দিদি দেখ কত এক্কা যাচ্চে, আমি গাড়ি গণি, এক খান, দু খান, তিন খান—দিদি দেখ দেখ কেমন সুন্দর বিবিটি, কেমন রং আহা চকের তারার রং ও চুলের রং যদি কাল হত তবে কি সুন্দরী হত।" দেখিতে দেখিতে গড়গড় করিয়া গাড়ি অদৃশ্য হইল। তার পর—"এই পাঁচ খান,ছয়খান আহা, এখান কি সুন্দর গাড়ি। কেমন তেজাল ঘোঁড়া ছুটো—এটি আমাদের বাঙ্গালি বাবু—কেমন গাড়িতে সুন্দর বসিয়া আছে—সাহেবদের অপেক্ষা ইহাকে ভাল দেখাচ্চে—" তৎপরে অতি বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিল, "দিদি এ কে? বোধ হয় যেন ইহাকে কোথাও দেখিয়াছি" —বলিয়া হস্ত দ্বারা কুমুদিনীকে টানিয়া দেখাইল। যেমন এক স্থানে প্রচণ্ড ঘূর্ণবাতাসের বেগে সে স্থলের দ্রব্যাদি আলোড়িত হয় সেইরূপ গাড়ির প্রতি দৃষ্টি করিয়া কুমুদিনীর মন আলোড়িত হইল, অথচ বাহ্যিক কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ হইল না। কুমুদিনী দৃষ্টি করিবামাত্র অস্ফুট চীৎকার ধ্বনিতে বলিলেন 'রজনীকান্ত, —রজনী, আমাদের রজনী যে।" বিনোদিনী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল "কে, রজনী! তাই ত রজনীই বটে ত—দাড়ি রাখিয়াছে বলিয়া আমি প্রথমে চিনিতে পারি নাই।" এই বলিয়া অতি বেগে সে স্থান হইতে দৌড়িয়া কুমুদিনী পিতা মাতাকে সংবাদ দিতে গেলেন।

কুমুদিনী সেই বাতায়নে বসিয়া সেই গাড়ির প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন, দেখিতে দেখিতে গাড়ি অদৃশ্য হইল। কুমুদিনী তৎক্ষণাৎ দ্রুত যাইয়া ছাদের উপর উঠিয়া দেখিলেন, যে গাড়ি রাস্তার একটি মোড় ফিরিয়া তাহাদিগের বাড়ীর সম্মুখের তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের দক্ষিণ ধারের একটি অনতিবৃহৎ সুচারু শ্বেত অট্টালিকার সম্মুখে থামিল। সে অট্টালিকাটি কুমুদিনীর শয়নকক্ষ হইতে দৃষ্ট হয়। কত দিন তিনি সেই অট্টালিকাটির

সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। তৎপরে নামিয়া আসিয়া বিনোদিনীকে ডাকিয়া গোপনে অতি মৃদুস্বরে (যেন কত লজ্জার কথা) বলিলেন, ঐ বাড়ীতে রজনীকান্তের বাসা—গাড়ি ঐ বাড়ীতে ঢুকিল। বিনোদিনী পুনরায় দৌড়িয়া যাইয়া হরিনাথ বাবুকে সংবাদ দিল, এবং ছাদে তাঁহাকে লইয়া যাইয়া অঙ্গুলি দ্বারায় বাড়ী দেখাইয়াদিল। হরিনাথ বাবু একখানি উত্তরীয় লইয়া সেই অট্টালিকার উদ্দেশে চলিলেন।

বাহুবল ও বাক্যবল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাহুবল ও বাক্যবল কি।

কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না, যে যে বলে ব্যাঘ্র হরিণশিশুকে হনন করিয়া ভোজন করে, আর যে বলে অস্তলিজ বা সেদান জিত হইয়াছিল তাহা একই বল;—দুইই বাহুবল। আমি লিখিতে লিখিতে দেখিলাম আমার সম্মুখে একটা টিকটিকি একটি মক্ষিকা ধরিয়া খাইল—সিসস্ট্রিস হইতে আলেকজণ্ডর রমানফ পর্য্যন্ত যে যত সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়াছে—রোমান বা মাকিদনীয় খস্রু বা খলিফা, রুস বা প্রুস যিনি যে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত বা রক্ষিত করিয়াছেন, তাঁহার বল, আর এই ক্ষুধার্ত্ত টিকটিকির বল একই বল—বাহুবল। সুলতান মহম্মদ সোমনাথের মন্দির লুঠ করিয়া লইয়া গেল—আর কালামুখী মার্জ্জারী ইন্দুর মুখে করিয়া পলাইল—উভয়েই বীর—বাহুবলে বীর। সোমনাথের মন্দিরে, আর আমার বস্ত্রচ্ছেদক ইন্দুরে প্রভেদ অনেক স্বীকার করি;—কিন্তু মহম্মদের লক্ষ সৈনিকে, আর একা মার্জ্জারীতেও প্রভেদ অনেক। সংখ্যা ও শরীরে প্রভেদ—বীর্য্যে প্রভেদ বড় দেখি না। সাগরও জল—শিশিরবিন্দুও জল। মহম্মদের বীর্য্য, ও টিকটিকি বিড়ালের বীর্য্য একই বীর্য্য। দুইই বাহুবলের বীর্য্য। পৃথিবীর বীর পুরুষগণ ধন্য! এবং তাঁহাদিগের গুণকীর্ত্তনকারী ইতিবৃত্তলেখকগণ—হেরডোটস হইতে কে ও কিঙলেক সাহেব পর্য্যন্ত—তাঁহারাও ধন্য।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে কেবল বাহুবলে কখন কোন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই—কেবল বাহুবলে পাণিপাট বা সেডান জিত হয় নাই—কেবল বাহুবলে নাপোলেয়ন বা মার্লবর বীর নহে। স্বীকার করি, কিছু কৌশল—অর্থাৎ বুদ্ধিবল—বাহুবলের সঙ্গে সংযুক্ত না হইলে কার্য্যকারিতা ঘটে না। কিন্তু ইহা কেবল মনুষ্যবীরের কার্য্যে নহে—কেহ কি মনে কর যে বিনা কৌশলে টিকটিকি মাছি ধরে, কি বিড়াল ইন্দুর ধরে? বুদ্ধিবলের সহযোগ ভিন্ন বাহুবলের

স্ফূর্ত্তি নাই—এবং বুদ্ধিবল ব্যতীত জীবের কোন বলেরই স্ফূর্ত্তি নাই।

অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে,যে বলে পশুগণ এবং মনুষ্যগণ উভয়ে প্রধানতঃ স্বার্থসাধন করে, তাহাই বাহুবল। প্রকৃত পক্ষে ইহা পশুবল, কিন্তু কার্য্যে সর্ব্বক্ষম, এবং সর্ব্বত্রই শেষ নিষ্পত্তিস্থল। যাহার আর কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না—তাহার নিষ্পত্তি বাহুবলে। এমন গ্রন্থি নাই যে ছুরিতে কাটা যায় না—এমত প্রস্তর নাই যে আঘাতে ভাঙ্গে না। বাহুবল ইহজগতের উচ্চ আদালত—সকল আপীলের উপর-আপীল এই খানে, ইহার উপর আর আপীল নাই। বাহুবল—পশুর বল; কিন্তু মনুষ্য অদ্যাপি কিয়দংশে পশু, এজন্য বাহুবল মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন।

কিন্তু পশুগণের বাহুবলে এবং মনুষ্যের বাহুবলে একটু গুরুতর প্রভেদ আছে। পশুগণের বাহুবল নিত্য ব্যবহার করিতে হয়—মনুষ্যের বাহুবল নিত্য ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। ইহার কারণ দুইটি। বাহুবল অনেক পশুগণের একমাত্র উদর-পূর্ত্তির উপায়। দ্বিতীয় কারণ, পশুগণ প্রযুক্ত বাহুবলের বশীভূত বটে, কিন্তু প্রয়োগের পূর্ব্বে প্রয়োগসম্ভাবনা বুঝিয়া উঠে না। এবং সমাজবদ্ধ নহে বলিয়া বাহুবলপ্রয়োগের প্রয়োজন নিবারণ করিতে পারে না। উপন্যাসে কথিত আছে যে এক বনের পশুগণ, কোন সিংহকর্ত্তৃক বন্যপশুগণ নিত্য হত হইতেছে দেখিয়া সিংহের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল যে, প্রত্যহ পশুগণের উপর পীড়ন করিবার প্রয়োজন নাই—একটি একটি পশু প্রত্যহ তাঁহার আহারজন্য উপস্থিত হইবে। এস্থলে পশুগণ সমাজ-নিবদ্ধ মনুষ্যের ন্যায় আচরণ করিল—সিংহকর্ত্তৃক বাহুবলের নিত্য প্রয়োগ নিবারণ করিল। মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারে, যে কোন্ অবস্থায় বাহুবল প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা। এবং সামাজিক শৃঙ্খলের দ্বারা তাহার নিবারণ করিতে পারে। রাজা মাত্রই বাহুবলে রাজা, কিন্তু নিত্য বাহুবলপ্রয়োগের দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রজাপীড়ন করিতে হয় না। প্রজাগণ দেখিতে পায় যে এই এক লক্ষ সৈনিকপুরুষ রাজার আজ্ঞাধীন; রাজাজ্ঞার বিরোধ তাহাদের কেবল ধ্বংসের কারণ হইবে। অতএব প্রজা,বাহুবল প্রয়োগ সম্ভাবনা দেখিয়া, রাজাজ্ঞা-বিরোধী হয় না। বাহুবলও প্রযুক্ত হয় না। অথচ বাহুবল প্রয়োগের যে উদ্দেশ্য তাহা সিদ্ধ হয়। এদিকে, এই একলক্ষ সৈন্য যে রাজার আজ্ঞাধীন, তাহারও কারণ প্রজার অর্থ অথবা অনুগ্রহ। প্রজার অর্থ যে রাজার কোষগত, বা প্রজার অনুগ্রহ যে তাঁহার হস্তগত সে টুকু সামাজিকনিয়মের ফল। অতএব এ স্থলে বাহুবল যে প্রযুক্ত হইল না তাহার মুখ্য কারণ মনুষ্যের দূরদৃষ্টি, গৌণ কারণ সমাজনিবন্ধন।

আমরা এ প্রবন্ধে গৌণ কারণটি ছাড়িয়া

দিলেও দিতে পারি। সামাজিক অত্যাচার যে যে বলে নিবারিত হয়, তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত। সমাজনিবদ্ধ না হইলে সামাজিক অত্যাচারের অস্তিত্ব নাই। সমাজনিবন্ধন সকল সামাজিক অবস্থার নিত্য কারণ। যাহা নিত্য কারণ, বিকৃতির কারণানুসন্ধানে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ইহা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে এইরূপ করিলে আমাদিগের শাসনের জন্য বাহুবল প্রযুক্ত হইবে—এই বিশ্বাসই বাহুবলপ্রয়োগ নিবারণের মূল। কিন্তু মনুষ্যের দূরদৃষ্টি সকল সময়ে সমান নহে—সকল সময়ে বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা করে না। অনেক সময়েই যাঁহারা সমাজের মধ্যে তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে এই এই অবস্থায় বাহুবল প্রয়োগের সম্ভাবনা। তাঁহারা অন্যকে সেই অবস্থা বুঝাইয়া দেন। লোকে তাহাতে বুঝে। বুঝে যে যদি আমরা এই সময়ে কর্ত্তব্য সাধন না করি, তবে আমাদিগের উপর বাহুবলপ্রয়োগের সম্ভাবনা। বুঝে যে বাহুবলপ্রয়োগে কতকগুলি অশুভ ফলের সম্ভাবনা। সেই সকল অশুভ ফল আশঙ্কা করিয়া যাহারা বিপরীত পথগামী, তাহারা গন্তব্যপথে গমন করে।

অতএব যখন সমাজের একভাগ অপর ভাগকে পীড়িত করে, তখন সেই পীড়ন নিবারণের দুইটি উপায়। প্রথম, বাহুবল প্রয়োগ। যখন রাজা প্রজাকে উৎপীড়ন করিয়া সহজে নিরস্ত হয়েন না, তখন প্রজা বাহুবল প্রয়োগ করে। কখন কখন রাজাকে যদি কেহ বুঝাইতে পারে, যে এইরূপ উৎপীড়নে প্রজাগণ কর্তৃক বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা, তবে রাজা অত্যাচার হইতে নিরস্ত হয়েন।

ইংলণ্ডের প্রথম চার্লস যে প্রজাগণের বাহুবলে শাসিত হইয়াছিলেন, তাহা সকলে অবগত আছেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জেমস, বাহুবলপ্রয়োগের উদ্যম দেখিয়াই দেশপরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এরূপ বাহুবল প্রয়োগের প্রয়োজন সচরাচর ঘটে না। বাহুবলের আশঙ্কাই যথেষ্ট। অসীম প্রতাপশালী ভারতীয় ইংরেজগণ যদি বুঝেন, যে কোন কার্য্যে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হইবে, তবে সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। ১৮৫৭।৫৮ শালে দেখা গিয়াছে, ভারতীয় প্রজাগণ বাহুবলে তাঁহাদিগের সমকক্ষ নহে। তথাপি প্রজার সঙ্গে বাহুবলের পরীক্ষা সুখদায়ক নহে। অতএব তাঁহারা বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা দেখিলে বাঞ্ছিতপথে গতি করেন না।

অতএব কেবল ভাবী ফল বুঝাইতে পারিলেই, বিনাপ্রয়োগে বাহুবলের কার্য্যসিদ্ধ হয়। এই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিদায়িনী শক্তি আর একটি দ্বিতীয় বল। কথার বুঝাইতে হয়। এই জন্য আমি ইহাকে বাক্যবল নাম দিয়াছি।

এই বাক্যবল অতিশয় আদরণীয় পদার্থ। বাহুবল, মনুষ্যসংহার প্রভৃতি বিবিধ অনিষ্টসাধন করে, কিন্তু বাক্যবল

বিনা রক্তপাতে, বিনা অস্ত্রাঘাতে, বাহুবলের কার্য্য সিদ্ধ করে। অতএব এই বাক্যবল কি, এবং তাহার প্রয়োগ লক্ষণ ও বিধান কি প্রকার, তাহা বিশেষ প্রকারে সমালোচিত হওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এতদ্দেশে। অস্মদ্দেশে বাহুবল প্রয়োগের কোন সম্ভাবনা নাই—বর্ত্তমান অবস্থায় অকর্ত্তব্যও বটে। সামাজিক অত্যাচারনিবারণের বাক্যবল এক মাত্র উপায়। অতএব বাক্যবলের বিশেষ প্রকারে উন্নতির প্রয়োজন।

বস্তুতঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এ পর্য্যন্ত বাহুবলে পৃথিবীর কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে—যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা বাক্যবলে। সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা বাক্যবলে। সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প, যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। যিনি বক্তা, যিনি কবি, যিনি লেখক—দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবেত্তা, ধর্ম্মবেত্তা, ব্যবস্থাবেত্তা, সকলেই বাক্যবলেই বলী।

ইহা কেহ মনে না করেন যে কেবল বাহুবলের প্রয়োগ নিবারণই বাক্যবলের পরিণাম, বা তদর্থেই বাক্যবল প্রযুক্ত হয়। মনুষ্য কতকদূর পশুচরিত্র পরিত্যাগ করিয়া উন্নতাবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময়ে মনুষ্য ভয়ে ভীত না হইয়াও, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। যদি সমগ্র সমাজের কখন এক কালে কোন বিশেষ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তবে সে সৎকার্য্য অবশ্য অনুষ্ঠিত হয়। এই সৎপথে জনসাধারণের প্রবৃত্তি কখন২ জ্ঞানীর উপদেশ ব্যতীত ঘটে না। সাধারণ মনুষ্যগণ অজ্ঞ, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষাদায়িনী উপদেশমালা যদি যথাবিহিত বলশালিনী হয়, তবেই তাহা সমাজের হৃদয়ঙ্গমতা হয়। যাহা সমাজের একবার হৃদগত হয়, সমাজ আর তাহা ছাড়ে না—তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। উপদেশবাক্যবলে আলোড়িত সমাজ বিপ্লুত হইয়া উঠে। বাক্যবলে এইরূপ যাদৃশ সামাজিক ইষ্ট সাধিত হয়, বাহুবলে তাদৃশ কখন সম্ভাবনা নাই।

মুসা, ইষা, শাক্যসিংহ প্রভৃতি বাহুবলে বলী নহেন—বাক্যবীর মাত্র। কিন্তু ইষা, শাক্যসিংহ প্রভৃতির দ্বারা পৃথিবীর যে ইষ্ট সাধিত হইয়াছে, বাহুবলবীরগণ কর্ত্তৃক তাহার শতাংশ নহে। বাহুবলে যে কখনও কোন সমাজের ইষ্টসাধন হয় না এমত নহে। আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলই শ্রেষ্ঠ। আমেরিকায় প্রধান উন্নতিসাধন কর্ত্তা, বাহুবলবীর ওয়াশিংটন। ইলণ্ড বেল্জিয়মের প্রধান উন্নতিসাধন কর্ত্তা বাহুবলবীর অরেঞ্জের উইলিয়ম। ভারতবর্ষের আধুনিক দুর্গতির প্রধান কারণ—বাহুবলের অভাব। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে, দেখা যাইবে, যে বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলেই জগতের ইষ্ট সাধিত হইয়াছে। বাহুবল পশুর বল—বাক্যবল মনুষ্যের বল। কিন্তু কতকগুলা বকিতে পারিলেই বাক্যবল হয় না।—বাক্যের বলকে আমি বাক্যবল বলিতেছি না। বাক্যে যাহা ব্যক্ত হয়, তাহারই বলকে বাক্যবল বলিতেছি। চিন্তাশীল চিন্তার দ্বারা জাগতিক তত্ত্ব সকল মনোমধ্য হইতে উদ্ধৃত করেন—বক্তা তাহা বাক্যে লোকের হৃদয়গত করান। এতদুভয়ের বলের সমবায়কে বাক্যবল বলিতেছি।

অনেক সময়েই এই বল, একাধারে নিহিত—কখন কখন বলের আধার পৃথক্ভূত। একত্রিত হউক, পৃথক্ভূত, উভয়ের সমবায়ই বাক্যবল।

বঙ্গদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

পঞ্চম খণ্ড।

শঙ্করাচার্য্য কি ছিলেন?

বঙ্গদেশে বেদান্তশাস্ত্রের প্রচার নাই, এজন্য বঙ্গদেশে শঙ্করাচার্য্যের মত লোকে বিশেষ অবগত নহে। বঙ্গদেশে তাঁহার প্রভাবও বড় অধিক নহে। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, বিশেষ দাক্ষিণাত্যে শঙ্করাচার্য্যকে লোকে দেবতা বলিয়া পূজা করে, তাঁহার গ্রন্থাবলী আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করে, তাঁহার মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে করে এবং অনেকে তাঁহার মত অনুসারে সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করে। মধ্যসময়ে ইয়ুরোপে আরিস্ততালের যেমন প্রভুত্ব হইয়াছিল আধুনিক ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য্যের ও প্রায় তেমনি প্রভুত্ব। তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত উপন্যাস শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, তিনি ৩২ বৎসর বয়সে সমস্ত বেদ বেদান্তের টীকা লিখিয়া কাশীতে প্রাণত্যাগ করেন। কেহ "অপরস্থা ভবিষ্যতি" বিষয়ক অদ্ভুত গল্পটী তাঁহার জীবনীতে প্রয়োগ করেন। কেহ আবার বলেন, শঙ্করাচার্য্য মহীসুরে স্বর্ণবৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই স্বর্ণ পাইয়া টিপু সুলতান ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করাতেই হারিয়া যায়।

হিন্দুরা শঙ্করাচার্য্যকে শঙ্করের অবতার মনে করেন এবং শৈবধর্ম্মের মিশনরী মনে করেন। ও দিকে আধুনিক ইংরেজী-ওয়ালারা বলেন শঙ্করাচার্য্য একজন সমাজসংস্কারক, তিনি বৌদ্ধদিগকে এদেশ হইতে দূর করিয়া দেন। তাঁহা হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃপ্রচার হয়; তিনি লুথর লয়োলা প্রভৃতি সংস্কারকদিগের ন্যায় উচ্চদরের লোক। যাঁহার বিষয়ে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত চলিয়া আসিতেছে,

যাঁহার কথা এখনও বেদ বলিয়া কোটী২ লোক মানিয়া আসিতেছে, তাঁহার কার্য্য-কলাপ, তাঁহার জীবনচরিত ও তাঁহার মত বঙ্গদর্শনের পাঠকবর্গ কিছু জানিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে উপস্থিত প্রস্তাবের অবতারণা হইল।

(শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত বিষয়ে সংস্কৃত গ্রন্থ।)

আমরা শঙ্করাচার্য্যের বহুসংখ্যক জীবন চরিতের নাম শুনিয়াছি। এমন কি অনেক বৈদান্তিকের বিশ্বাস, তাঁহার সকল শিষ্যই তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস থাকে থাকুক। আমরা এক্ষণে দুই খানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। একখানি শঙ্করাচার্য্যের এক জন প্রধান ছাত্র আনন্দ গিরির লিখিত, অপর খানি মাধবাচার্য্যের। প্রথম খানির নাম শঙ্কর-বিজয়, দ্বিতীয় খানির নাম শঙ্কর দিগ্বিজয়। প্রথম খানি গদ্য, দ্বিতীয় খানি মহাকাব্য —ষোড়শ সর্গে সম্পূর্ণ। বর্ত্তমান প্রস্তাব প্রধানতঃ এই দুইখানি গ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত হইবে। আনন্দ গিরি ও মাধবাচার্য্যের এস্থলে বিশেষ পরিচয় আবশ্যক করে না, উভয়েই সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথিতনামা। একজন শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যদিগের মধ্যে পদ্মপাদাচার্য্যের পরই প্রধানতম বলিয়া গণ্য এবং স্বীয় আচার্য্যের বহুসংখ্যক ভাষ্যের টীকাকার। অপরজন বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরের ছাত্র, প্রসিদ্ধ বেদার্থপ্রকাশ নামক বেদব্যাখ্যার রচয়িতা।

(শঙ্করবিজয়ের প্রাধান্য।)

মাধবাচার্য্যের গ্রন্থ অপেক্ষা শঙ্কর-বিজয়ের ঐতিহাসিক মূল্য অনেক অধিক। আনন্দ গিরি আচার্য্যের সমসাময়িক লোক। মাধবাচার্য্য অন্তত তাঁহার ছয় শত বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আনন্দ গিরি গদ্যে ইতিহাস লিখিব প্রতিজ্ঞা করিয়া লিখিয়াছেন। মাধব মহাকাব্য লিখিতে গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে তিনি কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তাঁহাকে রাজা নব কালিদাস উপাধি দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কথায় আমরা অধিক বিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু কল্পনা যতই ক্ষমতা বিস্তার করুক না, ধর্ম্মভয়ে আচার্য্যের জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় মাধব ও আনন্দে বড় ইতর বিশেষ নাই।

(শঙ্করাচার্য্য কি ছিলেন?)

শঙ্করাচার্য্য বিষয়ে কতকগুলি লোকায়ত কুসংস্কার আছে। তাঁহার জীবনী লিখিবার পূর্ব্বে সেই গুলি দূর করা আবশ্যক। প্রথম কুসংস্কার এই যে তিনি একজন সমাজসংস্কারক, কেহ তাঁহাকে বুদ্ধের সহিত, কেহ চৈতন্যের সহিত, কেহ লুথরের সহিত, কেহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ সংস্কারকদিগের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক তিনি সমাজসংস্কারক ছিলেন না। পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণের সহিত তুলিত হইবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। তাঁহার হৃদয় অতি ক্ষুদ্র,

স্বার্থপর ও উদারতাবিরহিত। তিনি বুদ্ধিমান্, বিচারপটু, অগাধবিদ্যাসমুদ্র-পারযায়ী, যে ক্ষমতাবলে অনেক লোক আয়ত্ত হয়, অনেকে দেবতা, গুরু, অবতার বলিয়া মান্য করে, সেই ক্ষমতা তাঁহার অপর্য্যাপ্ত ছিল। তাঁহার ন্যায় বক্তৃতাশক্তি, তাঁহার ন্যায় রচনার গভীরতা, প্রাচীন ভারতবর্ষে দুর্লভ। কিন্তু তথাপি তিনি সমাজসংস্কারক নহেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি চারি জাতি এক করিয়া ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিব, সকলকে সন্নীতি, সৎকার্য্য, সদ্ধর্ম্মে আনিয়া নূতন সভ্যতার ভিত্তিপাত করিব, এ সকল তিনি পারিতেন, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও এ সকল উদারভাব তাঁহার অনুদার হৃদয় কন্দরে স্থান পায় নাই। সংস্কারবিষয়ে তিনি যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা এই,—তিনি ব্রাহ্মণদিগকে শিব, শক্তি প্রভৃতি নানা উপাসনা হইতে বিরত করিয়া শুদ্ধাদ্বৈতমত গ্রহণ করিয়া মঠাশ্রমী হইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। এই টুকু তাঁহার সংস্কারকার্য্য। ইহাতে ভারতবর্ষের দুই প্রকার অনিষ্ট হইয়াছে। প্রথম হিন্দুদিগের মধ্যে মঠাশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে এবং অন্যান্য বর্ণের সহিত ব্রাহ্মণদিগের সহানুভূতি হ্রাস হইয়াছে। শঙ্করবিজয় গ্রন্থে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই তিনি যখন উজ্জয়িনী নগরে বাস করিতেছেন, সেই সময় শূদ্রজাতীয় উন্মত্ত ভৈরব নামা কাপালিক তাঁহার সহিত বিচার করিতে উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন, "গচ্ছ কাপালিক, স্বচ্ছন্দে বেড়াও গিয়া; দুষ্ট মতাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে দমন করিবার জন্যই আমার আগমন। অগ্রজাতিপাদসেবনই অন্ত্যজাতির কর্ম্ম। অতএব শিষ্যগণ উহাকে দূর করিয়া দেও।" বলিবামাত্র শিষ্যেরা কশাঘাত পুরঃসর কাপালিককে দূর করিয়া দিল।* এই তাঁহার সমাজ সংস্কার।

(বিরুদ্ধমত খণ্ডন।)

অনেকে বলিবেন শঙ্করাচার্য্য যে সময়ের লোক সে সময়ে শঙ্করাচার্য্যের ব্রাহ্মণদমন কার্য্যদ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছিল। সত্য, হইয়াছিল। তাঁহার পর ব্রাহ্মণদিগের যথেষ্ট বিদ্যোন্নতি হয়। তিনি স্বীয় মনের অগ্নিময় তেজোবলে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একটী নূতন সাহসের আবির্ভাব করেন, তাহার ফল আমরা আজিও অনুভব করিতে পারি। তাই বলিয়া তাঁহাকে আমরা রিফরমর বা সমাজ সংস্কারক বলিতে পারি না। যদি বলিতে হয়, তিনি উচ্চদরের সংস্কারক ছিলেন বলিতে পারিব না। তাঁহার কৃত সংস্কার ব্রাহ্মণ জাতিতে পর্য্যবসিত। বুদ্ধদেবের আগে হইলে তাঁহার ঐ সংস্কারেই বাহাদুরী হইত বটে, কিন্তু বুদ্ধদেবের পর ওরূপ অল্পায়ত সংস্কার তাঁহার অনুদার মনোবৃত্তির পরিচয় দেয় মাত্র।

---

* শঙ্করবিজয় ২৪ প্রকরণ।

(তিনি বৌদ্ধদিগকে তাড়ান নাই)

তাঁহার বিষয়ে দ্বিতীয় কুসংস্কার এই যে তিনি বৌদ্ধদিগকে এ দেশ হইতে দূর করিয়া দেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। শঙ্করবিজয় গ্রন্থের নির্ঘণ্ট পত্রে নয়ন নিক্ষেপ করিলেই জানিতে পারা যাইবে এইটী ভ্রমাত্মক সংস্কার। তিনি বৌদ্ধ জৈন মত নিরাকরণ করিয়া তন্মতাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে স্বমতে আনয়ন করেন। এই নবদীক্ষিত বৌদ্ধেরা তাঁহার শিষ্য দিগের পদসেবা প্রভৃতি কার্য্য করিত ও তাহাদিগের উচ্ছিষ্ট আহার করিত। জৈনেরা এই অবধি বণিক হইল, সৌগতেরা দাস হইল, বৌদ্ধেরা বন্দী অর্থাৎ স্তুতিপাঠক হইল। একথা সত্য, কিন্তু তিনি যেমন বৌদ্ধমত নিরাকরণ করেন তেমনি বৈষ্ণবমত শৈবমত সৌর মত কাপালিকমত বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড মত এবং ঔপনিষদিক সাংখ্যমতও নিরাকৃত করেন, অতএব তিনি বৌদ্ধদিগকে তাড়াইলেন কি রূপে? পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের যেমন প্রভুত্ব ছিল তাঁহার সময়ে তেমন ছিল না। তাঁহার সহিত বিচারে উহাদের বিলক্ষণ ক্ষতি হয় কিন্তু তিনি উহাদের তাড়াইলেন কই? আর যদিই তাড়াইলেন তবে তাহার পরে লোক আবার বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে যায় কেন?

(তাঁহা হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ-প্রচার হয় নাই।)

তিনি বৌদ্ধদিগকে তাড়ান নাই। বৌদ্ধেরা তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই নানাবিধ পৌত্তলিক উপাসনার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত ও হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ পৌত্তলিক উপাসনাপ্রবর্ত্তক পৌরাণিকগণই ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের পুনঃ সংস্থাপক। তাহাদের নিকট হইতেই আবার লোকে ব্রাহ্মণকে ভয় করিতে, ভক্তি করিতে, ভূদেব বলিয়া প্রণাম করিতে শিখে—তাহাদের দ্বারাই বিষ্ণু, শিব, দুর্গা প্রভৃতি বৈদিক অবৈদিক দেবতাদিগের উপাসনা প্রচারিত হয়। ইহার পর এই সকল পৌত্তলিক ব্রাহ্মণদিগকে বৈদিকধর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। আবার বৈদিকধর্ম্মের পুনঃ প্রচার হয়। সে প্রস্তাবও শঙ্করাচার্য্যের নহে। যখন বৈদিক ধর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আবার চলিতেছে, সেই সময়ে তিনি উপস্থিত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড হইতে উহাদিগকে জ্ঞানকাণ্ডে অধিকতর মনোযোগ দিতে আজ্ঞা করেন। ইহারই নাম দুষ্ট ব্রাহ্মণদমন।

(তিনি শৈবমত প্রচারক ছিলেন না।)

যাঁহারা মনে করেন শঙ্করাচার্য্য শৈবমত প্রচারক তাঁহারা একবার শঙ্করবিজয় খুলিয়া দেখিবেন। উহার নির্ঘণ্টপত্রেই পাইবেন "শৈবমত নিরাকরণম।" বাস্তবিকই শঙ্করাচার্য্যকে—শুদ্ধাদ্বৈত মতের পোষক অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী পুরুষকে—শৈবমতপ্রচারক বলিলে তাঁহাকে গালি দেওয়া হয় মাত্র।

(সংক্ষিপ্তার্থ।)

এতক্ষণ শঙ্করাচার্য্য কি ছিলেন না তাহাই দেখাইতেছিলাম। তিনি সমাজ-

সংস্কারক ছিলেন না। বৌদ্ধদিগকে তিনি তাড়ান নাই। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম তিনি পুনঃপ্রচার করেন নাই। শৈবমতের তিনি সংস্থাপক নহেন। তবে তিনি কি ছিলেন ? তাঁহার এত প্রভুত্ব কেন ? এত লোকে তাঁহাকে মানে কেন ? যে সকল মহৎকার্য্যের জন্য তাঁহার নাম ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য হওয়া উচিত এক্ষণে সেই সকলের কথঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। সবিস্তারে লিখিতে গেলে বিস্তর হয় এই জন্য সংক্ষেপে কয়েকটি সার কথা মাত্র বলিবার চেষ্টা করিব।

(তাঁহার যশের প্রধান কারণ বিদ্যা।)

তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রভুত্বের প্রধান কারণ তাঁহার বিদ্যা। অতি অল্প বয়সেই তিনি তৎকালপ্রচলিত সমস্ত সংস্কৃতগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং পাঠসমাপ্তির পূর্ব্বেই গুরুর আসনে উপবেশন করিয়া সমস্ত সহাধ্যায়ীদিগকে দুরূহ দুর্ব্বোধ শাস্ত্রসমূহের বিশদ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছিলেন। "চতুঃষষ্টি কলা, চতুর্দ্দশ বিদ্যা, সমস্ত বেদ, সূত্র ইতিহাস তাপনীয়, আগম, মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র সমস্ত বিষয়ে তিনি কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব পর্ব্বতে যেমন বালভানু, বিদ্যা অর্দ্রিমালায় তিনি তেমনি, ব্রহ্মাণ্ড গোলকীলকে তিনি ধ্রুবের ন্যায়, যজ্ঞবিদ্যায় যাজ্ঞবল্কের ন্যায়, (ইত্যাদি) উপবিষ্ট হইয়া তিনি শিষ্য দিগকে উপদেশ দিতেন।" ইহাতেও তাঁহার বিদ্যার পরিচয় দেওয়া হইল না। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ শাঙ্করভাষ্য পাঠ করিলে জানা যাইবে তাঁহার বিদ্যার পার ছিল না। ব্রাহ্মণগ্রন্থ, বৌদ্ধগ্রন্থ, জৈনগ্রন্থ, কাপালিক গ্রন্থ সমস্তই তাঁহার নখদর্পণ মধ্যে ছিল। যিনি এত লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন তিনি যে জগদ্বিখ্যাত হইবেন তাহাতে বিচিত্র কি ?

(২য়। রচনা।)

শঙ্করাচার্য্যের রচনা তাঁহার প্রতিপত্তির দ্বিতীয় কারণ। সরল মিষ্ট সুললিত পদবিন্যাস করত তিনি দুরূহ, দুর্ব্বোধ, অতি জটিল, শাস্ত্রসমূহের অতি কঠিন অতি সূক্ষ্ম অতি নীরস অংশ সকলের অতি বিশদ মূঢ়জনেরও সুবোধ্য অর্থ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন লেখনী ধারণ করিতেন বোধ হয় তাঁহার হৃদয় লেখনীর অনুসরণ করিত। ভাষা তাঁহার ভাব প্রকাশে কাঁপিত। যখন লেখনী ধরিতেন কোথাও যে বিশ্রাম করিতে হইত, ভাবিয়া ভাবসংগ্রহ করিতে হইত, মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিতে হইত, একেবারে বোধ হয় না। বোধ হয় অন্তঃস্থ বিদ্যাসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া তীব্রস্রোতে অজস্র লেখনী মুখে নির্গত হইত। কখন স্তুতি, কখন নিন্দা, কখন হৃন্মর্ম্মভেদী শ্লেষ বাক্য, কখন ভক্তি, কখন জটিল শাস্ত্রার্থ, সমান বেগে, সমান তেজে, সমান ওজস্বিতার সহিত বহির্গত হইত। শঙ্করাচার্য্যের মত কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে, প্রাচীন বলিয়া দূরীকৃত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার রচনা, তাঁহার ওজ-

স্বিনী লেখনী মুখনিঃসৃত বাক্য পরম্পরা, তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ শাঙ্কর ভাষ্য, কখনই বিস্মৃতিসমুদ্রে নিমজ্জিত হইবে না।

আচার্য্য শুদ্ধ নিজেই লিখিতে পারিতেন এমন নহে, তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যেও অনেকে তাঁহার অনুকরণ করিয়া ভাষাজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কেবল স্বয়ং অদ্বিতীয় লেখক নহেন, তিনি এক অদ্বিতীয় লেখক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। আনন্দ গিরি শ্রীধরস্বামী তাঁহার শিষ্য পরম্পরামধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। শুদ্ধ তাঁহার শিষ্যগণ কেন যে কেহ তাঁহার পর লেখনী ধরিয়াছেন সকলেই তাঁহাকে অনুকরণ করিতে গিয়াছেন কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার রচনা অনুকরণের অতীত।

(৩য়। বিচারপটুতা)

বিচারপটুতায় তাঁহার অপেক্ষা বড় অতি অল্প লোক আছেন। তিনি দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন অর্থাৎ ভারতবর্ষের নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া তত্তৎস্থানস্থ পণ্ডিতবর্গকে পরাস্ত করিয়া স্বমতগ্রহণ করাইয়াছিলেন। এই সকল পণ্ডিতদিগের মধ্যে সর্ব্বধর্ম্মবিরোধী চার্ব্বাক ও কাপালিক, হিন্দুধর্ম্মবিরোধী বৌদ্ধ, সৌগত, জৈন, হিন্দুধর্ম্মের উচ্চতর বেদধর্ম্ম বিরোধী পৌত্তলিক ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির উপাসক, বৈদিকদিগের মধ্যে জ্ঞানকাণ্ড বিরোধী কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয়ী মীমাংসক, জ্ঞান কাণ্ড আশ্রয়ীদিগের মধ্যে শুদ্ধাদ্বৈত মত বিরোধী সাংখ্যাদি। এই সমস্ত পণ্ডিত দিগকে স্বীয় মনীষা প্রভাবে যিনি জয় করিয়াছেন তিনি কি অদ্বিতীয় নহেন? তিনি হিন্দুমনে এমনি একটী শীল মোহর মারিয়া গিয়াছেন যে এখন আর শুদ্ধ সাংখ্যমত, শুদ্ধ পৌত্তলিক মত, দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায়ই সকলে অদ্বৈত ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া আপন২ মত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। পুরাণ, তন্ত্র, নূতন স্মৃতি, সর্ব্বত্র অদ্বৈত মতই চলিতেছে। যে পুরাণ সাংখ্যমতে লিখিত সেও শেষ বলে প্রকৃতি পুরুষ উভয়ে মিলিয়া অদ্বৈত ঈশ্বর। কেবল বঙ্গীয় নৈয়ায়িকেরা শঙ্করাচার্য্য হইতে আপনাদিগের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের বিলক্ষণ বাহাদুরী আছে।

(গ্রন্থ ও টীকার সংখ্যা)

শঙ্করাচার্য্য যে কত গ্রন্থ ও টীকা রচনা করিয়াছেন বলা যায় না। সকল এখনও ছাপা হয় নাই। বাদরায়ণ প্রণীত বেদান্ত সূত্রের তিনি ভাষ্য করেন। যদিও টীকা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তথাপি এই ভাষ্য টীকা নহে। এখানি শঙ্করাচার্য্যের নিজমত প্রচারের উপায়। সূত্রগুলি এমনি প্রহেলিকার ন্যায় যে, উহা হইতে যে যেরূপ ইচ্ছা অর্থ করিতে পারে। ঐ এক সূত্রমালা হইতে নানা দর্শনের নানা প্রস্থানের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ সূত্র হইতেই এক খানি বৈষ্ণবদর্শন ও পূর্ণপ্রজ্ঞ নামে আর একখানি দর্শন হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ঐ সূত্রগুলিকে দ্বার মাত্র করিয়া তাঁহার

গভীর অন্তর মধ্যে শিষ্যগণকে প্রবেশ করাইয়াছেন। তাঁহার প্রণীত ভগবদ্গীতার ভাষ্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। আনন্দগিরি সেই ভাষ্যের টীকা করিয়াছেন এবং শ্রীধর স্বামী তাহার সংক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহার সময়ে যে সকল উপনিষৎ চলিত ছিল, শঙ্করাচার্য্য সে সমস্তেরই টীকা করিয়াছিলেন। অনেক উপনিষৎ তাঁহার পরে লিখিত, ইহাতে তাঁহার টীকা নাই। অনেক উপনিষদের টীকা তাঁহার লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধ কিন্তু বাস্তবিক সে গুলি জাল। শঙ্করাচার্য্য সমস্ত বেদের টীকা করেন, সেটী মিথ্যা কথা। তাঁহার জ্ঞানকাণ্ডে প্রয়োজন, তিনি জ্ঞানকাণ্ডেরই টীকা লিখিয়াছেন। সমস্ত বেদের ব্যাখ্যা তাঁহার অনেক পরে লিখিত হয়।

(স্বমত প্রচার)

শুদ্ধাদ্বৈত মত প্রচারই শঙ্করাচার্য্যের প্রভুত্বের প্রধান কারণ—একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ইত্যাদি উপনিষৎ বাক্যের তিনি অদ্বৈত মতে অর্থ করেন। তাঁহার মতে জগতে যা কিছু দেখি সমস্তই ভ্রম, তুমি, আমি, বাড়ী, ঘর, নদ, নদী পর্ব্বতাদি সমস্তই ভ্রম। কেবল এক ঈশ্বরই সত্য। তিনিই সব তিনি ভিন্ন আর কিছুই সত্য নহে। তবে আমাদের যে তুমি আমি জ্ঞান হইতেছে সে অধ্যাস (যেটা যে জিনিস নয় সেই টাতে সেই জিনিস বলিয়া জ্ঞান।) শঙ্কর এই মত কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে ব্রাহ্মণমণ্ডলীমধ্যে প্রচার করেন। লোকে বৈষ্ণবাদি ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার মত গ্রহণ করে। তিনি কোন্ কোন্ মত খণ্ডন করেন পরে লিখিত হইবে।

(মঠ স্থাপন)

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে শঙ্করাচার্য্য কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী—তিনি বহুসংখ্যক লোককে সন্ন্যাসী করেন। পূর্ব্বকালে সন্ন্যাসী ছিল কি না, ঠিক বলা যায় না। মনুতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলিয়া এক দল লোক আছে। তাহারা বাল্যকাল হইতে গুরুর আলয়ে বাস করিয়া লেখা পড়া ও ধর্ম্ম কর্ম্ম করিত—তাহারা বিবাহ করিত না কিন্তু তাহারা সন্ন্যাসী ছিল না। চতুর্থ আশ্রমই সন্ন্যাসাশ্রম। ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ আশ্রম কাটাইয়া লোকে সন্ন্যাসী হইত যোগাদিকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত। শঙ্করাচার্য্যের কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে একটি মত ক্রমে প্রবল হইতেছিল যে "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" যে দিন সংসারে বিরক্তি হইবে সেই দিন হইতেই সন্ন্যাসী হইতে পারিবে। শঙ্করাচার্য্য এই মত অনুসারে ব্রহ্মচারী অবস্থাতেই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতেই সন্ন্যাসী মোহান্তের কিছু বাড়াবাড়ি। এখানকার সকল সন্ন্যাসীই শঙ্করকে আপনাদের গুরু বলিয়া স্বীকার করে। শঙ্করাচার্য্য আপন শিষ্য সন্ন্যাসীদিগের জন্য ভারতী নামক সম্প্রদায় স্থাপন করেন। অনেকে বলেন তিনি গিরি পুরী ভারতী—তিন সম্প্রদায়ের

মোহান্তদিগেরই সংস্থাপন, শঙ্করবিজয়ে কিন্তু আমরা ভারতী ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাই না।

এই ভারতী সম্প্রদায়ের মোহান্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তারকেশ্বরের মোহান্ত গিরি, কিন্তু তাঁহার দশনামার মধ্যে দুই, তিন জন ভারতী আছেন। শঙ্করাচার্য্য স্বশিষ্য সন্ন্যাসীদিগের জন্য তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে শৃঙ্গগিরি নামক স্থানে মঠস্থাপন করেন। ঐ মঠ এখন সিংহাবি নামে খ্যাত। কাঞ্চী নগরে তাঁহার দুই পুরী বা মঠ ছিল। এখন আছে কি না বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্য কি ছিলেন কিসের জন্য তাঁহার এতমান্য এক প্রকার উক্ত হইল। তাঁহার জীবনচরিত বিষয়ে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শৈশব সহচরী।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিশোধ।

রাত্রি একপ্রহরহইয়াছে—এখনও কুমুদিনী সেই বাতায়নে বসিয়া নীরবে সেই প্রান্তরপার্শ্বস্থিত অট্টালিকার প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছেন। সেই অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে যে আলো জ্বলিতেছিল, তাহাই দেখিতেছিলেন, যে কক্ষে পাখা দুলিতেছিল, ক্রমশঃ হইয়া সেই কক্ষ প্রতি চাহিয়াছিলেন। চাহিয়া চাহিয়া এক একবার দৃষ্টিলোপ হইতে লাগিল। আবার চক্ষু মুদিয়া হস্তদ্বারা তাহা বিমর্দ্দিত করিবাতে, দৃষ্টির পুনঃ সঞ্চার হইতে লাগিল। খড়খড়ির অল্পায়তন ছিদ্রপথে অধিকক্ষণ দৃষ্টি চলিল না—মধ্যে মধ্যে লোপ হইতে লাগিল, উঠিয়া কুমুদিনী প্রাসাদোপরি যাইলেন। উপরে নীল নভোমণ্ডলে একখানি বৃহৎ রূপার থালের ন্যায় চন্দ্র উঠিয়াছে, পশ্চাতে নৌকাভরণা যমুনার নীলবক্ষে চাঁদের আলো ঝিকমিক করিতেছে, আর অতি দূরে বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যপোতের মাস্তুল সকল নীলাকাশে অস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। সম্মুখে মহানগরীর বিচিত্র প্রস্তর রেইলপরিবেষ্টিত অসংখ্য সৌধমালা নববসন্তপবনস্পর্শলোলুপ নাগরিকগণে পরিপূরিত হইয়া চাঁদের আলোয় হাসিতেছে। রাজপথ ক্ষণে ক্ষণে বিরলমানব হইতেছে, ভ্রমণকারিগণ ক্লান্ত হইয়া অলসাবেশে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে—প্রশস্ত তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে চন্দ্রালোকে বসিয়া এক এক দল যুবক স্থানে স্থানে গল্প করিতেছে। কুমুদিনী প্রাসাদোপরি উঠিয়া এসকল কিছুই দেখিতেছিলেন না। অবিচলিতচিত্তে স্থিরনেত্রে সেই অট্টালিকার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। "একটি কক্ষে

পাখা দুলিতেছিল, হঠাৎ পাখা থামিল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে কক্ষে মনুষ্যের অবস্থিতির চিহ্ন পাওয়া গেল না—তথাচ কুমুদিনী প্রাসাদোপরি বসিয়া স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন, ইতিমধ্যে বিনোদিনী দৌড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "দিদি শিগ্‌গির আয়—রজনীকান্ত আসিয়াছে—জ্যেঠাইমার সঙ্গে কথা কহিতেছে—" কুমুদিনী ইহা শুনিবামাত্র অতি দ্রুত উঠিবার উদ্যম করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন "তুমি চল আমি যাচ্চি।" ইহা শুনিয়া বিনোদিনী বলিল, "ও কি দিদি—ও কি রকম—সে আমাদের ভগিনীপতি—অনেক দিন পরে আসিয়াছে, তার সহিত দেখা করিতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না?" কুমুদিনী উত্তর করিলেন "হয় বই কি—তুমি চল না আমি যাচ্চি—" পুনরায় বলিলেন, "রজনী কি তোমার আমার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন?" বিনোদিনী উত্তর করিল "না, তোমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই—তবে আমার সহিত দেখা হওয়াতে অনেক কথা কহিলেন, তার পর জ্যেঠাইমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, আমি সেই অবসরে তোমায় ডাকিতে আসিলাম। দিদি শিগ্‌গির এস—" এই বলিয়া বিনোদিনী অন্তর্হিত হইল। কুমুদিনী যখন একাকিনী হইলেন তখন অতি দ্রুতপদে উঠিয়া প্রাসাদ হইতে নিম্নে যে কক্ষে রজনী আছেন—সেই কক্ষের নিকট আসিয়া দ্বারের অন্তরালে লুকাইয়া যে মূর্ত্তি দিবারাত্র ভাবিয়া থাকেন সেই মূর্ত্তি অনিমিষলোচনে দেখিতে লাগিলেন। কি দেখিলেন, যেমন বর্ষার মেঘাকাশে পূর্ণচন্দ্র, কিঞ্চিৎ ম্লান, অথচ নয়নরঞ্জন, স্নিগ্ধকর বটে। কোন গভীর চিন্তামেঘে তাহার মুখ চন্দ্রমার উজ্জলতা ঢাকিয়া রাখিয়াছে। দেখিতে দেখিতে হৃদয় উছলিয়া উঠিল, নয়ন বারিতে পরিপূরিত হইল, আর দেখিতে পান না, অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া আবার দেখিতে লাগিলেন। এবার রজনী পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না—কুমুদিনীর কি যন্ত্রণা হইতে লাগিল, কোন দিকে দাঁড়াইলে ভালরূপে দেখিতে পাইবেন স্থির পান না। রজনীকান্তকে ত অনেকবার দেখিয়াছেন, এবার এত দেখিতে সাধ কেন? দেখে সাধ মিটে না কেন? অন্ধকারে কক্ষমধ্যে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। একস্থানে কতিপয় দ্রব্যাদি একত্রিত থাকাতে কুমুদিনী তাহাতে পা বাঁধিয়া পড়িয়া গেলেন, তৎসঙ্গে ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদির ঝনঝন শব্দ হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ আলো লইয়া কুমুদিনীর মাতা, বিনোদিনী ও রজনীকান্ত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন কুমুদিনী লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া ভূমি হইতে উঠিয়া মাথায় কাপড় টানিতে টানিতে পলাইয়া যাইতেছে তাহা দেখিয়া রজনী সে কক্ষ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। কুমুদিনী লজ্জিত

এবং অপ্রতিভ হইয়া ছাদের উপর গিয়া বসিলেন। কাঁদিতে লাগিলেন, কেন তাহা তিনি স্বয়ং বুঝিতে পারিলেন না। অধিকক্ষণ বসিতে পারিলেন না, ব্যস্ত হইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে নীচে আসিয়া দেখিলেন বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া বিনোদিনী ও রজনীকান্ত চন্দ্রালোকে যমুনার শোভা দেখিতে দেখিতে কথোপকথন করিতেছিল, বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাকরি কর?"

র। ওকালতি করি।

বি। কত টাকা পাও?

র। কিছু না।

বি। তবে কি রকম চাকরি?

র। এ নূতন রকম চাকরি।

বি। ও গাড়ি খানা কার?

র। আমার।

বি। টাকা দিয়া কিনিয়াছিলে?

র। নয় ত কি।

বি। টাকা কোথায় পেলে?

র। কুড়িয়ে পেয়েছি।

বি। ছি তুমি চোর।

র। কিসে।

বি। যে টাকা তুমি কুড়াইয়া পাইয়াছ সে টাকা কি তোমার?

র। এইবার হারি মানিলাম।

দুইজনে ক্ষণেককাল নিস্তব্ধ রহিল, কেহ চাঁদের পানে চাহিয়া কেহ যমুনার প্রতি চাহিয়া। কিয়ৎক্ষণের পর বিনোদিনী আবার বলিল, "তুমি কি আর বিবাহ করিয়াছ?" রজনীর হঠাৎ মুখকান্তি পরিবর্ত্তিত হইল, পরে ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন,

"না, করবো।"

বি। কাহাকে?

র। তা পরে জানিবে।

বি। মেয়েটির বয়স কত?

র। তোমার বয়স।

বি। দেখিতে কেমন?

র। বড় সুন্দরী।

বি। এমন কেউ কখন দেখিনি কি?

র। কেউ কখন দেখিনি।

বি। তুমি তাহাকে দেখিয়াছ কি?

র। দেখিয়াছি, দেখিবামাত্র ভাল বাসিয়াছি।

বি। আর সে তোমাকে ভাল বাসিয়াছে?

র। তা কেমন করে জানব।

বি। ভাল, এমন অদ্ভুত সুন্দরী খুঁজে খুঁজে কোথায় পাইলে?

র। তোমাদের গ্রাম হইতে, সুবর্ণপুর হইতে।

বি। আমাদের গ্রাম হইতে? কার মেয়ে, নাম কি?

র। শিবনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা, নাম বিনোদিনী।

ইহা শুনিবামাত্র বিনোদিনী লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল। পরে বেগে সেখান হইতে পলায়ন করিল। তাহার মলের ঝনঝনাৎ শব্দ প্রতিকক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রজনীকান্ত

হাসিতে হাসিতে একবার বলিলেন, "দৌড়িও না, পড়ে যাবে।" তৎপরে সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

আর কুমুদিনী ? কুমুদিনী কোথায় ? বারেণ্ডার সন্নিকটে একটি কক্ষদ্বারের অন্তরালে প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া এই কথোপকথন শুনিতেছিলেন, হৃদয়াঘাতে ব্যথিত হইয়া, হস্তদ্বারায় হৃদয় চাপিয়া, স্থিরনেত্রে রজনীকান্তের প্রতি চাহিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন। রজনীকে কত সুন্দর দেখিতেছিলেন। তাঁহার কথা কত মধুর বোধ হইতে ছিল। আর বেহায়া বিনোদিনীকে কি কুৎসিত দেখিয়াছিলেন ? কি নির্লজ্জার ন্যায় রজনীর সহিত কথা কহিতেছিল।

কুমুদিনীর মনে পড়ে কি না পড়ে জানি না। কিন্তু আমাদের বিলক্ষণ মনে আছে, এইরূপ আড়ি পাতিয়া রজনীকান্ত এক দিবস রাত্রে কুমুদিনীর ও শরৎকুমারের প্রেমালাপ শুনিয়াছিলেন। সেই জ্যোৎস্নাময়ী উদ্যানের স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট এবং চন্দ্রালোকপ্রতিবিম্বিত সরোবরের সোপানে বসিয়া যখন দুইজনে প্রেমালাপ করিতেছিলেন, তখন নিকটের একটি কামিনী বৃক্ষের ডাল অবলম্বন করিয়া রজনীকান্ত তাঁহাদিগের কথোপকথন শুনিয়াছিলেন। কুমুদিনী তাহাতে কত রাগ করিয়াছিলেন, কত বিরক্ত হইয়াছিলেন, রজনীকে রূঢ়বাক্য দ্বারা কত ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এমন কি রজনীকে কাঁদাইয়া ছাড়িয়াছিলেন। আর আজ তিনি স্বয়ং কি করিলেন ? সংসারের এইরূপ গতি।

রজনীকান্ত বারাণ্ডা হইতে যাইয়া কুমুদিনীর মাতার নিকট বিদায়প্রার্থনা করিলেন। কুমুদিনীর মাতা বলিলেন, "বাবা রোজ সকালে বিকালে এক এক বার দেখা দিও—আর প্রত্যহ এখানে আহার করিও।" রজনীকান্ত দেখা দিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু প্রত্যহ আহার করিতে সম্মত হইলেন না—বলিলেন, "আমার প্রত্যহ কাচারি যাইতে হয়, কোন দিন দশটার সময়, কোন দিন দুই প্রহরের সময়। প্রত্যহ এখানে আহার করা হইয়া উঠিবে না, এক এক দিন আহার করিব।" এই বলিয়া আপন গৃহাভিমুখে চলিলেন। কুমুদিনীও আপনার শয়নকক্ষের গবাক্ষে আসিয়া বসিয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি রাজপথ ত্যাগ করিয়া প্রান্তর দিয়া উহার দক্ষিণপার্শ্বের একটি অট্টালিকার দিকে যাইতেছেন। অতি মৃদু গমনে যাইতেছেন, প্রান্তর পার হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আর তাঁহাকে দেখা গেল না—কিয়ৎকাল বিলম্বে অট্টালিকার বাতায়নপথ দিয়া যে দীপমালা দেখা যাইতেছিল একে একে তাহা সকলই নির্ব্বাণ হইল। তৎপরে গবাক্ষগুলি কে আসিয়া বন্ধ করিল, জনমানবের আর চিহ্ন পাওয়া গেল না—কেবল মাত্র সুন্দর শ্বেত অট্টালিকাটি চন্দ্রালোকে আরো শ্বেত দেখাইতেছিল, কিন্তু কুমুদিনীর হৃদয়ও অন্ধকারময় হইল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দানপত্র।

রজনীকান্ত কুমুদিনীকে কত ভাল বাসিতেন,কুমুদিনী ভিন্ন আর কেহ তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কুমুদিনী তাঁহার একমাত্র চিন্তা ছিল, কুমুদিনী প্রতিমার স্বরূপ তাহার হৃদয়ে বিরাজ করিত—কিন্তু যে দিবস জানিতে পারিলেন যে তাঁহা হইতে শরৎকুমার কুমুদিনীর অধিক প্রিয়তম সেই দিবস তাঁহার হৃদয়ে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল। সে বিপ্লবের ফল দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যে কুমুদিনী প্রতিমা তাঁহার হৃদয়মন্দির হইতে বিসর্জ্জন করিবেন। কতদূর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন তাহা আমরা জানি না কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে যে সে প্রতিজ্ঞায় সফল হইয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ এই যে যাহাকে দেখিবার জন্য, যাহার সহিত কথা কহিবার জন্য, রজনী সতত নানাপ্রকার কৌশল কল্পনা করিতেন, আজ বহুদিবসের পর তাহার সহিত দেখা হইল। দেখা হইলে রজনীকান্তের কি কোন বাহ্যিক চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছিল? কিছু না। তিনি কি "কুমুদিনী" বলিয়া একবার একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না। মুক্ত বাতায়নে একাকিনী বসিয়া কুমুদিনী তাহাই ভাবিতেছিলেন। ভাল, রজনী কি একবার মুখের কথা খুলিয়া একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না? একবার কুমুদিনী বলিয়া ডাকিতে প্রবৃত্তি হইল না? রজনী যে তাঁহাকে ভাল বাসিতেন তাহা মিথ্যা কথা। রজনী তাঁহাকে কখন ভাল বাসিতেন না, তিনিই কেবল রজনীকে ভাল বাসিয়াছেন, কিন্তু সে ভালবাসার প্রতিদান হইল না, এখন তাঁহার জীবন অন্ধকার বিজন মরুভূমির ন্যায়। এ আঁধার জীবনাকাশে একমাত্র তারা রজনীকান্ত, এ আঁধার বিজন অরণ্যে এক মাত্র আলো রজনীকান্ত। কিন্তু সে আলো অতি দূরে,কখন তাঁহার জীবন আলোকময় করিবার আর সম্ভাবনা নাই। দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের মরীচিকার ন্যায় অতিদূরে একবার জ্বলিতেছে একবার নিবিতেছে। কুমুদিনীর নয়নে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "হা বিধাতা, কি করিলে,কেন আমার এ দশা করিলে, আমি কি পাপ করিয়াছি যে আমার দর্প চূর্ণ করিলে, আমাকে রজনীকান্তের ক্রীত দাসীর ন্যায় হইতে হইল! রজনী হাসিলে আমি হাসিব, রজনী কাঁদিলে আমি কাঁদিব। রজনীকান্তের প্রতি কেন আমার এ প্রকার ভাবান্তর জন্মিল,মনের এ দুর্দ্দমনীয় বেগ কি কখন সম্বরণ করিতে পারিব না—বিধাতা তুমিই জান।" বলিতে বলিতে কুমুদিনীর হঠাৎ ভাবান্তর হইল, রজনীকান্তের মুখ মনে পড়িয়া ভাবান্তর হইল,মেঘাবৃত শরতের শশীর ন্যায় তাহার হাসি মনে পড়িয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ঈশ্বরকে ডাকিয়া কি রজনীকান্তের অকল্যাণ করিলেন, মনে

মনে বড় যন্ত্রণা হইল, হৃদয় উছলিয়া উ-ঠিল, আবার নয়নে ধারা বহিতে লাগিল। রজনীকান্তের ললাটে একটি শুষ্ক ক্ষত চিহ্ন দেখিয়াছিলেন। ভাবিলেন, কিসের ক্ষত? আহা, কত কষ্ট পাইয়াছে, কে তাহাকে সে সময়ে যত্ন করিয়াছে? কে তাহাকে আমার বলিয়া যন্ত্রণা নিবারণ জন্য আদর করিয়াছে? এ জগতে যে রজনীকে আমার বলে এমন কেহ নাই। কেবল এই হতভাগিনী চিরদুঃখিনী মনে মনে আমার বলিয়া থাকে। এই সুখ-ময় চিন্তায় নিমগ্না হইয়া রহিলেন। ক্রমে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। কুমুদিনী সংজ্ঞাহীনা হইয়া সেই মুক্ত বাতায়নে বসিয়া আছেন. নিদ্রার আকর্ষণ নাই; শয্যা একবারও স্পর্শ করেন না। ক্রমে নিশানাথ মধ্যগগন অতিক্রম করিয়া পশ্চিম গগনে আসিলেন। হঠাৎ কুমুদিনীর চিন্তা ভঙ্গ হইল, বাতায়নের নিম্নে মনুষ্যকণ্ঠ শুনিলেন। দেখিলেন জ্যোৎস্নাবিধৃত রাজপথের পার্শ্বে তাঁহার গবাক্ষের নিম্নে একটি বকুলবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া দুই ব্যক্তি কথোপকথন করি-তেছে। কুমুদিনী সরিয়া দাঁড়াইলেন, অন্য বাতায়নের অন্তরালে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, একজন বাঙ্গালি, অপর সেই দেশীয়—যে ব্যক্তি বাঙ্গালি সেই ব্যক্তি কুমুদিনীর গবাক্ষ প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হিন্দুস্থানীকে চুপিং কি বলিতেছে। কুমুদিনীর বড় সন্দেহ হইল, ভাবিলেন এই দুই ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতি অবশ্য কোন দুরভিসন্ধিতে এখানে দাঁড়াইয়া আছে। তজ্জন্য গৃহস্থ সলককে জাগ-রিত করা উচিত বিবেচনা করিয়া অতি ব্যস্ত হইয়া চলিলেন। নিকটে এক কক্ষে বিনোদিনী শয়ন করিতেন, অতি দ্রুত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, দেখি লেন মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া বিনোদিনীর কক্ষ আলোকিত করিয়াছে। সেই অস্পষ্ট আলোকে কক্ষের সমুদায় দ্রব্যাদি দৃষ্ট হইতেছে। এক পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র পালঙ্কে বিনো-দিনীর শয্যা রহিয়াছে কিন্তু বিনোদিনী তাহাতে নাই। আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া কুমুদিনী কক্ষের চতুর্দ্দিক অবলোকন ক-রিতে লাগিলেন। দেখিলেন সেই কক্ষের একটি বাতায়নে কুমুদিনীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া প্রান্তরপার্শ্বে রজনীকান্তের অমল শ্বেত অট্টালিকার দিকে মুখ ফিরাইয়া বিনোদিনী বসিয়া আছে। অতি মৃদুস্বরে কুমুদিনী ডাকিলেন, "বিনোদ।" বিনো-দিনী চমকিয়া উঠিলেন, লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যেন কি কুকর্ম্ম করিয়াছেন। কুমুদিনী তাহা লক্ষ্য না করিয়া, তাহার হস্ত ধরিয়া আপ-নার ঘরের বাতায়নের নিকট আনিয়া চুপি চুপি বলিলেন দেখ, বকুলতলায় কারা দাঁড়াইয়া। বিনোদিনী কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কিন্তু কুমুদিনী দেখিলেন অনতিদূরে রাজপথে সেই দুই ব্যক্তি হন্ হন করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

বিনোদিনী আপনার কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। কুমুদিনী একাকিনী বাতায়নে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন, তন্দ্রা আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে হঠাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিল। কক্ষমধ্যে কোন প্রকার শব্দেতে নিদ্রা ভাঙ্গিল দুই এক বার খুট খুট শব্দ শুনিলেন, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, বারেণ্ডার দিকের একটি দ্বার কে খুলিয়াছে, এবং তজ্জনিত অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে দেখিলেন এক ব্যক্তি মুখ আবৃত করিয়া তাঁহার একটি বাক্স খুলিতেছে। কুমুদিনী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পুনঃ২ চীৎকার করাতে হরিনাথ বাবু এবং অন্যান্য পৌরজন দৌড়িয়া আসিল, কিন্তু চোরকে কেহ দেখিতে পাইল না, কেবল মাত্র দেখিল বারেণ্ডায় একখানি মই লাগান রহিয়াছে। আলো আনিয়া হরিনাথ বাবু কক্ষমধ্যে অনুসন্ধান করিলেন, দেখিলেন, কুমুদিনীর বাক্স খোলা রহিয়াছে কিন্তু অলঙ্কার অথবা অন্যান্য দ্রব্যাদি কিছুই অপহৃত হয় নাই। কোন পথ দিয়া চোর গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল আলো লইয়া তাহা অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, বারেণ্ডার নিম্নে মইয়ের নিকট একখানি কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। আলো দ্বারা তাহা পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কুমুদিনীকে ডাকিয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কাগজখানি কি তুমি জান? ইহা কি তোমার বাক্সের ভিতর ছিল?" কুমুদিনী উত্তর করিলেন "এ খানি শরৎকুমারের দানপত্র, ইহা আমার বাক্সের ভিতর ছিল।" এবং কি প্রকারে উহা পাইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে সমুদায় বৃত্তান্ত তাঁহার পিতাকে অবগত করাইলেন। হরিনাথ বাবু হাসিয়া বলিলেন "তবে শরৎকুমারের বিষয় শরৎকুমারের আছে, রতিকান্তের নহে।" কুমুদিনী উত্তর করিলেন, দানপত্র যখন রেজিষ্টরি হয় নাই, এবং রতিকান্তের হস্তগত হয় নাই তখন শরতের আছে বই কি।"

হরিনাথ বাবু কুমুদিনীর কৌশলে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "কুমু, তুমি আজ বালস্বভাব শরৎকে রক্ষা করিয়াছ, যদি শরৎ তোমার পরামর্শে সকল কার্য্য করে তবে তাহার বিপদসম্ভাবনা নাই।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে দানপত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া অগ্নিসংস্পৃষ্ট করিলেন। এই বৃত্তান্ত পৌরজন সকলে জানিতে পারিল।

হরিনাথ বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস হইল এ চোর রতিকান্ত বাঁড়ুয্যে।

কুমুদিনীর দৃঢ় বিশ্বাস হইল এ চোর শরৎকুমার। তজ্জন্য মনে মনে বড় যন্ত্রণা হইতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যমুনার জলে।

পরদিবস অপরাহ্ণে হরিনাথ বাবু কুমু-

দিনী ও তাহার প্রসূতিকে ডাকিয়া নির্জ্জনে বলিলেন "কুমুদিনি, তোমার স্মরণ আছে বোধ হয়, যে আমি পুনরায় সংসার আশ্রমী হইয়াছি কেবল তোমার জন্য। তুমি ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় সন্তান নাই; তোমার সুখসাধন আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য; তুমি বাল্যকালে বিধবা হইয়াছিলে, আমি সেই দুঃখে উদাসীন হইয়াছিলাম, পরে তুমি বিবাহ করিতে স্বীকৃত হওয়াতে আমি পুনরায় সংসারী হইয়াছি, কিন্তু আজ প্রায় ছয় মাস অতীত হইল, তথাচ তোমার বিবাহ দিতে পারিলাম না। আমি দিন দিন ক্ষীণ হইতেছি—আর অল্পদিন বাঁচিব, তোমায় এ অবস্থায় ত্যাগ করিয়া যাইতে হইলে বড় কষ্টে মরিব, অতএব—"

কুমুদিনী অতি কাতরস্বরে বলিলেন, "বাবা, তুমি যে আমাকে কখন ত্যাগ করিয়া যাইবে, তাহা স্বপ্নেও মনে আসে না। তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইলে তার পর আর আমার কি সুখ থাকিবে, তাহলে কি আমি আর বাঁচিব।" হরিনাথ বাবু উত্তর করিলেন, "যাক আমার মৃত্যুর কথা উত্থাপন করিয়া তোমাকে কষ্ট দিব না—এক্ষণে আমি তোমার বিবাহ দিব স্থির করিয়াছি। তোমার ন্যায় সুবোধ মেয়ে যে পিতৃআজ্ঞা অবহেলন করিবে তাহা আমার বোধ হয় না—আগামী কল্য সুবর্ণপুর যাত্রা করিব, সেই স্থানে বিবাহ হইবে—আমি পাত্র স্থির করিয়াছি, তোমরা প্রস্তুত হও। কুমুদিনি, আমায় সুখী কর।

কুমুদিনী বঙ্গীয় কুলকামিনী; বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপিত হইলে লজ্জা পাইতে হয়, সুতরাং লজ্জায় অবনতমুখী হইলেন। পরে হরিনাথ বাবু তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কুমুদিনী আপনার কক্ষে যাইয়া সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যায় মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কত দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন, যাহাকে মনেমনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তাহাকে জন্মের মত হারাইলেন, আর কখন তাহাকে মনে স্থান দিতে পারিবেন না, তাহার চিন্তা এক্ষণ হইতে পাপ সংস্পৃষ্ট! তাঁহার জীবনের একমাত্র সুখ সেই রজনীকান্তের চিন্তা, আজ হইতে তাহা বর্জ্জন করিতে হইল, কাহার জন্য? শরৎকুমারের জন্য—পূর্ব্বরাত্রে তাঁহার পিতার কথার আভাষে কুমুদিনীর নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল, যে শরৎকুমারকে তিনি আপন জামাতা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু শরৎকুমার তাঁহার স্বামী হইলে তিনি বড় অসুখী হইবেন। পিতার উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইবে, এ কথা পিতাকে কেমন করিয়া জানাইবেন। বঙ্গীয় কুলকামিনীদিগের বিবাহ সম্বন্ধে মতামত দিবার ত কোন অধিকার নাই, কেবল মাত্র কাঁদিবার অধিকার আছে। কুমুদিনী কাঁদিতেই লাগিলেন। রজনীকান্তের মুখ মনে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, আর বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদনকে ডাকিতে লাগি-

লেন। প্রায় সন্ধ্যা অতীত হইল, পাছে কেহ তাঁহার মনোবেদনা জানিতে পারে, এই জন্য কুমুদিনী চক্ষু মুছিয়া গৃহকার্য্যে নিযুক্তা হইলেন। বিনোদিনী একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি তোমার মুখ ভার, চক্ষু ফুলেছে কেন? কি হইয়াছে?—" কুমুদিনী উত্তর করিলেন, "অসুখ হইয়াছে।" কিন্তু তৎপরেই গামছা লইয়া তাঁহাদের বাটীর পার্শ্বে যমুনাতীরে যে একটি গোপনীয় ঘাট আছে, সেইঘাটে গাত্রপ্রক্ষালন করিতে গেলেন, আগ্রীব নিমজ্জিতা হইয়া যমুনার জলে আঁধার আকাশে একমাত্র তারার ন্যায় ভাসিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা তিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হওয়াতে যমুনার অপর তীর অন্ধকারময় হইল। কুমুদিনী চিবুক পর্য্যন্ত জলে ডুবাইলে তাঁহার বোধ হইল, যেন অন্ধকারময় অনন্তসমুদ্রে ভাসিতেছেন। চতুর্দ্দিকে কেবল বারি নিঃশব্দে অন্ধকারে ছুটিতেছে। তিনি একাকিনী যেন সেই অকূলসমুদ্রে অন্ধকারে ভাসিতেছেন, চারিদিকে বারিরাশি উছলিতেছে। ভাবিলেন, আমার জীবন এইরূপ আঁধার অনন্তসমুদ্র, কতদিনে যে ইহা শেষ হইবে তাহা জানি না। দূরে অন্ধকারে যমুনার বক্ষে একটি আলো জ্বলিতেছিল; কোন জলযানে উহা জ্বলিতেছিল। কুমুদিনী ভাবিলেন, ও আলোটি কেন জ্বলিতেছে, আমার জীবন সমুদ্রে যে একটি মাত্র আলো জ্বলিতেছিল, তাহা আজ নির্ব্বাণ হইয়াছে, ওটি জ্বলিতেছে কেন? দেখিতে দেখিতে সে আলোটি নিবিয়া গেল। কুমুদিনী চমকিত হইলেন, হৃদয় অন্ধকারময় হইল, এই সামান্য ঘটনাটি রজনীকান্তের অমঙ্গল স্বরূপ ভবিষ্যৎ বাক্য বলিয়া বিশ্বাস হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন কিন্তু সেই আলো আর জ্বলিল না। ভগ্নহৃদয়ে যমুনার বারিরাশির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অনতিদূরে জলের ভিতরে একটি মৃদু আলো দেখিয়া উৎসাহান্বিতা হইলেন। কৃষ্ণা যামিনীর নীল নভোমণ্ডলে উজ্জ্বল সান্ধ্য তারার প্রতিবিম্ব যমুনার কালো জলে ঝিকমিক করিতেছে, দেখিয়া হৃদয় কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইল, অতি মৃদু মৃদু স্বরে বলিতে লাগিলেন "বালাই, কেন আমি অকারণে রজনীকান্তের অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছিলাম!" বলিতে বলিতে আর সে প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন না। উপরে চাহিয়া দেখিলেন একখানি কাল মেঘ আসিয়া সেই সন্ধ্যা তারাকে আবৃত করিয়াছে। দেখিয়া কুমুদিনীর হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়া গেল—ভাবিলেন প্রকৃতি ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার রজনীকান্তের ভবিষ্যৎ অমঙ্গল তাঁহাকে দেখাইতেছে। নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারা বহিয়া যমুনার জলে পড়িতে লাগিল। অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিলেন। ঘাটের সোপানাবলীতে মনুষ্য পদশব্দ শুনিয়া হস্তদ্বারা চক্ষু মুছিতে মুছিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি একখানি গামছা কাঁধে করিয়া জলে

নামিবার উপক্রম করিতেছে। সে জলে নামিল। তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল, উভয়ে উভয়কে চিনিলেন। একজন বলিয়া উঠিলেন "কুমুদিনি" অপর মনে মনে বলিল "রজনী।" আগন্তুক ক্ষণেক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইলেন। তৎপরে আস্তে আস্তে জল হইতে কূলে উঠিয়া গেলেন। পরে সোপানাবলী আরোহণ করিতে লাগিলেন। কুমুদিনীর হৃদয় উচ্ছলিতে লাগিল, ইচ্ছা হইল একবার তাঁহাকে স্পর্শ করেন। একবার তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মনোবেদনা সকল প্রকাশ করেন। নিষ্ঠুর রজনীকান্ত আস্তে আস্তে প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানে উঠিতে লাগিলেন। কুমুদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধকারে রজনীকান্তকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন "যাও, প্রাণনাথ, যাও। এ অভাগিনীর সংস্পর্শে আসিও না। যাও প্রাণেশ্বর। তোমার পদে যেন কখন কুশাঙ্কুর না বিঁধে। কখন নাইতে যেন মাতার কেশ না ছিঁড়ে—তুমি চিরজীবী হও—আবার কোন মনের মত সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারী হইয়া যেন সুখী হও। কিন্তু আমায় চিরদুঃখিনী করিলে। আমার এ কি হইল।—" অবিশ্রান্ত নয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল, সেই আঁধার জলরাশির মধ্যে আগ্রীব নিমজ্জিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কূলে কুক্কুরের কলরব শুনিতে পাইয়া দেখিলেন, জলের নিকটে একটি বিড়ালের ন্যায় ছোট বিলাতী কুক্কুরকে একটী বৃহৎ দেশী কুকুর তাড়া করিয়াছে। দেখিয়া চিনিলেন সে ছোট কুক্কুরটি রজনীকান্তের। অতি দ্রুত তীরে উঠিয়া সেই কুক্কুরটিকে বুকে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু দেশী কুক্কুর তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হওয়াতে—কুমুদিনী দৌড়িতে দৌড়িতে আর্দ্রবসন জন্য সোপান হইতে পড়িয়া গেলেন, বড় আঘাত হওয়াতে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ পরে উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল হইলেন না। তৎপরে কে আসিয়া হস্তধারণ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। তাহার হস্তের উপর নির্ভর করিয়া কুমুদিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন রজনীকান্ত ভুবনমোহন রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া রহিয়াছেন। কুমুদিনীর মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইল, হস্ত কাঁপিতে লাগিল, দুইজনে দুই জনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সেই জনহীন শব্দহীন যমুনার উপকূলে, অন্ধকারে দুইজনে দুইজনের হস্তধারণ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বামহস্ত দ্বারা সেই কুক্কুরটি বক্ষে ধারণ করিয়া,কুমুদিনী দক্ষিণ হস্ত রজনীর হস্তে রাখিয়া নীরবে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। আর সে লজ্জা নাই—সে ব্রীড়াবিকম্পিত দৃষ্টি নাই—হঠাৎ কুমুদিনীর আচরণ পরিবর্ত্তন হইল, অনেকক্ষণের পর রজনীকান্ত কথা কহিলেন, বলিলেন, "কুমুদিনি।" কুমুদিনী অমনি চমকিয়া উঠিলেন। লজ্জায়

মস্তকে কাপড় টানিলেন, মুখ নত করিলেন, রজনীর হস্ত হইতে আপনার হস্ত টানিয়া লইলেন, বক্ষ হইতে কুক্কুরটি লইয়া রজনীর হস্তে দিলেন। রজনী দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া কুক্কুরটি লইলেন। আবার বলিলেন, "কুমুদিনি—কুমুদিনি, বড় আঘাত হইয়াছে কি ?"

কুমুদিনী মস্তক নত করিয়া অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন "না।" রজনী যেন আবার কি বলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কুমুদিনী আর দাঁড়াইলেন না। অতি মৃদু মৃদু পদসঞ্চালনে উপরে উঠিতে লাগিলেন। ঘাটের উপরে তাঁহাদের খিড়কির দ্বারের নিকটে বিনোদিনী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিল, "কে দিদি, ঘাটে কে ?"

কু। রজনীকান্ত।

বি। কি হয়েছে, খোঁড়াচ্চ কেন ?

কু। পড়ে গিয়াছি।

বি। আহা। বড় লেগেছে কি,কোথায় লেগেছে ?

বলিয়া বিনোদিনী অতিযত্নে হস্তদ্বারা কুমুদিনীর পদদ্বয় দেখিতে লাগিল, তৎপরে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কেমন করে উঠিলে ?"

কু। রজনী আসিয়া তুলিল।

বি। ছিছি, রজনীর সাক্ষাতে পড়িতে লজ্জা করিল না।

কু। তা কি করিব।

নববার্ষিকী গ্রন্থের লিখিত বাঙ্গালার খ্যাতিমান্ ব্যক্তিগণ।*

নববার্ষিকী গ্রন্থখানি বহু শ্রমসহকারে সংগৃহীত বলিয়া বোধ হয়। সংক্ষেপে বা বিস্তারে ইহাতে নানা বিষয় লিখিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে প্রচলিত সালের উৎপত্তি, পঞ্জিকাপ্রকরণ, ভারতবর্ষের রাজ্যবিভাগ ও শাসনতন্ত্র, বাঙ্গালায় লোকসংখ্যা, কৃষিতত্ব, বাণিজ্য, রেলওয়ে, ডাকঘর, সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক, মুদ্রাযন্ত্র, দর্শনীয় স্থান প্রভৃতি অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'সাময়িক খ্যাতিমান্' ব্যক্তিদিগের উল্লেখও আছে। আমরা প্রথমতঃ "খ্যাতিমান্" ব্যক্তিদিগের দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

আমরা মনে করিয়াছিলাম, আমাদের খ্যাতিমান্ লোকের সংখ্যা অতি অল্প; কিন্তু নববার্ষিকী গ্রন্থে জানিলাম যে বাঙ্গালায় ২৬ জন "খ্যাতিমান্" আছেন। আবার দেখিলাম সংগ্রহকার আত্ম-

* নববার্ষিকী। কলিকাতা। ভিক্টোরিয়া যন্ত্র। শ্রীবিপিনবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নিবেদনে লিখিয়াছেন যে তদ্ভিন্ন আর ১৬ জন আছেন। আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক খ্যাতিমান্দিগের নাম পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম।

প্রথমেই দেখিলাম বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মাহাতাপচন্দ্র বাহাদুরের নাম নাই। আমরা মনে করিয়াছিলাম মাহাতাপ চাঁদ বাহাদুর বাঙ্গালার একজন খ্যাতিমান্ ব্যক্তি। নববার্ষিকী পাঠ করিয়া জানিলাম যে তাহা নহে। আমরা একাল পর্য্যন্ত জানিতাম যে ধনে কি মানে বাঙ্গালায় তিনি অদ্বিতীয়, কিন্তু এক্ষণে নববার্ষিকী পাঠ করিয়া বিবেচনা করিলাম যে ধনে কি মানে লোক খ্যাতিমান্ হয় না। সংগ্রহকার হয় ত বলিবেন 'সনামা পুরুষো ধন্যঃ,' মাহাতাপ চাঁদ বাহাদুর নিজের গুণে খ্যাত নহেন, তাঁহার পিতৃপুরুষ ধনসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার এই সম্পদ নতুবা কেহ তাঁহার নাম শুনিতে পাইতেন না। অথবা সংগ্রহকার হয় ত বলিবেন যে বাঙ্গালির সহিত মাহাতাপ চাঁদ বাহাদুরের সংশ্রব নাই, তিনি বাঙ্গালির মধ্যে গণ্য নহেন বলিয়া তাঁহার নাম লিখিত হয় নাই। সংগ্রহকার যে কারণই নির্দ্দেশ করুন তাঁহার মতে নববার্ষিকীলিখিত ব্যক্তিগণ বর্দ্ধমানাধিপতি অপেক্ষা বড় লোক। যাঁহারা বর্দ্ধমানের মহারাজা অপেক্ষা "খ্যাতিমান্" তাঁহাদের মধ্যে কেহ গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয় হউন বা "জজমেনে" ব্রাহ্মণ হউন তাঁহারা নিশ্চয়ই অসাধারণ ব্যক্তি। আবার তাঁহারা কেবল এক মহারাজ মাহাতাপ চাঁদ বাহাদুর অপেক্ষা যে বড় লোক এমত নহেন, বাঙ্গালার ছয় কোটি লোক অপেক্ষা তাঁহারা প্রধান।

যাহারা ছয়কোটি লোকের মধ্যে প্রধান তাঁহারা কোন অসাধারণ গুণসম্পন্ন হইবেন। বাঙ্গালার খ্যাতিমান্ হইতে গেলে বোধ হয় দুই একটী এমন বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক যাহা ঐ ছয় কোটী লোকের মধ্যে পাওয়া যায় না। পাঠকমহাশয়ের এক্ষণে দেখা উচিত নববার্ষিকীলিখিত খ্যাতিমান্দিগের মধ্যে কাহারও ঐরূপ কোন অসাধারণ গুণ আছে কি না।

প্রত্যেক "খ্যাতিমানের" অসাধারণত্ব তত্ত্ব করিবার প্রয়োজন নাই, কয়েক জনের সম্বন্ধে হয় ত লোকের বড় সন্দেহ না থাকিতে পারে। কিন্তু অবশিষ্ট কয়েকটির নাম এই স্থলে উল্লেখ করিয়া পাঠকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, কখন কি এই অদ্ভুত "খ্যাতিমান্দিগের" কেহ খ্যাতি শুনিয়াছেন? কখন কেহ কি তাঁহাদিগের নাম শুনিয়াছেন? কিন্তু পাছে এই "খ্যাতিমান্দিগের" আত্মীয়েরা কষ্ট পান এই ভয়ে আমরা তাঁহাদের নাম এস্থলে লিখিতে পারিলাম না।

এই সকল গুপ্ত "খ্যাতিমান্দিগের" জীবনী নববার্ষিকীগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে দেখিয়া মনে করিলাম বাঙ্গালার লোক হয় ত অবিবেচক, আপনাদিগের রত্নগুলিকে চিনিতে পারে নাই, জীবনী পড়িয়া চিনি-

তে পারিবে বলিয়া সংগ্রহকার তাহাদের জীবনী লিখিয়াছেন। খ্যাতিমানদিগের খ্যাতিতে যত দাবি দাওয়া তাহা সমুদয় ঐ জীবনীতে লিখিত হইয়াছে। ইহাই জীবনীর এক মাত্র উদ্দেশ্য মনে করিয়া যত্নপূর্ব্বক আমরা জীবনী গুলি একে একে পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

প্রথমেই যাঁহার জীবনী পাঠ করিলাম তাঁহার অসাধারণত্ব কিছুই দেখিতে পাই লাম না। তাহার জীবনীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিত হইতেছে:—খ্যাতিমানটি দরিদ্রসন্তান, পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন, তাহার পর কালেজে পড়িয়াছিলেন, ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন, কালেজের অধ্যাপকেরা তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। সংসার অচল বলিয়া কালেজ ত্যাগ করেন। শিক্ষা শেষ হইল না বলিয়া তাঁহার ক্ষতি হয় নাই। তিনি এক্ষণে দুই শত টাকা বেতন পাইতেছেন, গান্য লোকদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া একটি ডাকঘর স্থাপন করিয়াছেন। বিবাহ করিয়াছেন। পাঠশালার নিমিত্ত পুস্তক লিখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন আর একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানির নাম আমরা লিখিতে পারিলাম না, লিখিতে পারিলে পাঠকেরা দেখিতেন যে তল্লেখক স্বয়ং যেরূপ অপরিচিত তাঁহার গ্রন্থখানিও সেইরূপ অপরিচিত। নববার্ষিকীলেখক আপনিই বলুন দেখি যে প্রতিবেশী ভিন্ন এই ব্যক্তিকে কেহ জানে? কেহ জানিবার সম্ভাবনা? কোন গুণে এই ব্যক্তি ছয়কোটী লোকের মধ্যে "খ্যাতিমান্" হইবার যোগ্য? তাঁহার কোন গুণটী অসাধারণ? তিনি কি দরিদ্রসন্তান বলিয়া অসাধারণ? কালেজে ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন বলিয়া কি অসাধারণ? পাঠশালার পুস্তক লিখিয়াছেন বলিয়া কি অসাধারণ? গ্রামে ডাকঘর স্থাপন করিবার জন্য উদ্যোগ পাইয়াছিলেন বলিয়া কি অসাধারণ? না, বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া অসাধারণ? কোন গুণটির নিমিত্ত এই অদ্ভুত খ্যাতিমানটি ছয়কোটী লোকের উপর স্থান পাইয়াছেন? এরূপ লোক যদি "খ্যাতিমান্" হয়েন তবে সংগ্রহকার দেখুন দেখি নিম্নলিখিত ব্যক্তিকে ভবিষ্যতে নববার্ষিকী গ্রন্থে স্থান দিতে পারিবেন কি না?

রামভদ্র খঞ্জপাদ সন ১২৪০ সালের ১২ই বৈশাখে জন্মগ্রহণ করেন। ১২ই বৈশাখের একদিন পূর্ব্বেও নহে একদিন পরেও নহে। ইহার একমাত্র গর্ব্ভধারিণী ছিলেন, তাহাকে রামভদ্র চিরকাল মা বলিয়া ডাকিতেন, কখন অন্যথা হয় নাই। বয়স হইলেও মাকে মা বলিতেন। তাঁহার জন্মমাত্রেই জ্ঞানোদয়ের আশ্চর্য্য পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল; ঐ সময় মাতৃস্তন তাঁহার ওষ্ঠ স্পর্শ করিবামাত্রই তিনি দুগ্ধপান করিয়াছিলেন। স্তনে দুগ্ধ আছে এ কথা তাঁহাকে বলিয়া দিতে হয় নাই। তাহা শোষণ করিলে দুগ্ধ বহির্গত হইবে এবং সেই দুগ্ধ পান করিতে হইবে এ সকল কিছুই শিখাইতে হয় নাই,

অথচ রামভদ্র জন্মমাত্রেই তাহা সকল জানিয়াছিলেন। লোকে তখনই বুঝিয়াছিল যে এ ছেলে বাঙ্গালার "খ্যাতিমান্" হইবে। তাহার পর রামভদ্র দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন; কেহ তাঁহাকে বাড়ায় না, অথচ তিনি আপনি বাড়িতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য কৌশল জানিতেন। প্রথমে তিনি পাঠশালায় পাঠারম্ভ করেন। বর্ণগুলি বহুযত্নে অতি সাবধানে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার স্মরণশক্তি এতই চমৎকার যে কতদিন হইল বর্ণগুলি শিখিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহা ভুলেন নাই, কখন ভ্রমেও ক অক্ষরকে চ বলেন না। তাঁহার বুদ্ধির কৌশল আরও আশ্চর্য্য এই, পাঠশালে যে সেই কয়েকটি বর্ণ শিখিয়াছিলেন তাহা দ্বারা কি না করিতেছেন। পত্র লিখিতে বল, টপ্পা লিখিতে বল, সকল কার্য্য ঐ বর্ণ কয়েকটির দ্বারা উদ্ধার করিয়া থাকেন; কখন অন্য উপায় অবলম্বন করেন না। ইদানীং বর্ণমাহাত্ম্য নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া অদ্ভুত কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। গ্রন্থ দ্বারা তিনি এই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে বেদ বল, বেদাঙ্গ বল, বর্ণ ছাড়া কিছুই নাই। পাঠশালায় যে বর্ণগুলি শিখা যায় তাহা লইয়া বেদ। তাহার একটী বর্ণ মুছিয়া ফেল, বেদ অশুদ্ধ হইবে। সকল বর্ণগুলি মুছিয়া ফেল, বেদ লোপ পাইবে। গ্রন্থখানি অধিক বিক্রীত হয় নাই কিন্তু শুনিয়াছি বাঙ্গালায় আপামর সাধারণে সকলেই তাহা পড়িয়াছেন। রামভদ্রের বিশেষ বন্ধুরা বলেন যে বর্ণমাহাত্ম্য পড়িয়া বিজ্ঞানবিৎপণ্ডিতেরা ধন্য ধন্য করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন ঐ গ্রন্থ দ্বারা বিজ্ঞানশাস্ত্র পরিবর্দ্ধিত হইবে, বর্ণমাহাত্ম্য দ্বারা নূতন নূতন নিয়ম আবিষ্কৃত হইবে। আবার সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন যে বর্ণমাহাত্ম্য দ্বারা সমাজের নানা মঙ্গল সংসাধিত হইবে। ফলতঃ যিনিই যাহা বলুন আমরাও নববার্ষিকী সংগ্রহকারের ন্যায় গ্রন্থের গুণাগুণ দেখি না। রামভদ্র পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন আপনার ব্যয়ে তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। অতএব তিনি নববার্ষিকীলিখিত খ্যাতিমান্দিগের শ্রেণীভুক্ত হইবার নিতান্ত যোগ্য। বাস্তবিক যোগ্য কি না যাঁহারা নববার্ষিকীলিখিত দুই চারিটি জীবনী পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই বিচার করুন।

নববার্ষিকীর একটি জীবনী পড়িয়া রামভদ্র খঞ্জপাদকে আমাদের মনে পড়িয়াছিল। আর দুই একটি জীবনী পাঠ করিয়া যাহা মনে হইল তাহা বলা বাহুল্য। কেবল এই মাত্র পাঠকদিগকে স্মরণ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি যে, নববার্ষিকীর দুই চারিটি খ্যাতিমান্ অপেক্ষা অনেক যাত্রাকর এবং নাকছাঁদি প্রভৃতি দোকানদার সুপরিচিত; সংগ্রহকার তাঁহাদের জীবনী সন্নিবেশিত করিলে নিতান্ত অসংলগ্ন হইত না।

সংগ্রহকার যে সকল সামান্য ব্যক্তির কপালে টিকিট্ মারিয়া 'খ্যাতিমান্'

করিয়াছেন আমরা যথার্থই তাঁহাদের নিমিত্ত দুঃখিত। তাঁহারা পথে বাহির হইলে লোকে তাঁহাদের মুখের প্রতি চাহিয়া চিনিতে চেষ্টা করিবে। হয় ত ইতর লোকেরা 'নববার্ষিকীর খ্যাতিমান্' যাইতেছে বলিয়া অঙ্গুলি তুলিয়া দেখাইয়া দিবে। ভদ্রলোকদিগকে একরূপে অপ্রতিভ করিবার উপায় করিয়া সংগ্রহকার ভাল করেন নাই। ঐ সকল ভদ্রলোকেরা তাঁহার নিকট অনুগৃহীত হইয়াছেন বলিয়া কখনই মনে করিবেন না। বাস্তবিক সংগ্রহকার তাঁহাদের শত্রুর ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। যে ব্যক্তিরা কখনই তাঁহাদের জানিত না এক্ষণে জানিবার নিমিত্ত তাহাদের কৌতূহল জন্মিবে। আশানুযায়ী গুণ না দেখিলে উপহাস করিবে। সংগ্রহকার সে উপহাসের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। খ্যাতির কারণ আর অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে না, জীবনী পাঠ করিলেই খ্যাতিমান্ দিগের দাবি দাওয়া একেবারে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাহাই বলিতে ছিলাম সংগ্রহকার শত্রুর ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। 'খ্যাতিমান্দিগকে' সংগ্রহকার উচ্চস্থানে দাঁড় করাইয়া ভাঙ্গাঢোল পিটিয়া বাজারের লোক জমা করিয়াছেন; কিন্তু কয়েকজনের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে উপহাস করিবার নিমিত্ত প্রকারান্তরে ইঙ্গিতও করিয়াছেন।

আবার বিশেষ আক্ষেপের বিষয় যে এই সকল বিবেচনা না করিয়া দুই একজন 'খ্যাতিমান্,' আপনাদের পরিচয় আপনারাই লিখিয়া দিয়াছেন। সংগ্রহকারের কখন এই সামান্য ব্যক্তিদিগের জন্ম বা বংশবৃত্তান্ত জানিবার সম্ভব নহে। অবশ্য খ্যাতিমানেরা স্বয়ং তাহা সংগ্রহ করিয়া না দিলে নববার্ষিকীলেখক তাহা কোথায় পাইবেন। কিন্তু ইহার মধ্যে আরও রহস্যের বিষয় এই যে তাঁহাদের জন্মদিন সাধারণে নিশ্চয় করিয়া না জানিলে পাছে ভবিষ্যতে দেশের কোন ক্ষতি হয় এই বিবেচনায় তাঁহারা মাস তিথি নক্ষত্র জানাইয়া সাধারণকে চিরবাধিত করিয়াছেন। তাঁহাদের দয়ার পার নাই! কেহ কেহ আবার অনুগ্রহ করিয়া জানাইয়াছেন যে তাঁহার বিবাহ দুইটি, কেহ বা বলিয়াছেন তাঁহার ভগিনী চারিটী। এ সকল পরিচয়ে দেশের মহৎ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভবিষ্যৎ ইতিবৃত্ত লেখকদিগের নিমিত্ত রাখিলে ভাল হইত।

সংগ্রহকার যে কেবল দুই চারিটি নিরীহ ব্যক্তিকে উপহাসের পথে দাঁড় করাইয়াছেন এমত নহে, তিনি নিজেও কতক সেই পথে দাঁড়াইয়াছেন। যিনি এই সকল সামান্য ও অপরিচিত ব্যক্তিদিগকে বাঙ্গালার খ্যাতিমান্ বলিয়া স্থির করিয়াছেন তিনি অবশ্য উপহাসের যোগ্য। সংগ্রহকার নিজের নাম গোপন রাখিয়া ভাল করিয়াছেন।

আমরা যে এত কথা বলিলাম তাহার প্রধান কারণ এই যে 'খ্যাতিমান্' অংশ

ব্যতীত নববার্ষিকী গ্রন্থখানি সুন্দর রূপে সংগৃহীত হইয়াছে। অন্য অংশ উৎকৃষ্ট না হইলে কেবল 'খ্যাতিমানের' পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়া আমরা এত সময় নষ্ট করিতাম না, মনে করিতাম কোন পাঠশালার গুরুমহাশয় বা কোন উকিলের টর্নি কর্ত্তৃক ইহা সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার নিকট আর অধিক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

আর এক কথা এই যে, যে দেশে রামভদ্র খঞ্জপাদের ন্যায় ব্যক্তিরা খ্যাতিমান্, সে দেশের গৌরব গোপন করিলেই ভাল হয়।

সংগ্রহকারের বোধ হয় দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে ভালই হউক মন্দই হউক গ্রন্থ লিখিলেই লোক খ্যাত্যাপন্ন হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না, কখন কখন অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়াও লেখক অপরিচিত থাকেন হয় ত শত বৎসর পরে তাঁহার গ্রন্থের গুণ প্রকাশ পায়। তৎকালে তিনি জীবিত থাকিতে পারিলে খ্যাত্যাপন্ন হইতে পারিতেন। অনেকে বহুতর ধনসঞ্চয় করিয়াও খ্যাত্যাপন্ন হইতে পারেন না সমাজের সর্ব্বত্র তাঁহার ধনাঢ্যতার পরিচয় বিস্তার হয় না। অধিক দিনের কথা নহে বাঙ্গালার কোন ব্যক্তি মরণকালে চারি ক্রোর টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, অথচ তিনি ধনবান্ বলিয়া বাঙ্গালায় খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন না। দান করিয়া অনেকে দরিদ্র হইয়া গিয়াছেন অথচ খ্যাত্যাপন্ন হয়েন নাই। অনেকে রাজসম্মান পাইয়াছেন কেহ বা রাজা কেহ বা নবাব হইয়াছেন অথচ বাঙ্গালায় খ্যাত্যাপন্ন হয়েন নাই।

কি গুণে লোক খ্যাত্যাপন্ন হয় তাহা বলা যায় না। যিনি তাহা বুঝিয়াছেন এবং বুঝিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিয়াছেন হয় ত তিনি খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠ বা মহৎব্যক্তি হইলেই যে খ্যাত্যাপন্ন হইবে এমত নহে। অনেকে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন অথচ তাঁহারা মহৎ নহেন। প্রকৃত মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার মুখাপেক্ষী নহে। বরং প্রকৃত মাহাত্ম্য খ্যাত্যাপন্ন না হওয়াই সম্ভব। প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধেও অনেকটা ঐরূপ। প্রতিভাশালী হইলেই যে খ্যাতিমান্ হইবে এমত নিশ্চয় নাই।

সংগ্রহকার যে ৪২ জনের নাম নির্ব্বাচন করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে তিন চারি জনকে বাঙ্গালার খ্যাতিমান্ বলিলেও বলা যাইতে পারে, কেন না বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্র তাঁহাদের খ্যাতি বিস্তার হইয়াছে। অপর কয়জনের মধ্যে কাহাকে কলিকাতার খ্যাতিমান্, কাহাকে পটলডাঙ্গার খ্যাতিমান্, কাহাকে রামপুর বা শ্যামপুরের খ্যাতিমান্ বলিয়া পরিচয় দিলে সঙ্গত হইত, কেহ তাহাতে আপত্তি করিত না। তাঁহারা সহস্র গুণালঙ্কৃত হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাপিয়া তাঁহারা পরিচিত হয়েন নাই, কাজেই তাঁহারা বাঙ্গালার 'খ্যাতিমান্' নহেন। বাঙ্গালার অবস্থা মন্দ, অদ্যাপি পূর্ব্ব-

কালের ন্যায় যেন শত রাজ্যে বিভক্ত রহিয়াছে কাজেই প্রতিষ্ঠা প্রচার বাঙ্গালায় এখনও অতি কঠিন।

নববার্ষিকীর অপকৃষ্ট অংশ সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিলাম। ইচ্ছা ছিল উৎকৃষ্ট অংশ লইয়া আলোচনা করি কিন্তু আমাদের স্থানাভাব। নববার্ষিকী গ্রন্থে উৎকৃষ্ট ভাগ অনেক আছে। পঞ্জিকা প্রকরণটি আদ্যোপান্ত সকলের পাঠ করা আবশ্যক। সংগ্রহকার যে একটি বিশেষ ভ্রম দর্শাইয়াছেন তাহা সকলের জানা উচিত। আমরা তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"আমাদিগের দেশের পঞ্জিকাকারেরা এক্ষণে যে সময় হইতে নূতন বৎসরের গণনা আরম্ভ করিয়াছেন,এবং যে নিয়মে মাসিক দিনসংখ্যার ভাগ করিতেছেন, তাহাতে গুরুতর ভ্রম লক্ষিত হয়। এই ভ্রম আশু সংশোধন না করিলে আমাদিগের পঞ্জিকা ক্রমেই অধিকতর অশুদ্ধ হইতে থাকিবে, এবং তিন চারি সহস্র বৎসর পরে এক ঋতুতে অন্য ঋতুর গণনা আরম্ভ হইবে। সর্ব্বসাধারণের সম্মতিভিন্ন যদিও এই ভ্রম সংশোধন করা আমাদিগের ক্ষমতাধীন নহে, তথাপিও এই ভ্রম প্রদর্শন করিয়া তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।"

মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে সংগ্রহকার এই নিম্ন উদ্ধৃত আশ্চর্য্য কথা লিখিয়াছেন।

"বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে মুদ্রাযন্ত্র ছিল তাহার একটী প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের শাসন কালীন তিনি দেখিতে পান যে, বারানসী জেলার এক স্থলে মৃত্তিকার কিছু নীচে পশমের ন্যায় আঁশাল একরূপ পদার্থের একটি স্তর রহিয়াছে। মেজর রবেক ইহার সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং সে স্থান খনন করিয়া একটি খিলান দেখিতে পান। পরিশেষে খিলানের অভ্যন্তরদেশে প্রবেশ করিয়া দর্শন করেন যে, তথায় একটি মুদ্রাযন্ত্র ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত সাজান রহিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত হয়, সে সকল একালের নয়, অন্যূন এক সহস্র বৎসর এই অবস্থায় রহিয়াছে। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে মুদ্রাযন্ত্র ও উপকরণাদি ব্যবহার করিতেন, আমরা যবনাধিকারে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।"

সংগ্রহকার এই সংবাদ কোথায় পাইয়াছেন তাহা বিশেষ করিয়া লিখিলে ভাল হইত। না লেখায় এই পরিচয় অনেকের নিকট গ্রাহ্য হইবে না। মুদ্রাযন্ত্র প্রাচীনকালে চীনদেশে ছিল কিন্তু ভারতবর্ষে যে কখন ছিল এমত কাহারও বিশ্বাস নাই। এক্ষণে তাহা বিশ্বাস করাইতে হইলে বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক। শুনা যায় Gentleman's Magazine নামক একখানি সামান্য সাময়িক পত্রে এই কথা লিখিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা

কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা প্রথমে তদন্ত করা উচিত ছিল।

সংগ্রহকার বহু পরিশ্রম করিয়া নব-বার্ষিকী গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু আক্ষেপের বিষয় স্থানাভাবে সকল বিষয় সমালোচন করিয়া তাঁহার উপযুক্ত প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

পঞ্জাব ও শিখসম্প্রদায়।

প্রথম প্রস্তাব।

পঞ্জাব ভারতবর্ষের মধ্যে, বর্ত্তমান কি প্রাচীন উভয়কালেই অতি প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য। কিন্তু প্রাচীন কালের পঞ্জাবের গৌরবে সমগ্র ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত। পূজ্যপাদ আর্য্যপিতৃপুরুষেরা মধ্য আসিয়া হইতে প্রথমে পঞ্জাব প্রদেশে আসিয়াই পদার্পণ করেন, এবং তথায় বহুকাল পর্য্যন্ত অধিবাস করিয়া ক্রমে দক্ষিণাভিমুখীন হন। তাঁহারা সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে উহাকে অভিহিত করেন। সরস্বতী এক্ষণে অদৃশ্য, দৃষদ্বতী কাগার নামে প্রসিদ্ধ। পঞ্জাবেই আর্য্য ও অনার্য্যদিগের মধ্যে বিবাদ বিগ্রহ আরম্ভ হয়। ঋগ্বেদের অধিকাংশ পঞ্জাব প্রদেশেই লিখিত। দেবাসুরের যুদ্ধও, বোধ হয় পঞ্জাব প্রদেশেই সংঘটিত হইয়াছিল। কোন কোন প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুমান করেন যে, অতি প্রাচীনকালীন আর্য্যদিগের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতবিভেদ লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, পরে তাঁহারা হিন্দু ও পার্সি এই উভয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন। এই যুদ্ধ পঞ্জাব প্রদেশেই ঘটিয়াছিল, এবং উহা উত্তরকালে দেবাসুরের যুদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন গ্রীস্‌দেশীয় পুরাবৃত্ত পঞ্জাবের প্রাচীন গৌরব প্রকাশ করিতেছে। মহাবীর সেকন্দর সাহ ও তাঁহার সমভিব্যাহারী গ্রীকেরা পঞ্জাব প্রদেশবাসিগণের বীরত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু পঞ্জাবের প্রাচীন গৌরব বর্ণনা করা আমার লক্ষ্য নহে। বর্ত্তমান কালীন পঞ্জাব সম্বন্ধীয় কয়েকটি বিবরণ ও উক্ত প্রদেশের আধুনিক ইতিবৃত্তের দুই একটি কথা আনুষঙ্গিকরূপে ব্যক্তকরাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পঞ্জাবীরা সাহসী, বলবান্, ও দীর্ঘকায়। বাঙ্গালিদের ত কথাই নাই, তাঁহারা (পঞ্জাবীরা) সাহস শারীরিক গঠন ও বল সম্বন্ধে হিন্দুস্থানী প্রভৃতি জাতি সকলের অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।

পঞ্জাবে কৃষ্ণবর্ণ স্ত্রী কি পুরুষ বিরল, কাশ্মীর ভিন্ন ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশ অপেক্ষা পঞ্জাবে গৌরবর্ণ লোকের সংখ্যা অনেক অধিক। কাশ্মীর ভিন্ন এত সুন্দরী নারীও ভারতের আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক পঞ্জাবীর সংস্কার এই যে, বঙ্গদেশে গৌরাঙ্গ সুন্দর পুরুষ কি গৌরাঙ্গী সুন্দরী নারীর সম্পূর্ণ অসদ্ভাব। আমি এরূপ কোন কোন লোকের কথার প্রতিবাদ করিলাম, তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন কি না জানি না। বঙ্গদেশে গৌরবর্ণ লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া বাঙ্গালিরা কুৎসিত নহে। কুৎসিত হওয়া দূরে থাকুক, বাঙ্গালির শারীরিক গঠন, মুখাকৃতি দেখিতে সুশ্রী। পঞ্জাবীর সঙ্গে তুলনা করিলে বাঙ্গালি যেমন বর্ণ সম্বন্ধে নিকৃষ্ট, সেইরূপ আর একটি বিষয়ে নিকৃষ্ট। বাঙ্গালির আকৃতিতে সাধারণতঃ গাম্ভীর্য্য নাই। গুণাগুণের পরিচয় কিছু মাত্র না পাইয়াও,কোন কোন ব্যক্তিকে দেখিলেই সম্মান করিতে ইচ্ছা করে। তাঁহারাই প্রকৃত গম্ভীরমূর্ত্তি। বর্ণের উজ্জ্বলতা, শরীরের দৈর্ঘ্য,ও অঙ্গ সকলের প্রশস্ততা থাকিলে শারীরিক গাম্ভীর্য্য উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালির আকৃতিতে সে প্রকার গাম্ভীর্য্য সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। কেননা বাঙ্গালির আকৃতি অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব, অঙ্গ সকল ক্ষুদ্র, ও বর্ণ মলিন। কিন্তু পুনর্ব্বার বলি বঙ্গবাসী পুরুষ কি স্ত্রীলোকের আকৃতি সুগঠিত ও সুশ্রী। পঞ্জাবের ভদ্র মহিলাগণের মধ্যে বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে এমন সকল রূপবতী নারী দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক একটি দেবী প্রতিমা বলিয়া মনে হয়। কেবল তাহাই কেন? সিমলা পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে কাল্‌কা নামক ক্ষুদ্র নগরে এক সামান্য ঘোড়ার সইসের স্ত্রীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। সে নিতান্ত দরিদ্র, আমার নিকট কয়েকটি পয়সা ভিক্ষা গ্রহণ করিল। কিন্তু এমনি চমৎকার রূপ যে, আমাদের এখান কার অনেক বড় বড় ঘরের রূপবতীরাও তাহার নিকট দাঁড়াইতে পারেন না। ইতরজাতীয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যাহা বলা হইল ইতর জাতীয় পুরুষ সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। লাহোর রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে যে মুটিয়া আমার দ্রব্যাদি বহন করিয়া সহর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিল, সে ব্যক্তির আকৃতি দেখিলে আমাদের এখানকার অনেক ভদ্রবংশজাত ব্যক্তিকেও লজ্জা পাইতে হয়। তাহাকে আপ্‌না বলিয়া তোম্‌ বলিতে প্রথমে যেন একটু বাধ বাধ করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পঞ্জাবীরা সাহসী। যদিও বর্ত্তমান কঠোর রাজশাসনবশতঃ তাহাদের শারীরিক বীর্য্য ও সাহসের ক্রমশঃ অবনতি লক্ষিত হইতেছে, তথাচ অদ্যাপি যাহা আছে তাহা দেখিয়াও আনন্দিত হইতে হয়। শিখ

দিগের যুদ্ধকুশলতা ও সাহসের কথা বংশ পরম্পরায় চিরদিন বিঘোষিত হইবে, পুরাবৃত্ত চিরদিনের জন্য অবিনশ্বর স্বর্ণাক্ষরে তাহা অঙ্কিত করিয়া রাখিবে। পঞ্জাববাসিগণ সাধারণতঃ ও শিখেরা বিশেষতঃ জগতে চিরকাল বীর্য্য ও সাহসের জন্য খ্যাতিমান্।

জলন্ধর হইতে আসিতেছি, একজন পঞ্জাবী বাহক আমার দ্রব্যাদি বহন করিয়া আনিতেছে। বাহক অতিশয় বলবান্ পুরুষ। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, সে ব্যক্তির স্ত্রী ও কতকগুলি সন্তানাদি আছে। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে, প্রতি দিন সে ৮।১০ পয়সা উপার্জ্জন করে। এরূপ অল্প আয়ে কেমন করিয়া এতগুলি পরিবার প্রতিপালন হয়, জিজ্ঞাসা করাতে বলিল যে, তাহার অতিকষ্টে দিনপাত হইয়া থাকে। আমি তখন বলিলাম যে, তুমি এমন বলবান্ পুরুষ, তুমি কেন মুটিয়ার কাজ ছাড়িয়া দিয়া গবর্ণমেণ্টের সৈন্যশ্রেণীতে প্রবেশ কর না, তাহা হইলে তোমার আয় বৃদ্ধি হইতে পারিবে। সে ব্যক্তি অস্পষ্টরূপে কি বলিল, ভাল বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম যে, তুমি কি যুদ্ধ করিতে ভয় কর, তাই সিপাহি হইতে ইচ্ছা কর না? বাহক এই কথা শুনিয়া আমার উপর অতিশয় বিরক্ত হইল। বলিল আমি কি ভীরু? আমি কি মরিতে ভয় করি? এমন আপনি কখন ভাবিবেন না। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এমন দিন কি কখন আসিবে যে, বাঙ্গালিকে ভীরু বলিলে বাঙ্গালি বিরক্ত ও অপমানিত মনে করিবে।

খ্রীষ্টিয়ান্ পাদ্রি সাহেবদিগের স্বভাব এই যে, পরের ধর্ম্মের নিন্দা না করিলে, তাঁহাদের নিজের ধর্ম্ম প্রচার করা হয় না। শ্রীকৃষ্ণ লম্পট ছিলেন, মহাদেব গাঁজাখোর, ইত্যাদি কথা হিন্দুদিগের নিকট না বলিলে তাঁহাদিগের ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না। সেই প্রকার পঞ্জাবে শিখদিগের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইলে তাঁহারা শিখ গুরুদিগের নিন্দাবাদ আবশ্যক মনে করেন। কিন্তু বাঙ্গালি প্রভৃতি জাতি সকলের নিকট উক্তপ্রকার ধর্ম্মনিন্দা করা যেরূপ সহজ, সাহসী ও তেজস্বী শিখদিগের নিকট তত সহজ নহে। একদা জনৈক খ্রীষ্টিয়ান্ পাদ্রি অমৃতসরের রাজপথে শিখ গুরুদিগের প্রতি গালিবর্ষণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন। একজন শিখের তাহা সহ্য হইল না। সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ এক প্রকাণ্ড লগুড় লইয়া সাহেবের মস্তকে সাজ্যাতিকরূপে আঘাত করিল। সাহেব ভগ্নশির হইয়া অবিলম্বে শমনভবনে যাত্রা করিলেন। অবশ্য হন্তা পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট নীত হইল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে ব্যক্তি স্বীকার করিল যে, সে পাদ্রি সাহেবের মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে এরূপ ভয়ানক কার্য্য করি-

বার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল “গুরুজীকা ইযে হুকুম হ্যায যো, যো কোই ধরম কি নিন্দা করে গা, ওস্কো তিন ডাণ্ডা লাগাও, হুজুর হাম তো এক লাগায়া, বেচারা মর্ গেযা, অওর দোডাণ্ডা তো আবি বাকি হ্যায।” মাজিষ্ট্রেট সাহেব শুনিয়া অবাক্। হয ত তিনি ভাবিলেন যে, বাকি দুই ডাণ্ডা বুঝি তাঁহার মস্তকের উপরেই পড়ে।

সাহস ও ন্যাযপরতার আর একটি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দিব। অমৃতসর নগরে ইউরোপীয়দিগের ভোজনার্থ বহুসংখ্যক গোবধ হইত। ইহাতে শিখ ও অপরাপর হিন্দুগণ যার পর নাই বিরক্ত হইলেন। বিরক্ত হইয়া নগরের ভিতর গোবধ নিবারণ জন্য কমিসনর সাহেবের নিকট আবেদন করিলেন। কমিসনর সাহেব আবেদনের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ করিলেন না। যে দিন আবেদন অগ্রাহ্য হইল, সে দিন গেল, সে রাত্রি গেল, প্রাতঃকালে নগরবাসিগণ শুনিলেন যে রাত্রির মধ্যে নগরের সমস্ত গোহন্তা কসাই মারা পড়িয়াছে। কে আসিয়া তাহাদের শিরশ্ছেদন করিয়া গিয়াছে, তাহার কোন চিহ্ন নাই,—সন্ধান নাই। পুলিস হত্যাকারীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক অনুসন্ধান হইল বটে, কিন্তু কিছুই নির্ণয় হইল না। পরিশেষে কোন দূর প্রদেশ হইতে জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইউরোপীয় পুলিস কর্ম্মচারীকে আনিয়া উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। সাহেব অনেক অনুসন্ধানের পর ছয়জন লোককে হত্যাকারী বলিয়া উপস্থিত করিলেন। তাহাদের অপরাধের উপযুক্ত প্রমাণ দেওয়া হইল; এবং বিচারে তাহাদিগের প্রাণদণ্ডের অনুমতি হইল। প্রাণদণ্ডের অনুমতি হইল বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা উপস্থিত হইল। কোথা হইতে ৪। ৫ জন লোক আসিয়া বলিল যে, যে কয়েকজনের প্রাণদণ্ডের অনুমতি হইয়াছে তাহারা বাস্তবিক দোষী নহে। তাহারা কসাই হত্যা করে নাই। তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। আমরাই গোহন্তা কসাইদিগকে হত্যা করিয়াছি। হত্যা করিয়া লুকাইযাছিলাম। পুলিস আমাদিগের কোন সন্ধান পায় নাই। কিন্তু কয়েকজন নির্দ্দোষী ব্যক্তি আমাদিগের জন্য প্রাণ হারাইতেছে দেখিয়া আর আমরা লুকাইয়া থাকিতে পারিলাম না। আমরা আপনারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ধরা দিলাম। যে কোন দণ্ড হউক তাহাই আমরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। তাহারা যে বাস্তবিক কসাই হন্তা, তাহার প্রমাণ কি জিজ্ঞাসা করাতে, হস্তস্থিত তলবার, কোষ হইতে উন্মুক্ত করিয়া বলিল, “এই দেখুন! ইহা এখনও কসাইয়ের রক্তে কলঙ্কিত রহিয়াছে।” পরে বিধিপূর্ব্বক বিচার হইয়া, পূর্ব্বে যে কয়জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছিল তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল, এবং এই নবাগত সত্যনিষ্ঠ, সাহসী, ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণকে

নরাধম পাষণ্ডের ন্যায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ইহাই ইহসংসারে বিচার।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান কঠোর রাজশাসনবশতঃ পঞ্জাববাসিগণের শারীরিক কার্য্য ও সাহসের অবনতি লক্ষিত হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ২৫।৩০ বৎসর মাত্র পঞ্জাবের স্বাধীনতাবিলোপ হইয়াছে, অথচ এই অল্পকাল মধ্যেই জাতীয় বীর্য্যের অধোগতি সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। যে সকল বুদ্ধিমান্ ও সুশিক্ষিত পঞ্জাবীর সঙ্গে পঞ্জাব প্রদেশের শুভাশুভ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল, তন্মধ্যে কেহ কেহ উক্ত বিষয়টির উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিলেন। পঞ্জাববাসিগণের কিয়ৎপরিমাণে অবনতি হইয়াছে, সত্য, কিন্তু আজও তাঁহারা অন্যের পর্ব্বত,—ভারতের অপরাপর প্রদেশবাসীর সহিত তুলনা করিলে আজও পঞ্জাবীরা সাহস ও বীর্য্য সম্বন্ধে বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান রাজশাসনের কঠোরতাবশতঃ পঞ্জাবে বীর্য্যহানি লক্ষিত হইতেছে। কেবল পঞ্জাব কেন? ভারতবর্ষের প্রাচীন সকল প্রদেশই হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে। ইংরেজশাসন ভারতের প্রভূত মঙ্গলের নিদান স্বরূপ। হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের ভাগ্যে যদি কখন সম্মিলন ও ঐক্য বন্ধন থাকে, তাহা ইংরেজ শাসনাধীনেই ঘটিবে, সেই জন্য আমরা ইংরেজ শাসনের একান্ত পক্ষপাতী। কিন্তু ইংরেজশাসনের পক্ষপাতী বলিয়া এমন কথা বলি না যে, উহা কলঙ্কশূন্য। বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়। মুসলমান শাসনের সহিত ইংরেজ শাসনের তুলনা করিতে যাওয়াই বাতুলতা মাত্র। কিন্তু ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরেজ অধিকার কালে ভারতবর্ষে এমন কয়েকটি অমঙ্গল সংঘটিত হইয়াছে যাহা মুসলমানদিগের সময়েও ছিল না। আমরা ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতী। কিন্তু তাহা বলিয়া কি বলিব না যে, গবর্ণমেণ্টের আবকারী বিভাগ অশেষ অমঙ্গলের কারণ? যে বিভাগের জন্য ভারতসন্তানগণ কালকূটগরলপান করিয়া উৎসন্ন যাইতেছে, ইংরেজশাসনের পক্ষপাতী বলিয়া কি বলিব না যে উহা একটি দুরপনেয় কলঙ্ক? ইংরেজশাসনের পক্ষপাতী বলিয়া আমাদের দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের বিলোপ বা অবনতি দর্শনে কি ব্যথিত হৃদয় হইব না? ইংরেজশাসনের পক্ষপাতী বলিয়া কি বলিব না যে, মুসলমান রাজ্যকালে আমরা দেশের উচ্চতর পদ সকল—রাজমন্ত্রিত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতাম, এখন আর আমাদের সে সৌভাগ্য নাই, এখন অধিক বেতন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পদ সকলের দ্বার আমাদের নিকট একপ্রকার নিরুদ্ধ? সেই প্রকার ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতী বলিয়া কি বলিব না যে, উক্ত শাসনের প্রণালী নিবন্ধন ভারতসন্তান দিন দিন সাহস

ও পৌরুষ বল বীর্য্য বিহীন হইয়া কাপুরুষ হইয়া যাইতেছে?

ইংরেজশাসনকালে বাঙ্গালি সাহস ও বীর্য্যবিহীন হইয়া যাইতেছে এ কথায় চিন্তাশীল সুবিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই হাস্য করিবেন। বাস্তবিক ইংরেজদিগের সময়ে বাঙ্গালির যে অনেক বিষয়ে সাহসাদি গুণের উন্নতি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল সম্বন্ধে যে, বঙ্গবাসী দিন দিন হীনতর অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। এক সময় ছিল যখন বঙ্গদেশের প্রায় প্রতিপল্লীতেই ব্যায়াম চর্চ্চা দৃষ্ট হইত। এক সময় ছিল যখন লাঠি, সড়কি, তীর প্রভৃতি আত্মরক্ষা ও আক্রমণোপযোগী অস্ত্রাদির সঞ্চালন ও শিক্ষা প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল। এখন আর সে দিন নাই। কাম্বেল সাহেবের যত্নে আজ কাল কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থান সকলের বিদ্যালয়ে ব্যায়ামচর্চ্চা প্রচলিত হইযাছে মাত্র। কিন্তু আমরা বাঙ্গালিজাতিকে লক্ষ্য করিয়া বীর্য্যহানির কথা বলিতেছি না। পঞ্জাবী মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি জাতি সকলকে মনে করিয়াই বলা হইতেছে।

এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বৃটিস শাসন কেমন করিয়া ভারতবাসিগণের বীর্য্যহানির কারণ হইল? বৃটিস গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসিগণকে নিরস্ত্র করিয়াছেন, এবং সৈনিক বিভাগের সামান্য সিপাহির কর্ম্ম ভিন্ন অন্যান্য উচ্চ পদ সকলে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত রাখিয়াছেন, ইহাতেই আমাদের জাতীয় বীর্য্যের স্ফূর্ত্তি ও বিকাশের আশা এককালীন বিদূরিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বৃটিস গবর্ণমেণ্টের এ প্রকার করিবার উদ্দেশ্য কি? এপ্রশ্নের এক সহজ উত্তর এই যে, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বিশ্বাস করেন না, আমাদিগকে সম্পূর্ণ রাজভক্ত প্রজা বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু এই উত্তরের সহিত গবর্ণমেণ্টের নিজের কথার সঙ্গতি হইতেছে না। বৃটিস গবর্ণমেণ্ট বহুকাল হইতে সুসভ্য জগতের সম্মুখে বলিয়া আসিতেছেন যে, ভারতবর্ষীয়গণ তাঁহাদের সুশাসনগুণে তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। অনেক দিন হইতে এ কথা আমাদের রাজপুরুষগণ পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন। এই সে দিন দিল্লির রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞী ও তাঁহার প্রতিনিধি স্পষ্টাক্ষরে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, ভারতবর্ষবাসিগণ মহারাণীর একান্ত অনুগত ও রাজভক্ত প্রজা। তাহাই যদি হইল তবে আবার তাহাদিগকে এত অবিশ্বাস কেন? তাহাই যদি হইল তবে আবার তাহাদিগকে উচ্চতর সৈনিক পদে নিযুক্ত করিতে আপত্তি কেন? তাহাই যদি হইল তবে যুদ্ধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদিগকে সামরিক কৌশল শিক্ষা দিতে আশঙ্কা কেন? মুসলমান সম্রাট-

দিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর-হৃদয়, অত্যাচারী ছিলেন, তিনি পর্য্যন্ত আমাদিগের প্রতি যে প্রসাদ বিতরণে কৃপণতা করেন নাই, সুসভ্য খ্রীষ্টিয়ান্, জ্ঞানালোকসম্পন্ন বৃটিস গবর্ণমেণ্ট কি তাহাই করিবেন? যশোবন্ত সিং—এক জন হিন্দু, আরঙ্গজীবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

এক্ষণে পঞ্জাববাসিগণের সামাজিক অবস্থার বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করে। বোম্বাই প্রদেশের ন্যায় পঞ্জাবে অবরোধ প্রথা নাই। ভদ্রপরিবারের স্ত্রীলোকগণকেও প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া যথা তথা গমন করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশের স্ত্রীস্বাধীনতা ও পঞ্জাব প্রদেশের স্ত্রী-স্বাধীনতার মধ্যে প্রভেদ আছে। প্রথম প্রভেদ এই যে, পঞ্জাবে অবগুণ্ঠন প্রচলিত আছে কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে তাহা আদবে নাই। পঞ্জাব প্রদেশে স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণরূপে মুখ অনাবৃত করিয়া পথ দিয়া চলিয়া যান, কিন্তু যখনই কোন ভক্তিভাজন আত্মীয় বা সম্মানযোগ্য পরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে পড়েন, তৎক্ষণাৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া দেন। অনেক সময় এমনও দৃষ্ট হয় যে, অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে গম্ভীর বজ্রধ্বনিতে চীৎকার করিতে থাকেন, অথচ মুখটি বাহির করিতেই যত আপত্তি। কেবল পঞ্জাবে কেন? ভারতের অনেক স্থানেই উক্তরূপ রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। ভূপালের বেগম বাক্‌পটুতা প্রকাশ করিয়া দিল্লির সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া গেলেন, অথচ মহা অনুরোধেও লর্ড লিটনকে আপনার মুখ দেখাইতে সম্মত হইলেন না। বোম্বাই ও বাঙ্গালাশীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে অবরোধ প্রথা ছিল না। তৎকালীন রমণীকুলের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে মহারাষ্ট্রীয় অপেক্ষা পঞ্জাবী স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার অপেক্ষাকৃত অধিকতর মিল দৃষ্ট হয়। প্রাচীন শাস্ত্রে বহুল পরিমাণে স্ত্রীলোকের অবগুণ্ঠনের কথা উক্ত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় নারীদিগের মধ্যে অবগুণ্ঠন প্রচলিত নাই; পঞ্জাবী নারীদিগের মধ্যে আছে। সুতরাং প্রাচীন ভারতের রমণীদিগের সহিত পঞ্জাববাসিনীদিগের অবস্থার অধিকতর সৌসাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, বোম্বাই অপেক্ষা পঞ্জাবের স্ত্রী-স্বাধীনতা পরিমাণে অল্প বলিয়া বোধ হয়।

পঞ্জাবে একটি অতি কদর্য্য রীতি প্রচলিত আছে। তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্যরূপে নদীতে বিবস্ত্র হইয়া স্নান করিয়া থাকেন। শত শত যুবতী নারী চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, ইরাবতী প্রভৃতি নদীতে উলঙ্গ হইয়া স্নান করিতেছে, লেশমাত্র লজ্জা নাই। তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী পুরুষগণও এই কদর্য্যব্যবহার দেখিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইতেছে না। বাস্তবিক কোন একটি প্রথা যত কেন

জঘন্য হউক না বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিলে লোকে উহার জঘন্যতা অনুভব করিতে পারে না। লাহোর নগরের ভিতর নগরবাসিগণের সুবিধার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল সকল প্রবাহিত রহিয়াছে। ঐ সকল খালে স্থানে স্থানে বৃটিস্ গবর্ণমেণ্ট চতুর্দ্দিকে প্রাচীরপরিবেষ্টিত স্নানাগার সকল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এখন স্ত্রীলোকদিগকে উহারই মধ্যে গিয়া স্নান করিতে হয়। কিন্তু যাহারা রাবী (ইরাবতী) নদীতে স্নান করিয়া থাকে তাহাদিগের জন্য কোন উপায়ই করা হয় নাই।

এস্থলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, এই সৃষ্টিছাড়া প্রথা কোথা হইতে আসিল? আমাদের উত্তর এই যে উহা একটি সনাতন আর্য্য প্রথা। আলোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীতি হয় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে উক্ত প্রথা আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। কালসহকারে ইহা অনেক স্থানে বিলুপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু অদ্যাবধি সকল স্থান হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। আর্য্যবংশসম্ভূত কোন কোন ইউরোপীয় জাতির মধ্যেও অদ্যাবধি উক্ত প্রথার কিছু কিছু চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

উক্ত প্রথার প্রাচীনত্ব বিষয়ে প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপীদিগের বস্ত্রহরণের পুরাতন অখ্যায়িকা একটি সুন্দর প্রমাণ। তদ্ভিন্ন শাস্ত্রে অন্য প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাগবতে আছে যে, একদা মহর্ষি শুকদেব ও তৎপশ্চাৎ মহর্ষি দ্বৈপায়ন ব্যাস চন্দ্রভাগা নদীতীর দিয়া গমন করিতেছিলেন। দেবীরা তৎকালে নদীতে বিবস্ত্রা হইয়া স্নান করিতেছিলেন। তাঁহারা নগ্ন যুবা শুকদেবকে দেখিয়া কিছুমাত্র লজ্জা করিলেন না। কিন্তু অনগ্ন বৃদ্ধ ব্যাসকে দেখিয়া লজ্জাপূর্ব্বক বস্ত্রগ্রহণ করিলেন। ইহাতে ব্যাসদেব দেবীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনারা শুকদেবকে দেখিয়াই বা কেন লজ্জা করিলেন না এবং আমাকে দেখিয়াই বা কেন লজ্জা করিলেন? ইহাতে দেবীরা বলিলেন যে, তোমার স্ত্রী পুরুষ ভেদজ্ঞান আছে সেই জন্য তোমাকে দেখিয়া লজ্জা করিলাম। কিন্তু শুকদেবের দৃষ্টি বিবেকযুক্ত সেই জন্য তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জা করিলাম না। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকবর্গের জন্য নিম্নে ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

দৃষ্ট্বানুযান্তমৃষিমাত্মজমপ্যনগ্নং
দেব্যো হ্রিয়া পরিদধুর্ন সুতস্য চিত্রং।
তদ্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগদুস্তবাস্তি
স্ত্রী পুং ভিদা ন সুতস্য বিবিক্তদৃষ্টেঃ॥

শ্রী ভাং ১ স্কঃ ৪ অধ্যায় ৫

শ্রী ন না।

তর্ক সংগ্রহ।

অর্থাৎ।

(সংস্কৃত ন্যায় দর্শনসম্মত কতগুলি তর্ক)

প্রথম তর্ক—মঙ্গলাচরণ।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে গ্রন্থারম্ভের প্রথমে মঙ্গলাচরণ একটী অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। দর্শনশাস্ত্রের সারসংগ্রহ করিয়াই হউক, শৃঙ্গার রসের অত্যুৎকৃষ্ট অনুভাব সকল প্রকাশ করিয়াই হউক, আর হাস্যরস ব্যঙ্গ করিয়াই হউক, যেরূপে হউক মঙ্গলাচরণ করিলে আর কোন দোষ থাকিত না, মঙ্গলাচরণ না করাই মহাপাপ, যিনি এই মঙ্গলাচরণ না করিতেন তিনিই নাস্তিক ও সমাজের ঘৃণাস্পদ হইতেন। অদ্যাপি এদেশে মঙ্গলাচরণের প্রথা একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও অনেক স্থলে গ্রন্থকারের কথা দূরে থাকুক, প্রাচীন গ্রন্থের সংস্কারকদিগকেও স্বকৃত সংস্করণের পূর্ব্বে মঙ্গলাচরণ করিতে দেখা যায়। এ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদিগের তর্ক সংগ্রহ করা যাইতেছে।

প্রশ্ন এই যে মঙ্গলাচরণের ফল কি? যদি বল নির্ব্বিঘ্নে অভীপ্সিত গ্রন্থের পরিসমাপ্তিই ইহার ফল, তাহা হইতে পারে না। কারণ আমরা দেখিতেছি 'কিরণাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে মঙ্গলাচরণের নামমাত্র না থাকিলেও তাহারা নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং কাদম্বরীর প্রথমে বিস্তার পূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ থাকিলেও বাণভট্ট তাহা সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই—তবে এই মঙ্গলাচরণের ফল কি? এই আশঙ্কা করিয়া প্রাচীন আর নবীন নৈয়ায়িকগণ যেরূপ সমাধান করিয়াছেন তাহা যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।

প্রাচীনেরা বলেন "মঙ্গলাচরণ আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ উহা শিষ্টপরম্পরাসমাচরিত। শিষ্ট ব্যক্তিরা সমাজের মস্তক স্বরূপ, তাঁহাদিগের কার্য্য কখনই বালকের জলক্রীড়ার ন্যায় নিষ্ফল হইতে পারে না। তাঁহাদের যাবতীয় কার্য্যের ফল আছে, সুতরাং মঙ্গলাচরণের একটী ফল অবশ্য স্বীকার্য্য এক্ষণে যদি কোন রূপে সেই ফলকে দৃষ্ট অর্থাৎ ঐহিক কার্য্যকারী করা যায়, তবে স্বর্গভোগাদির ন্যায় অদৃষ্ট রূপ কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি? বিঘ্ন ধ্বংস পূর্ব্বক গ্রন্থের সমাপ্তি হওয়াই মঙ্গলাচরণের ফল। মঙ্গলাচরণ অসত্ত্বেও যাঁহাদের গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়, তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মকৃত মঙ্গলপ্রাবল্য স্বীকার করিতে হইবে, আর মঙ্গলাচরণ সত্ত্বেও যাঁহাদের গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় নাই তাঁহাদের মঙ্গল অপেক্ষা বিঘ্নের প্রাচুর্য্য মানিতে হইবে,

অর্থাৎ যে পরিমাণে মঙ্গলাচরণ হইয়াছিল তাহা সমুদায় বিঘ্ন ধ্বংস করিতে সক্ষম হয় নাই।"

প্রাচীনদিগের সহিত নবীনদিগের মত প্রায় তুল্যরূপ, প্রভেদের মধ্যে এই যে নবীনদিগের মতে বিঘ্নধ্বংসই মঙ্গলাচরণের একমাত্র ফল, তবে সমাপ্তি হওয়া না হওয়ার প্রতি গ্রন্থকারদিগের প্রতিভাদি কারণ। গ্রন্থকারদিগের প্রতিভাদিগুণ থাকিলে গ্রন্থসম্পূর্ণ হইবে অন্যথা মঙ্গলাচরণ করিলেও গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবে না। ইহাদের মতেও যেখানে মঙ্গলাচরণের অভাব অথচ নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তি দেখা যায়, সেখানে জন্মান্তরীণ মঙ্গলদ্বারা বিঘ্নের নাশ স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি বিঘ্ন ধ্বংসই মঙ্গলাচরণের ফল তবে যেখানে কোন বিঘ্ন নাই, সেখানে মঙ্গলাচরণেরও আবশ্যকতা নাই, সেখানে মঙ্গলাচরণ নিষ্ফল, আর কোথায় বিঘ্ন আছে না আছে ইহা জানিবারও কোন সহজ উপায় নাই সুতরাং সকল স্থানেই মঙ্গলাচরণ করিতে হইবে। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ বিঘ্নাভাব স্থলে মঙ্গলাচরণ নিষ্ফল হওয়ায় শিষ্টাচারানুমিত মঙ্গলাচরণবিষয়ক বেদবচনেরও অপ্রামাণ্য হইল। ইহার উত্তরে নবীনেরা বলিয়াছেন যে, যেমন পাপ না থাকিলেও পাপ ভ্রমে প্রায়শ্চিত্ত করিলে প্রায়শ্চিত্তপ্রবর্ত্তক বেদবচনের অপ্রামাণ্য নাই—কারণ প্রায়শ্চিত্তের পাপনাশকারিণী শক্তি পাপ থাকিলে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা অবশ্যই বিনষ্ট হয়, সেইরূপ বিঘ্ন থাকিলে মঙ্গলাচরণেরদ্বারা বিনষ্ট হয়। মঙ্গলাচরণের বিঘ্ননাশকারিণীশক্তি এবং বিঘ্ননাশ করিবার নিমিত্তই ইহার প্রবৃত্তি হয়।

আমরা যখন কেবল প্রাচীন ন্যায়মত সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তখন তাহাই প্রকাশ করিয়া আমাদিগের নিরস্ত থাকা উচিত, তথাপি এখানে আর দুই একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

পণ্ডিতেরা যে মঙ্গলাচরণের প্রতি শিষ্টাচারকে হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। যে শিষ্টের আচারে শাস্ত্রনিষিদ্ধ না হইলেও ভিন্নদেশীয় কি একদেশীয় ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণেরাও পরস্পর বৈবাহিকাদিব্যবহার করিতে সক্ষম নহেন, যে শিষ্টের আচারে হিন্দুগণ মুসলমানের পক্ব গুড়াদি অনায়াসে দৈব পিতৃকার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদিগের স্পৃষ্ট জলাদির অন্য ব্যবহার দূরে থাকুক কোন রূপে পরম্পরা স্পর্শ করিলে স্নান করিতে বাধ্য হন, যে শিষ্টের আচারে পলাণ্ডু আর খর্জ্জুররস শাস্ত্রদ্বারা সমানরূপে নিষিদ্ধ হইলেও মহারাষ্ট্রদেশে পলাণ্ডু এবং বঙ্গদেশে খর্জ্জুররসের নির্ব্বিবাদে ব্যবহার হইয়া থাকে, আর যে শিষ্টের আচারে শূদ্রকন্যাসংসর্গী ব্রাহ্মণের কোন সামাজিক ক্ষতি হয় না কিন্তু শূদ্রকন্যা

বিবাহকারী বৈশ্যেরও সমাজচ্যুত হইতে হয় সেই শিষ্টাচারানুরোধে স্বকীয় গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ কিছু অধিক কথা নয়। তবে ফলের বিষয় প্রাচীনেরা যাহা বলিয়াছেন তাহা একপ্রকার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। নবীনদিগের সূক্ষ্ম মতে আমাদের বুদ্ধির প্রবেশ হইল না, কারণ আমরা জানি গ্রন্থসমাপ্তির প্রতি যতগুলি প্রতিবন্ধক, তাহারা সকলেই বিঘ্ন, গ্রন্থকারদিগের প্রতিভাদির অভাব গ্রন্থসমাপ্তির প্রতি প্রতিবন্ধক, অতএব উহাও বিঘ্ন, মঙ্গলাচরণদ্বারা যদি সকল বিঘ্নের ধ্বংস হইল তবে যে গ্রন্থ কেন সম্পূর্ণ হইবে না ইহা সেই সূক্ষ্ম বুদ্ধি নব্য নৈয়ায়িকেরা বুঝিয়াছেন।

দ্বিতীয় তর্ক—ঈশ্বরাস্তিত্ব।

পূর্ব্বে যে মঙ্গলাচরণের বিষয় উল্লেখ করা গেল, উহা আর কিছুই নয়, কেবল গ্রন্থের আদিতে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান চরাচর জগন্মণ্ডলের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী জগদীশ্বরের স্তবপাঠ বা নামসঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি। এ স্থলে একথাও বলা আবশ্যক যে, যদ্যপি অনেক গ্রন্থের আদিতে গণেশ, শিব ও দুর্গা প্রভৃতি দেবতাবিশেষের স্তবপাঠাদি লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু সেই সেই স্থলে সেই সেই দেবতাবিশেষকে প্রায় ঐশ্বরিক গুণসমষ্টি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া স্তব করা হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রের সারমর্ম্মই এই যে "নদীসকল যেমন নানা পথে প্রবাহিত হইয়াও পরিশেষে সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইরূপ মনুষ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে দেবতারই উপাসনা করুক না কেন সেই একমাত্র জগদীশ্বরই ঐ উপাসনার লক্ষ্য স্থল।"

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, যদি ঈশ্বরনামক কোন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন কোন বস্তু থাকিলে তাঁহার স্তবপাঠাদিতে মঙ্গল হয় হৌক, কিন্তু ঈশ্বরের স্থিতি বিষয়ে প্রমাণ কি? তাঁহার রূপাদি না থাকায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে না। যদি বল 'দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ" ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। তাহাও হইতে পারে না, কারণ শ্রুতি সকল ঈশ্বরকর্ত্তৃক উচ্চারিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, এক্ষণে যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ হইল তবে তদুচ্চারিত বেদের উপরই বা কিরূপে দৃঢ় বিশ্বাস হইতে পারে।

ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকেরা* অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপিত করিয়াছেন। সে অনুমানের আকার এই যে,

"আমরা এই জগতে ঘট পট প্রভৃতি যে সমুদয় কার্য্য দেখিতেছি তাহাদিগের সকলেরই এক একটী কর্ত্তা আছে, এই

---

* নৈয়ায়িকেরা চারিপ্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। অতএব অনুমানদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখাইতে পারিলে উহা সপ্রমাণ করা হয়।

বিচিত্র বিশ্বমণ্ডলের রচনা, এবং যথানিয়মে পরিপালনাদিও কার্য্য সুতরাং তাহাদিগেরও যে একটী কর্ত্তা আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। একজন কর্ত্তা না থাকিলে কে এই তেজোরাশি সূর্য্যমণ্ডলকে সৌরজগতের কেন্দ্রস্থানে স্থাপিত করিয়া শত শত গ্রহগণকে উহার চতুর্দ্দিকে যথানিয়মে ঘুরাইতেছে? কাহার আজ্ঞা শ্রবণ করিয়াইবা ঋতুগণ সময়োচিত ফল পুষ্পাদিদ্বারা যথাসময়ে প্রকৃতিকে অলঙ্কৃত করিতেছে ? এবং কাহার কথা শুনিয়াই বা নগর বন এবং বন নগর হওয়া প্রভৃতি বিচিত্র ঘটনাবলী প্রতিক্ষণে সঙ্ঘটিত হইতেছে ?। সে কর্ত্তৃত্ব আমাদের সম্ভবে না, কারণ সৃষ্টির আরম্ভক্ষণে আমরা বর্ত্তমান ছিলাম না, তৎকালীন কার্য্যের উপর কিরূপে আমাদের কর্ত্তৃত্ব হইবে ? এবং আমরা সম্যক্ চেষ্টা করিয়াও কোন বৃক্ষের অঙ্কুর বা পর্ব্বতাদির সৃষ্টি করিতে পারি না। তাহাদের সৃষ্টির নিমিত্ত আর একটি স্বতন্ত্র কর্ত্তা স্বীকার করিতে হইতেছে। সেই কর্ত্তাই ঈশ্বর।”

ন্যায় শাস্ত্রের আদিমাচার্য্য মহর্ষি গৌতমও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—

(ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষ কর্ম্মাফল্য দর্শনাত্) ৪ অ ১ আ ১৯ সূ। সমুদয় বিশ্ব কার্য্যের প্রতি ঈশ্বরই কারণ উহার উপর ঈশ্বর ভিন্ন অস্মদাদির কর্ত্তৃত্ব সম্ভবে না, যে হেতু আমরা সামান্য ঘটাদিকার্য্যের নির্ম্মাণাদি বিষয়ে সমীচীন চেষ্টা করিয়াও অনেক স্থলে কৃতকার্য্য হই না; তখন কিরূপে এই অনন্ত জগন্মণ্ডলের কার্য্য কলাপকে সুনিয়মে পরিচালিত করিতে সক্ষম হইব ? কেহ২ এই সূত্রের এই রূপ ব্যাখ্যা করেন যে, আমরা দেখিতেছি মনুষ্যেরা যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন সচরাচর তদনুগত ফললাভ হয় না, এমন কি কখন২ তাহার বিপরীত ফলও ঘটিয়া থাকে, সুতরাং আমাদের কর্ম্মফললাভকে কোন অপর কারণেরই সম্পূর্ণ অধীন বলিতে হইতেছে, সেই অপর কারণই ঈশ্বর।

গৌতম ঈশ্বরকে কারণ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু পুরুষকারকেএকবারে পরিহার করেন নাই। তিনি বলেন সত্য-বটে যদি কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সমুদয় ফললাভ হইত তাহা হইলে আমাদের চেষ্টাব্যতীতও ফল লাভ হইতে পারিত একথা সত্য, তথাপি—

(তৎ কারিত্বাদ্ হেতুঃ) ৪অ, ১আ ২১সূ ঈশ্বরের অনুগ্রহেই পুরুষকার ফলবান্ হয়, অন্যথা নহে। অর্থাৎ সুবিজ্ঞ পিতা যেমন পুত্রগণের কার্য্যানুসারে তাহাদিগকে অভিনন্দিত করেন সেইরূপ সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে স্বকীয় কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

আমরা এখন প্রকৃত বিষয় ত্যাগ করিয়া কথাপ্রসঙ্গে যতটুকু আসিয়াছি

† ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ (যৎ২ যৎ কার্য্যং তৎ কর্ত্তৃজন্যং ঘটবৎ।

বোধ হয় তাহাতে উপকার ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই।

যাহা হউক নৈয়ায়িক দিগের পূর্ব্বোক্ত অনুমানের উপর কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল যে, তোমরা যেমন ঘটাদি রূপ কার্য্যকে কর্ত্তৃজন্য দেখিয়া ক্ষিত্যাদিকার্য্যকেও কর্ত্তৃজন্য রূপে অনুমান করিতেছ এবং সেই কর্ত্তাকে ঈশ্বর বলিতেছ, আমরাও আবার ইহার প্রতিকূলে অপরবিধ অনুমান করিয়া ঐ অনুমানকে অসিদ্ধ করিতে পারি।*

যথা—

যাহারা শরীরহইতে উৎপন্ন নয় তাহারা কর্ত্তৃজন্য নয়, (যেমন আকাশাদি) পৃথিবী প্রভৃতিও শরীর হইতে উৎপন্ন হয় নাই অতএব উহারাও কর্ত্তৃজন্য নয়।†

ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলিয়াছেন এ আশঙ্কা ঠিক নহে। যে হেতু তোমাদের অনুমানে অনুকূল তর্ক নাই —অর্থাৎ তোমরা এ কথা বলিতে পার না যে, যাহারা কর্ত্তৃজন্য তাহারাই শরীরজন্য এবং যাহারাকর্ত্তৃজন্য নয় তাহারা শরীর জন্য নয়। কারণ আমরা স্বেদজ দংশ মশকাদির উৎপত্তির প্রতি কোন কর্ত্তা দেখিতে পাই না কিন্তু তাহারা শরীরজন্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের মতে এ দোষ নাই; আমাদের অনুকূল তর্ক আছে; আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যাহারা কর্ত্তৃজন্য তাহারাই কার্য্য এবং যাহারা কর্ত্তৃজন্য নয় তাহারা কার্য্য নয়।

নৈয়ায়িকগণ অনুমান দ্বারা যেরূপে ঈশ্বরের অভীষ্টসিদ্ধ করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম একপ্রকার প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে ন্যায়সম্মত ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার বিশ্বনাথ ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন—

(ন ঈশ্বর এব কঃ ইত্যত্র ভাষ্যং—

গুণবিশিষ্ট মাত্মান্তরমীশ্বরঃ। গুণৈর্নিত্য জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নৈঃ সামান্য গুণৈর্যোগাদিভি র্বিশিষ্ট মাত্মান্তরং জীবেভ্যো ভিন্ন আত্মা জগদাধারঃ সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা বেদদ্বারা হিতাহিতোপদেশকো জগতঃ পিতা। ইত্যাদি। ঈশ্বরের স্বরূপ ভাষ্যে এই রূপ কথিত হইয়াছে যে ঈশ্বর নিত্যজ্ঞান, নিত্যইচ্ছা, নিত্যপ্রযত্ন ও যোগাদি গুণ দ্বারা ইতর জীব হইতে বিশিষ্ট এবং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী। তিনি বেদদ্বারা হিতাহিত উপদেশ করেন এবং জগতের পিতা স্বরূপ।

তর্ক দীপিকা নামক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে "নিত্যজ্ঞানাধিকরণত্ব মীশ্বরত্বম্"

ঈশ্বর নিত্যজ্ঞানের আধার। জীবের

---

* কোন অনুমানের প্রতিকূলে আর একটি অনুমান করিলে সৎপ্রতিপক্ষ নামক দোষের আরোপ হয়। পরে দেখান হইবে।

† ক্ষিত্যাদিকং কর্ত্তৃজন্যং শরীরাজন্যত্বাৎ আকাশাদিবৎ।

যে সকল জ্ঞান হয় তাহা অনিত্য তাহা কিছুক্ষণ পরে নষ্ট হয় ঈশ্বরের জ্ঞান নষ্ট হয় না।

এক্ষণে একথাও বক্তব্য যে নৈয়ায়িক দিগের মতে ঈশ্বর সর্ব্বস্রষ্টা নন কিন্তু এক লোকাতীত নিয়ন্তা। কুম্ভকার যেরূপ মৃত্তিকা জল প্রভৃতিকে উপাদান করিয়া দণ্ড চক্রাদির সহায়তায় ঘট নির্ম্মাণ করে, তন্তুবায় যেমন তন্তুকে উপাদান করিয়া তুরী প্রভৃতির সহায়তায় বস্ত্রবয়ন করে ঈশ্বরও সেইরূপ অবিনশ্বর পরমাণু সকলকে উপাদান করিয়া জীবদিগের অদৃষ্টের সহায়তায় এই পরিতঃ পরিদৃশ্যমান এই চরাচর জগন্মণ্ডলের সৃষ্টি প্রভৃতির সাধন করিতেছেন। তাঁহাদের মতে যত দিন অবধি জীবগণের কর্ম্মফল রূপ অদৃষ্ট থাকিবে ততদিনই জগতের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হইবে, অদৃষ্টের একবারে অভাব হইলে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে তাহার পর আর সৃষ্টি হইবে না।

ঈশ্বরকে লইয়া অধিক আন্দোলন করিলে পরিশেষে হয় ত শিষ্টজনবিগর্হিত নাস্তিকতাদোষে দূষিত হইয়া পড়িব এই আশঙ্কায় আমরা, ন্যায়মতের স্থূল মর্ম্ম মাত্র সংগ্রহ করিয়া বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইলাম। আমাদের মতে সেই জগৎ পিতা করুণাময় পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে যত যুক্তি পাওয়া যায় ভালই না হয় বিশ্বাসকে সর্ব্বদা দৃঢ় করা সংসারধর্ম্মীর পক্ষে অনন্তমঙ্গলকর। কারণ সংসার ধর্ম্ম করিতে২ এমন সকল ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হয় যাহাতে সেই করুণাময়ের চরণ ভিন্ন আমাদিগের হৃদয়ের আর কিছুই শান্তিপ্রদ বিশ্রাম স্থান লক্ষিত হয় না।

কৃষ্ণকান্তের উইল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"কি অপরাধ আমি করিয়াছি যে আমাকে ত্যাগ করিবে?"

একথা ভ্রমর গোবিন্দলালকে মুখে বলিতে পারিল না—কিন্তু এই ঘটনার পর পলে পলে, মনে মনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আমার কি অপরাধ?

গোবিন্দলালও মনে২ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, যে ভ্রমরের কি অপরাধ? ভ্রমরের যে বিশেষ গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, তাহা গোবিন্দলালের মনে এক প্রকার স্থির হইয়াছে। কিন্তু অপরাধটা কি, তাহা তত ভাবিয়া দেখেন নাই। ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনে হইত, ভ্রমর যে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছিল, অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে এত কঠিন পত্র লিখিয়াছিল—একবার তাঁহাকে মুখে সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিল না, এই

তাহার অপরাধ। যার জন্য এত করি, সে এত সহজে আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, এই তাহার অপরাধ। আমরা কুমতি সুমতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গোবিন্দলালের হৃদয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিয়া, কুমতি সুমতি যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহা সকলকে শুনাইব।

কুমতি বলিল, "ভ্রমরের এইটি প্রথম অপরাধ—এই অবিশ্বাস।"

সুমতি উত্তর করিল, "যে অবিশ্বাসের যোগ্য—তাহাকে অবিশ্বাস না করিবে কেন? তুমি রোহিণীর সঙ্গে এই আনন্দ উপভোগ করিতেছ—ভ্রমর সেইটা সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়াই তার এত দোষ?"

কুমতি। এখন যেন, আমি অবিশ্বাসী হইয়াছি, কিন্তু যখন ভ্রমর অবিশ্বাস করিয়াছিল—তখন আমি নির্দ্দোষী।

সুমতি। দুদিন আগে পাছেতে বড় আসিয়া যায় না—দোষ ত করিয়াছ। যে দোষ করিতে সক্ষম, তাহাকে দোষী মনে করা কি এত গুরুতর অপরাধ?

কুমতি। ভ্রমর আমাকে দোষী মনে করিয়াছে বলিয়াই আমি দোষী হইয়াছি। সাধকে চোর বলিতে২ চোর হয়।

সুমতি। দোষটা যে চোর বলে তার, যে চুরি করে তার কিছু নয়?

কুমতি। তোর সঙ্গে ঝকড়ায় আমি পারবনা। দেখনা ভ্রমর আমার কেমন অপমানটা করিল? আমি বিদেশ থেকে আস্‌ছি শুনে বাপের বাড়ী চলিয়া গেল?

সুমতি। যদি সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া থাকে তবে সে সঙ্গত কাজই করিয়াছে। স্বামী পরদারনিরত হইলে নারীদেহ ধারণ করিয়া কে রাগ না করিবে? সেই বিশ্বাসই তাহার ভ্রম—আর দোষ কি?

কুমতি। এমন বিশ্বাস করিল কেন?

সুমতি। এ কথা কি তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছ?

কুমতি। না।

সুমতি। তুমি না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিতেছ আর ভ্রমর, নিতান্ত বালিকা না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিয়াছিল, বলিয়া এত হাঙ্গাম? সে সব কাজের কথা নহে—আসল রাগের কারণ কি বলিব?

কুমতি। কি বল না?

সুমতি। আসল কথা রোহিণী। রোহিণীতে প্রাণ পড়িয়াছে—তাই আর কালো ভোমরা ভাল লাগে না।

কুমতি। এত কাল ভোমরা ভাল লাগিল কিসে?

সু। এত কাল রোহিণী জোটে নাই। এক দিনে কোন কিছু ঘটে না। সময়ে সকল উপস্থিত হয়। আজ রৌদ্রে ফাটিতেছে বলিয়া কাল দুর্দ্দিন হইবে না কেন? শুধু কি তাই—আরও আছে।

কুমতি। আর কি?

সুমতি। কৃষ্ণকান্তের উইল। বুড়া মনে মনে জানিত ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গেলে—বিষয় তোমারই রহিল। ইহাও জানিত

যে ভ্রমর এক মাসের মধ্যে তোমাকে উহা লিখিয়া দিবে। কিন্তু আপাততঃ তোমাকে একটু কুপথগামী দেখিয়া তোমার চরিত্রশোধন জন্য তোমাকে ভ্রমরের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া গেল। তুমি অতটা না বুঝিয়া ভ্রমরের উপর রাগিয়া উঠিয়াছ।

কুমতি। তা সত্যই। আমি কি স্ত্রীর মাসহারা খাইব না কি?

সুমতি। তোমার বিষয় তুমি কেন ভ্রমরের কাছে লিখিয়া লও না?

কুমতি। স্ত্রীর দানে দিনপাত করিব?

সুমতি। অরে বাপ রে। কি পুরুষ সিংহ! তবে ভ্রমরের সঙ্গে মোকদ্দমা করিয়া ডিক্রী করিয়া লও না—তোমার পৈতৃক বিষয় বটে।

কুমতি। স্ত্রীর সঙ্গে মোকদ্দমা করিব?

সুমতি। তবে আর কি করিবে? গোল্লায় যাও।

কুমতি। সেই চেষ্টায় আছি।

সুমতি। রোহিণী—সঙ্গে যাবে কি?

তখন কুমতিতে সুমতিতে ভারি চুলোচুলি ঘুষাঘুষি আরম্ভ হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আমার এমন বিশ্বাস আছে যে গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে ফুৎকার মাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বধূর সঙ্গে তাঁহার পুত্রের আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে। স্ত্রীলোকে ইহা সহজেই বুঝিতে পারে। যদি তিনি এই সময়ে, সদুপদেশে, স্নেহবাক্যে, এবং স্ত্রীবুদ্ধিসুলভ অন্যান্য সদুপায়ে তাহার প্রতীকার করিতে যত্ন করিতেন, তাহা হইলে বুঝি সুফল ফলাইতে পারিতেন। কিন্তু গোবিন্দলালের মাতা বড় পাকা গৃহিণী নহেন, বিশেষ পুত্রবধূ বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছে বলিয়া ভ্রমরের উপরে একটু বিদ্বেষাপন্না হইয়াছিলেন। যে স্নেহের বলে তিনি ভ্রমরের ইষ্টকামনা করিবেন, ভ্রমরের উপর তাঁহার সে স্নেহ ছিল না। পুত্র থাকিতে, পুত্রবধূর বিষয় হইল, ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি একবারও অনুভব করিতে পারিলেন না, যে ভ্রমর গোবিন্দলাল অভিন্নসম্পত্তি জানিয়া, গোবিন্দলালের চরিত্রদোষসম্ভাবনা দেখিয়া, কৃষ্ণকান্ত রায় গোবিন্দলালের শাসন জন্য ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গিয়াছিলেন। একবারও তিনি মনে ভাবিলেন না, যে কৃষ্ণকান্ত মুমূর্ষু অবস্থায় কতকটা লুপ্তবুদ্ধি হইয়া, কতকটা ভ্রান্তচিত্ত হইয়াই এ অবিধেয় কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে পুত্রবধূর সংসারে তাঁহাকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী, এবং অন্নদাস পৌরবর্গের মধ্যে গণ্য হইয়া ইহজীবন নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অতএব এ সংসার ত্যাগ করাই ভাল, স্থির করিলেন। একে পতিহীনা, কিছু আত্মপরায়ণা, তিনি স্বামী বিয়োগকালি হইতেই কাশীযাত্রা

কামনা করিতেন, কেবল স্ত্রীস্বভাবসুলভ পুত্রস্নেহ বশতঃ এত দিন যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে সে বাসনা আরও প্রবল হইল। তিনি গোবিন্দলালকে বলিলেন, "কর্ত্তারা একে একে স্বর্গারোহণ করিলেন, এখন আমার সময় নিকট হইয়া আসিল। তুমি পুত্রের কাজ কর, এই সময় আমাকে কাশী পাঠাইয়া দাও।"

গোবিন্দলাল হঠাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বলিলেন, "চল, আমি তোমাকে আপনি কাশী রাখিয়া আসিব।" দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে ভ্রমর একবার ইচ্ছা করিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। কেহই তাঁহাকে নিষেধ করে নাই। অতএব ভ্রমরের অজ্ঞাতে গোবিন্দলাল কাশীযাত্রার সকল উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নিজনামে কিছু সম্পত্তি ছিল—তাহা গোপনে বিক্রয় করিয়া অর্থসঞ্চয় করিলেন। কাঞ্চন হীরকাদি মূল্যবান্ বস্তু যাহা নিজের সম্পত্তি ছিল—তাহা বিক্রয় করিলেন। এইরূপে প্রায় লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইল। গোবিন্দলাল ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে দিনপাত করিবেন স্থির করিলেন।

তখন মাতৃসঙ্গে কাশীযাত্রার দিন স্থির করিয়া ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইলেন। শাশুড়ী কাশীযাত্রা করিবেন শুনিয়া ভ্রমর তাড়াতাড়ি আসিল। আসিয়া শাশুড়ীর চরণে ধরিয়া অনেক বিনয় করিল; শাশুড়ীর পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, "মা, আমি বালিকা—আমায় একা রাখিয়া যাইও না—আমি সংসার ধর্ম্মের কি বুঝি? মা—সংসার সমুদ্র, আমাকে এ সমুদ্রে একা ভাসাইয়া যাইও না।" শাশুড়ী বলিলেন, "তোমার বড়ননদ রহিল। সেই তোমাকে আমার মত যত্ন করিবে—আর তুমিও গৃহিণী হইয়াছ।" ভ্রমর কিছুই বুঝিল না—কেবল কাঁদিতে লাগিল।

ভ্রমর দেখিল বড় বিপদ সম্মুখে। শাশুড়ী ত্যাগ করিয়া চলিলেন—আবার স্বামীও তাঁহাকে রাখিতে চলিলেন—তিনিও রাখিতে গিয়া বুঝি আর না আইসেন। ভ্রমর গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—বলিল, "কত দিনে আসিবে বলিয়া যাও।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "বলিতে পারি না। আসিতে বড় ইচ্ছা নাই।"

ভ্রমর পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মনে ভাবিল, "ভয় কি? বিষ খাইব।"

তার পরে স্থিরীকৃত যাত্রার দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিদ্রাগ্রাম হইতে কিছু দূর শিবিকারোহণে গিয়া টেন পাইতে হইবে। শুভ যাত্রিক লগ্ন উপস্থিত—সকল প্রস্তুত। ভারে ভারে সিন্দুক, তোরঙ্গ, বাক্স, বেগ, গাঁটরি, বাহকেরা বহিতে আরম্ভ করিল। দাস দাসী সুবিমল ধৌতবস্ত্র পরিয়া, কেশ রঞ্জিত করিয়া, দরওয়াজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পান চিবাইতে লাগিল—তাহারা সঙ্গে যাইবে। দ্বারবানেরা ছিটের জামার বন্ধক আঁটিয়া লাঠি হাতে করিয়া, বাহক-

দিগের সঙ্গে বকাবকি আরম্ভ করিল। পাড়ার মেয়ে ছেলে দেখিবার জন্য ঝুঁকিল। গোবিন্দলালের মাতা গুরু-দেবতাকে প্রণাম করিয়া, পৌরজন সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শিবিকারোহণ করিলেন, পৌরজন সকলেই কাঁদিতে লাগিল। তিনি শিবিকারোহণ করিয়া অগ্রসর হইলেন।

এদিকে গোবিন্দলাল অন্যান্য পৌরস্ত্রীগণকে যথোচিত সম্বোধন করিয়া শয়নগৃহে রোরুদ্যমানা ভ্রমরের কাছে বিদায় হইতে গেলেন। ভ্রমরকে রোদন-বিবশা দেখিয়া তিনি যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন তাহা বলিতে না পারিয়া কেবল বলিলেন, "ভ্রমর! আমি মাকে রাখিতে চলিলাম।"

ভ্রমর, চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "মা সেখানে বাস করিবেন। তুমি আসিবে না কি?"

কথা যখন ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, তখন তাহার চক্ষের জল শুকাইয়া গিয়াছিল; তাঁহার স্বরের স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, তাঁহার অধরে স্থিরপ্রতিজ্ঞা দেখিয়া গোবিন্দলাল কিছু বিস্মিত হইলেন। হঠাৎ উত্তর করিতে পারিলেন না। ভ্রমর স্বামীকে নীরব দেখিয়া পুনরপি বলিল,

"দেখ, তুমিই আমাকে শিখাইয়াছ, সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম, সত্যই একমাত্র সুখ। আজি আমাকে তুমি সত্য বলিও—আমি তোমার আশ্রিত বালিকা—আমায় আজি প্রবঞ্চনা করিও না—কবে আসিবে?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "তবে সত্যই শোন। ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই।"

ভ্রমর। কেন ইচ্ছা নাই—তাহা বলিয়া যাইবে না কি?

গো। এখানে থাকিলে তোমার অন্নদাস হইয়া থাকিতে হইবে।

ভ্রমর। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি ত তোমার দাসানুদাসী।

গো। আমার দাসানুদাসী, ভ্রমর, আমার প্রবাস হইতে আসার প্রতীক্ষায় জানেলায় বসিয়া থাকিবে। তেমন সময়ে সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া থাকে না।

ভ্রমর। তাহার জন্য কত পায়ে ধরিয়াছি—এক অপরাধ কি মার্জ্জনা হয় না?

গোবিন্দলাল। এখন সেরূপ শত অপরাধ হইবে। তুমি এখন বিষয়ের অধিকারিণী।

ভ্রমর। তা নয়। আমি এবার বাপের বাড়ী গিয়া, বাপের সাহায্যে যাহা করিয়াছি, তাহা দেখ।

এই বলিয়া ভ্রমর একখানা কাগজ দেখাইলেন। গোবিন্দলালের হাতে তাহা দিয়া বলিলেন, "পড়।"

গোবিন্দলাল পড়িয়া দেখিলেন—দানপত্র। ভ্রমর, উচিত মূল্যের ষ্টাম্পে, আপনার সমুদায় সম্পত্তি স্বামীকে দান করিতেছেন। তাহা রেজিষ্টরী হইয়াছে। গোবিন্দলাল পড়িয়া বলিলেন,

"তোমার যোগ্য কাজ তুমি করিয়াছ।

কিন্তু তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ? আমি তোমায় অলঙ্কার দিব তুমি পরিবে। তুমি বিষয় দান করিবে আমি ভোগ করিব—এ সম্বন্ধ নহে। এই বলিয়া গোবিন্দলাল, বহুমূল্য দানপত্র খানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

ভ্রমর বলিলেন, "পিতা বলিয়া দিয়াছেন, ইহা ছিঁড়িয়া ফেলা বৃথা। সরকারিতে ইহার নকল আছে।"

গো। থাকে, থাক। আমি চলিলাম।

ভ্র। কবে আসিবে?

গো। আসিব না।

ভ্র। কেন? আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা—তোমার দাসানুদাসী—তোমার কথার ভিখারী—আসিবে না কেন?

গো। ইচ্ছা নাই।

ভ্র। ধর্ম্ম নাই কি?

গো। বুঝি আমার তাও নাই।

বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জল রোধ করিল। হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল—ভ্রমর যোড়হাত করিয়া, অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল "তবে যাও—পার আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর।—কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও, একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও—একদিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম, আন্তরিক স্নেহ কোথায়?—একদিন তুমি বলিবে—আবার দেখিব ভ্রমর কোথায়? দেবতা সাক্ষী! যদি আমি সতী হই—যদি কায়মনোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি এ কথা নিষ্ফল হয় তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা—ভ্রমর অসতী। তুমি যাও আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই—রোহিণীর নও।"

এই বলিয়া ভ্রমর, ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া, গজেন্দ্রগমনে কক্ষান্তরে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এই আখ্যায়িকা আরম্ভের কিছু পূর্ব্বে ভ্রমরের একটি পুত্র হইয়া সূতিকাগারেই নষ্ট হয়। ভ্রমর আজি কক্ষান্তরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া, সেই সাতদিনের ছেলের জন্য কাঁদিতে বসিল। মেঝের উপর পড়িয়া, ধূলায় লুঠাইয়া অশমিত নিশ্বাসে পুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিল। "আমার ননীর পুত্তলী—আমার কাঙ্গালের সোনা, আজ তুমি কোথায়? আজি তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে? আমার মায়া কাটাইলেন, তোর মায়া কে কাটাইত? আমি কুরূপা কুৎসিতা—তোকে কে কুৎসিত বলিত? তোর চেয়ে কে সুন্দর? একবার দেখা দে বাপ্—এই

বিপদের সময় একবার কি দেখা দিতে পারিস্ না—মরিলে কি আর দেখা দেয় না ?—”

ভ্রমর তখন যুক্ত করে, মনে মনে, ঊর্দ্ধ-মুখে, অথচ অস্ফুটবাক্য দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—“কেহ আমাকে বলিয়া দাও—আমার কি দোষে, এই সতের বৎসর মাত্র বয়সে এমন অসম্ভব দুর্দ্দশা ঘটিল, আমার পুত্র মরিয়াছে—আমার স্বামী ত্যাগ করিল—আমার সতের বৎসর মাত্র বয়স। আমি এই বয়সে স্বামীর ভালবাসা বিনা আর কিছু ভালবাসি নাই—আমার ইহলোকে আর কিছু কামনা নাই—আর কিছু কামনা করিতে শিখি নাই—আমি আজ, এই সতের বৎসর বয়সে তাহাতে নিরাশ হইলাম কেন ?”

ভ্রমর কাঁদিয়া কাটিয়া সিদ্ধান্ত করিল—দেবতারা নিতান্ত নিষ্ঠুর। যখন দেবতা নিষ্ঠুর তখন মনুষ্য আর কি করিবে—কেবল কাঁদিবে ? ভ্রমর কেবল কাঁদিতে লাগিল।

এ দিকে গোবিন্দলাল, ভ্রমরের নিকট বিদায় হইয়া, ধীরে২ বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। আমরা সত্য কথা বলিব—গোবিন্দলাল চক্ষের জল মুছিতে২ আসিলেন। বালিকার, অতি সরল যে প্রীতি,—অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায়২ ব্যক্ত, যাহার প্রবাহ দিন রাত্র ছুটিতেছে—ভ্রমরের কাছে সেই অমূল্য প্রীতি পাইয়া গোবিন্দলাল সুখী হইয়াছিলেন, গোবিন্দলালের এখন তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে যাহা ত্যাগ করিলেন, তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না। ভাবিলেন যাহা করিয়াছি তাহা আর এখন ফিরে না—এখন ত যাই। এখন যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই। বুঝি আর ফেরা হইবে না। যাই হউক, যাত্রা করিয়াছি এখন যাই।

সেই সময়ে যদি গোবিন্দলাল দুই পা ফিরিয়া গিয়া, ভ্রমরের রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া একবার বলিতেন—ভ্রমর, আমি আবার আসিতেছি, তবে সকল মিটিত। গোবিন্দলালের, অনেকবার সে ইচ্ছা হইয়াছিল। ইচ্ছা হইলেও তাহা করিলেন না। ইচ্ছা হইলেও, একটু লজ্জা করিল। ভাবিলেন এত তাড়াতাড়ি কি ? যখন মনে করিব তখন ফিরিব। ভ্রমরের কাছে গোবিন্দলাল অপরাধী। আবার ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না। যা হয় একটা স্থির করিবার বুদ্ধি হইল না। যে পথে যাইতেছেন সেই পথে চলিলেন। তিনি চিন্তাকে বর্জ্জন করিয়া—বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সজ্জিত অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক, কশাঘাত করিলেন। পথে যাইতে২ রোহিণীর রূপরাশি হৃদয়মধ্যে ফুটিয়া উঠিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রথম বৎসর।

হরিদ্রাগ্রামের বাড়ীতে সম্বাদ আসিল, গোবিন্দলাল, মাতা প্রভৃতি সঙ্গে, নির্ব্বিঘ্নে সুস্থ শরীরে কাশীধামে পৌঁছিয়াছেন।

ভ্রমরের কাছে কোন পত্র আসিল না। অভিমানে ভ্রমরও পত্র লিখিলেন না। পত্রাদি আমলাবর্গের কাছে আসিতে লাগিল।

এক মাস গেল, দুই মাস গেল। পত্রাদি আসিতে লাগিল। শেষ এক দিন সম্বাদ আসিল যে গোবিন্দলাল কাশী হইতে বাটী যাত্রা করিয়াছেন।

ভ্রমর শুনিয়া বুঝিল যে গোবিন্দলাল কেবল মাকে ভুলাইয়া, অন্যত্র গমন করিয়াছেন। বাড়ী আসিবেন, এমন ভরসা হইল না।

এই সময়ে ভ্রমর গোপনে সর্ব্বদা রোহিণীর সম্বাদ লইতে লাগিল। রোহিণী রাঁধে বাড়ে, খায়, গা ধোয়, জল আনে। আর কিছুই সম্বাদ নাই। ক্রমে এক দিন সম্বাদ আসিল, রোহিণী পীড়িতা। ঘরের ভিতর মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকে, বাহির হয় না। ব্রহ্মানন্দ আপনি রাঁধিয়া খায়।

তার পর একদিন সম্বাদ আসিল, যে রোহিণী কিছু সারিয়াছে কিন্তু পীড়ার মূল যায় নাই। শূল রোগ—চিকিৎসা নাই—রোহিণী আরোগ্যজন্য তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যাইবে। শেষ সম্বাদ—রোহিণী হত্যা দিতে তারকেশ্বর গিয়াছে। একাই গিয়াছে—কে সঙ্গে যাইবে?

এ দিকে তিন মাস চারি মাস গেল—গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিল না। পাঁচ মাস ছয় মাস হইল, গোবিন্দলাল ফিরিল না। ভ্রমরের রোদনের শেষ নাই। মনে করিত, কেবল এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন, সম্বাদ পাইলেই বাঁচি। এ সম্বাদও পাই না কেন?

শেষ ননন্দাকে বলিয়া শ্বাশুড়ীকে পত্র লিখাইল—আপনি মাতা, অবশ্য পুত্রের সম্বাদ পান। শ্বাশুড়ী লিখিলেন তিনি গোবিন্দলালের সম্বাদ পাইয়া থাকেন। গোবিন্দলাল প্রয়াগ মথুরা জয়পুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া আপাততঃ দিল্লী অবস্থিতি করিতেছেন। শীঘ্র সেখান হইতে স্থানান্তরে গমন করিবেন। কোথাও স্থায়ী হইতেছেন না।

এ দিকে রোহিণীও আর ফিরিল না। ভ্রমর ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ জানেন রোহিণী কোথায় গেল? আমার মনের সন্দেহ আমি পাপ মুখে ব্যক্ত করিব না।

ভ্রমর আর সহ্য করিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে ননন্দাকে বলিয়া শিবিকারোহণে পিত্রালয়ে গমন করিলেন।

সেখানে গিয়া গোবিন্দলালের কোন সম্বাদ পাওয়া দুরূহ দেখিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া হরিদ্রাগ্রামেও স্বামীর কোন সম্বাদ না পাইয়া, আবার শ্বাশুড়ীকে পত্র লিখাইলেন। শ্বাশুড়ী এবার লিখিলেন, গোবিন্দলাল আর কোন সম্বাদ দেয় না; এখন সে কোথায় আছে জানিনা। কোন সম্বাদ পাই না। ভ্রমর আবার পিত্রালয় গেলেন। এই রূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেল। প্রথম বৎসরের শেষে ভ্রমর রুগ্নশয্যায় শয়ন করিলেন। অপরাজিতা ফুল শুকাইয়া উঠিল।

জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তের সমালোচনা।*

প্রথম ভাগ—মনুষ্যত্ব কি ?

মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিতে হইবে, আজিও মনুষ্য তাহা বুঝিতে পারে নাই। অনেক লোক আছেন, তাঁহারা জগতে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া আত্মপরিচয় দেন; তাঁহারা মুখে বলিয়া থাকেন, যে পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয়ই ইহজন্মে মনুষ্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকই বাক্যে না হউক, কার্য্যে এ কথা মানে না; অনেক লোক পরকালের অস্তিত্বই স্বীকার করে না। পরকাল সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় ইহলোকের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত হইলেও, পুণ্য কি সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ। এই বঙ্গদেশেই, এক সম্প্রদায়ের মত মদ্যপান পরকালের ঘোর বিপদের কারণ, আর এক সম্প্রদায়ের মত মদ্যপান পরকালের জন্য পরম কার্য্য। অথচ উভয় সম্প্রদায়ই বাঙ্গালি এবং উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দু। যদি সত্য সত্যই পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় মনুষ্যজন্মের প্রধান কার্য্য হয়, তবে সে পুণ্যই বা কি, কি প্রকারে তাহা অর্জ্জিত হইতে পারে, তাহার স্থিরতা কিছুই এপর্য্যন্ত হয় নাই।

মনে কর, তাহা স্থির হইয়াছে, মনে কর, ব্রাহ্মণে ভক্তি, গঙ্গাস্নান, তুলসীর মালা ধারণ, এবং হরিনামসঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি পুণ্য কর্ম্ম। ইহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। অথবা মনে কর, রবিবারে কার্য্যত্যাগ, গির্জায় বসিয়া নয়ন নিমিলন, এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ভিন্ন ধর্ম্মান্তরে বিদ্বেষ, ইহাই পুণ্য কর্ম্ম। যাহা হউক, একটা কিছু, আর কিছু হউক না হউক, দান দয়া সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি, পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহা দেখা যায় না, যে দান দয়া সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতিকে অধিক লোক জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া অভ্যস্ত এবং সাধিত করে। অতএব পুণ্য যে জীবনের উদ্দেশ্য, তাহা সর্ব্ববাদিস্বীকৃত নহে, যেখানে স্বীকৃত সেখানে সে বিশ্বাস মৌখিক মাত্র।

বাস্তবিক জীবনের উদ্দেশ্য কি এ তত্ত্বের প্রকৃত মীমাংসা লইয়া মনুষ্যলোকে আজিও বড় গোল আছে। লক্ষ২ বৎসর পূর্ব্বে, অনন্ত সমুদ্রের অতলস্পর্শ জলমধ্যে যে আণুবীক্ষণিক জীব বাস করিত, তাহার দেহতত্ত্ব লইয়া মনুষ্য বিশেষ ব্যস্ত, আপনি এ সংসারে আসিয়া কি করিবে, তাহা সম্যক্ প্রকারে স্থিরীকরণে তাদৃশ চেষ্টিত নহে। যে প্রকারে হউক, আপনার উদরপূর্ত্তি, এবং অপরাপর বাহ্যেন্দ্রিয় সকল চরিতার্থ করিয়া, আত্মীয় স্বজনেরও উদরপূর্ত্তি সংসাধিত করিতে পারিলেই অনেকে মনুষ্যজন্ম সফল বলিয়া বোধ করেন।

---

* জনষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ, প্রণীত। কলিকাতা, ১২৮৪।

তাহার উপর, কোন প্রকারে অন্যের উপর প্রাধান্যলাভ উদ্দেশ্য। উদর-পূর্ত্তির পর, ধনে হউক, বা অন্য প্রকারে হউক, লোকমধ্যে যথাসাধ্য প্রাধান্য লাভ করাকে মনুষ্যগণ, আপনাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে। এই প্রাধান্যলাভের উপায়, লোকের বিবেচনায় প্রধানতঃ ধন, তৎপরে রাজপদ ও যশঃ। অতএব ধন, পদ, ও যশঃ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া মুখে স্বীকৃত হউক বা না হউক, কার্য্যতঃ মনুষ্যলোকে সর্ব্ববাদিসম্মত। এই তিনটির সমবায়, সমাজে সম্পদ বলিয়া পরিচিত। তিনটির একত্রীকরণ দুর্লভ, অতএব দুই একটি, বিশেষতঃ ধন, থাকিলেই সম্পদ বর্ত্তমান বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই সম্পদাকাঙ্ক্ষাই সমাজমধ্যে লোকজীবনের উদ্দেশ্য স্বরূপ অগ্রবর্ত্তী, এবং ইহাই সমাজের ঘোরতর অনিষ্টের কারণ। সমাজের উন্নতির গতি যে এত মন্দ, তাহার প্রধান কারণই এই যে বাহ্যসম্পদ মনুষ্যের জীবনের উদ্দেশ্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।† কেবল সাধারণ মনুষ্যদিগের কাছে নহে, ইউরোপীয় প্রধান পণ্ডিত এবং রাজপুরুষগণের কাছেও বটে।

কদাচিৎ কখন এমন কেহ জন্মগ্রহণ করেন, যে তিনি সম্পদকে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যমধ্যে গণ্য করা দূরে থাকুক জীবনোদ্দেশ্যের প্রধান বিঘ্ন বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। যে রাজ্য সম্পদকে অপর লোকে, জীবনসফলকর বিবেচনা করে, শাক্যসিংহ তাহা বিঘ্নকর বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া ছিলেন। ভারতবর্ষে, বা ইউরোপে এমন অনেকই মুনিবৃত্তি মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন, যে তাঁহারা বাহ্য সম্পদকে ঐ রূপ ঘৃণা করিয়াছেন। ইঁহারা পরমার্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন এমত কথা বলিতে পারিতেছি না। শাক্যসিংহ শিখাইলেন—যে ঐহিক ব্যাপারে চিত্তনিবেশ মাত্র অনিষ্টপ্রদ, মনুষ্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া নির্ব্বাণাকাঙ্ক্ষী হউক। ভারতে এই শিক্ষার ফল যে বিষময় হইয়াছে, বঙ্গদর্শনের অনেক স্থানেই তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এইরূপ, আর অনেকানেক মুনিবৃত্ত মহাপুরুষ, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত হওয়াতে ঐহিক সম্পদে অননুরক্ত হইয়াও সমাজের ইষ্টসাধনে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সামান্যতঃ সন্ন্যাসী প্রভৃতি সম্প্রদায়ীয় বৈরাগী সম্প্রদায় সকলকে উদাহরণ স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিলেই, একথা যথেষ্ট প্রমাণীকৃত হইবে।

স্থূল কথা এই যে ধনসঞ্চয়াদির ন্যায় সুখশূন্য, শুভফলশূন্য, মঙ্গলশূন্য ব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলেও কখনই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এ জীবন ভবিষ্যৎ পারলৌকিক জীবনের জন্য পরীক্ষা মাত্র—পৃথিবী স্বর্গলাভের জন্য কর্ম্মভূমি মাত্র—এ কথা যদি যথার্থ হয়, তবে পরলোকে সুখপ্রদ কর্ম্মের অনুষ্ঠানই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বটে, কিন্তু প্রথমতঃ সেই সকল কার্য্য কি, তদ্বিষয়ে মতভেদ, নিশ্চয়তার একেবারে উপায়াভাব; দ্বিতীয়তঃ পরলোকের অস্তিত্বেরই প্রমাণাভাব।

তৃতীয়তঃ পরলোক থাকিলে, এবং ইহলোক পরীক্ষা ভূমিমাত্র হইলেও, ঐহিক এবং পারত্রিক শুভের মধ্যে ভিন্নতা হইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

† স্বীকার করি, কিয়ৎপরিমাণে ধনাকাঙ্ক্ষা সমাজের মঙ্গলকর। ধনের আকাঙ্ক্ষা মাত্র অমঙ্গলজনক এ কথা বলি না, ধন, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হওয়াই অমঙ্গলকর।

যদি পরলোক থাকে, তবে যে ব্যবহারে পরলোকে শুভ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা, সেই কার্য্যেই ইহলোকেও শুভ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা কেন নহে, তাহার যথার্থ হেতুনির্দ্দেশ এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারে নাই। ধর্ম্মাচরণ যদি মঙ্গলপ্রদ হয়, তবে যে উহা কেবল পরলোকে মঙ্গলপ্রদ, ইহলোকে মঙ্গলপ্রদ নহে, এ কথা কি সে সপ্রমাণীকৃত হইতেছে? ঈশ্বর স্বর্গে বসিয়া কাজির মত বিচার করিতেছেন, পাপীকে নরককুণ্ডে ফেলিয়া দিতেছেন, পুণ্যাত্মাকে স্বর্গে পাঠাইয়া দিতেছেন, এসকল প্রাচীন মনোরঞ্জন উপন্যাসকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। যাঁহারা বলেন যে ইহলোকে অধার্ম্মিকের শুভ, এবং ধার্ম্মিকের অশুভ দেখা গিয়া থাকে, তাঁহাদিগের চক্ষে কেবল ধন সম্পদাদিই শুভ। তাঁহাদিগের বিচার এই মূলভ্রান্তিতে দূষিত। যদি পুণ্য কর্ম্ম পরকালে শুভপ্রদ হয়, তবে ইহলোকেও পুণ্য কর্ম্ম শুভপ্রদ। কিন্তু বাস্তবিক কেবল পুণ্য কর্ম্ম কি পরলোকে কি ইহলোকে শুভপ্রদ হইতে পারে না। যে প্রকার মনোবৃত্তির ফল পুণ্য কর্ম্ম তাহাই উভয় লোকে শুভপ্রদ হওয়াই সম্ভব। কেহ যদি কেবল মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাড়নার বশীভূত হইয়া, অথবা যশের লালসায়, অপ্রসন্নচিত্তে দুর্ভিক্ষনিবারণের জন্য লক্ষমুদ্রা দান করে, তবে তাহার পারলৌকিক মঙ্গলসঞ্চয় হইল কি? দান পুণ্য কর্ম্ম বটে, কিন্তু এরূপ দানে পরলোকের কোন উপকার হইবে, ইহা কেহই বলিবে না। কিন্তু যে অর্থাভাবে দান করিতে পারিল না, কিন্তু দান করিতে পারিল না বলিয়া কাতর, সে ইহলোকে, এবং পরলোক থাকিলে পরলোকে, সুখী হওয়া সম্ভব।

অতএব মনোবৃত্তি সকল যে অবস্থায় পরিণত হইলে পুণ্য কর্ম্ম তাহার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ স্বতঃনিষ্পাদিত হইতে থাকে, পরলোক থাকিলে তাহাই পরলোকে শুভদায়ক বলিলে কথা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে। পরলোক থাকুক বা না থাকুক, ইহলোকে তাহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু কেবল তাহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যেমন কতকগুলি মানসিক বৃত্তির চেষ্টা কর্ম্ম, এবং যেমন সে সকলগুলি সম্যক্ মার্জ্জিত ও উন্নত হইলে, স্বভাবত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তি আছে তাহাদের উদ্দেশ্য কোন প্রকার কার্য্য নহে—জ্ঞানই তাহাদিগের ক্রিয়া। কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন, যেমন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলিরও সেইরূপ অনুশীলন জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যমাত্র অবলম্বন করিয়া, সম্পদাদিতে উপযুক্ত ঘৃণা দেখাইয়া, জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এরূপ মনুষ্য কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই এমত নহে। তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প হইলেও, তাঁহাদিগের জীবনবৃত্ত মনুষ্যগণের অমূল্য শিক্ষাস্থল। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এ রূপ শিক্ষা আর কোথাও পাওয়া যায় না। নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা এই প্রধান শিক্ষা। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাদিগের জীবনের গূঢ় তত্ত্ব সকল অপরিজ্ঞেয়। কেবল দুই জন আপন আপন জীবনবৃত্ত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এক জন গেটে, দ্বিতীয় জন ষ্টুয়ার্ট মিল।

ক্রমশঃ।